সুকুমার সমগ্র রচনাবলী

১

সম্পাদনায়

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

কল্যাণী কার্লেকর

সহকারী সম্পাদক

সমীর মৈত্র

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-বারো

প্রকাশিকা :
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ।১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
বিজয় ধোটে
রেঁনেষা
১৩৮ বেলিয়াঘাটা রোড
কলিকাতা ১৫

অলঙ্করণ :
সুকুমার রায়

প্রচ্ছদলিপি :
সুব্রত ত্রিপাঠী

ব্লক :
গণেশ পাইন

বাঁধাই :
মহামায়া বাইণ্ডার্স
১২ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১, ১৩৬৭
এপ্রিল ১৫, ১৯৬০

সংশোধিত অফসেট মুদ্রণ :
জ্যৈষ্ঠ ২৪, ১৩৬৭
জুন ৭, ১৯৬০

প্রকাশিকার কৈফিয়ৎ

সাধ ছিল—কিন্তু সাধ্য আমাদের সীমিত। অগণিত গ্রাহক বন্ধুদের উৎসাহ আর উদ্দীপনাকে সহায় করে আমাদের দ্বিতীয় রচনাবলী সুকুমার রায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলাম আমরা। অনেক বাধা, অনেক বিপদ, অনেক সঙ্কট পেরিয়ে 'সুকুমার সমগ্র রচনাবলী'-র প্রথম খণ্ড আজ পাঠকবন্ধুদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করব পুস্তক প্রকাশন শিল্পে আজকের এই সঙ্কটের কথা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে 'সুকুমার সমগ্র রচনাবলী'-র প্রথম খণ্ড বের করতে না পারার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। দুঃখিত—পরিকল্পনা মত প্রথম সংস্করণকে রূপ দিতে না পারার জন্যও বটে। বিদ্যুৎ সঙ্কটে পড়ে এমন অনেক লেখা আমরা নিরুপায় হয়ে শেষ মুহূর্তে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য রাখতে বাধ্য হয়েছি—যার ফলে দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-বস্তু অনেক অনেক বেশী হয়ে পড়বে। আশা করব আমাদের সহৃদয় পাঠকবন্ধুরা এই অক্ষমতাকে ক্ষমা করে নেবেন।

অনেকেই এগিয়ে এসেছেন—আমাদের এ-বই প্রকাশে সহযোগিতা করতে। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। দেরিতে হলেও বেশ কিছু পুরোনো বই ও পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শ্রীসনৎ গুপ্ত ও শ্রীদেবদত্ত দে মহাশয়। এ'দের সহযোগিতাও ভুলবার নয়, এ'দের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সবশেষে এ-বই-এর ভাল-মন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আমার পাঠক বন্ধুদের উপর—তাদের ভাল লাগলেই সার্থক মনে করব আমাদের এই উদ্যোগ।

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

সুকুমার রায়

এটি জীবনচরিত নয়, অসামান্য প্রতিভাবান মানুষের চরিত্রের কিছু ঘটনার ধারাসমাবেশ আর যে দুটি উপাদানে মানুষ গড়ে ওঠে—বংশগতি ও পরিবেশ এখানে সেই দুটির সূত্রানুসন্ধান।

গবেষণার পথে বিস্তারিত জীবনচরিত রচিত হতে পারে, সুকুমার রায়েরও হবে। অনেক বইপত্র ঘেঁটে, অনেক কাগজপত্র সংগ্রহ করে, অনেক বিশ্লেষণ হবে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার স্তিমিত প্রদীপে একান্ত আপন কথা বলা হয়তো হবে না। এখানে সেই ধরনের স্মৃতি নিবন্ধ হয়েছে।

পিতৃপুরুষ : মৈমনসিংহ জেলায় আমকাঁঠালের বনে ঘেরা, ছায়ায় ঢাকা, মসুয়াগ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের কোলে নদীপিতৃকা সুজলা, সুফলা শ্যামা মাতৃভূমি। সেই দেশে বাস করতেন এক তেজস্বী কায়স্থ পরিবার। প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ শক্তিশালী, দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ ও নানা গুণান্বিত।

রামসুন্দর দেও বলে এক যুবক নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রাম থেকে পূর্ব বাংলায় সেরপুরে এসেছিলেন। সেরপুরের জমিদার বাড়িতে যশোদলের রাজা গুণীচন্দ্র তাঁর সুন্দর চেহারা আর তীক্ষ্ন বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে যশোদলে এনে, জামাই করে, জমিজমা, ঘরবাড়ি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর বংশধরেরা সেখান থেকে সরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে মসুয়াগ্রামে স্থায়ী বসবাস করেন।

সুকুমার রায়ের প্রপিতামহ লোকনাথ রায় রূপে, গুণে, পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় খ্যাত এবং জমিদারি জরিপের কাজে নিপুণ ছিলেন। বাবার উপরোধে তিনি বৃটিশ কোম্পানির অধীনে কয়েকটি জমিদারির সীমানানির্ধারণের কাজ নিয়েছিলেন কিন্তু কোনো-এক পক্ষ তাঁকে ঘুষ দিতে চাওয়ায় সেই চাকরি ছেড়ে দিলেন।

আগে থেকেই তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন, এবার সেই সাধনাতেই ডুবে গেলেন। ছেলের মতিগতি ভালো নয় ভেবে তাঁর বাবা রামকান্ত কৃষ্ণমণি বলে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। তবু ছেলের মন সংসারে ফিরলো না। বাবা তখন ছেলের সাধনার ডামরগ্রন্থ, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দিলেন।

এই আঘাতে লোকনাথ শয্যাশায়ী হলেন এবং তিনদিনের দিন, বত্রিশ বছর বয়সে, ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। তখন কৃষ্ণমণির কোলে একটিমাত্র শিশুপুত্র।

বংশগতি : লোকনাথের ছেলে কালীনাথ সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায়

পণ্ডিত ছিলেন। একদিকে যেমন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা শাস্ত্রবিচারে তাঁকে মধ্যস্থ মানতেন, অন্যদিকে মৌলবিরাও ফরমানের অর্থ বোঝার জন্য তাঁর কাছে আসতেন। আসল নাম কালীনাথ হলেও মুন্সী শ্যামসুন্দর বলেই তিনি লোকের কাছে পরিচিত ছিলেন।

শ্যামসুন্দর মুন্সীর আটটি ছেলেমেয়ে—পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা। মেয়েরা হলেন গিরিবালা, ষোড়শী ও মৃণালিনী। ছেলেদের মধ্যে দ্বিতীয় কামদারঞ্জনকে দূর-সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী দত্তক নিয়ে নাম বদলে উপেন্দ্রকিশোর রেখেছিলেন। প্রথম সারদারঞ্জন অঙ্ক ও সংস্কৃতে স্বনামধন্য পণ্ডিত, মেট্রোপলিটন (বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রসিদ্ধ ক্রিকেটর, 'ভারতের ডব্লু. জি. গ্রেস' নামে খ্যাত ছিলেন। তৃতীয় মুক্তিদারঞ্জন ওই কলেজের অধ্যাপক ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। চতুর্থ কুলদারঞ্জন ছিলেন শিশুসাহিত্যিক ও নামকরা 'ফোটো-আর্টিস্ট'—তিনি আলোকচিত্রের ছবি বড় করে 'পোর্ট্রেট' তৈরি করতেন। তখনকার বাংলাদেশে এমন সম্ভ্রান্ত ঘর প্রায় ছিল না যেখানে কুলদারঞ্জনের তৈরি করা প্রিয়জনের ছবি শোভা পেতো না। ইনিও ভালো ক্রিকেট খেলতেন। আর ভালো ক্রিকেট খেলতেন ছোটভাই প্রমদারঞ্জন, তিনি ভারত সরকারের বনবিভাগের একজন আধিকারিকের পদে তখনকার শ্যাম ও বর্মাসমেত ভারতের নানা দুর্গম অঞ্চলে কাজ করতেন। তাঁর ভ্রমণের কথা 'বনের খবর' ধারাবাহিকভাবে সন্দেশের পাতায় বেরোতো এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সুকুমারের প্রভাতসূর্যের জ্যোতির পাশে শুকতারার মতো ছিলেন তাঁর দিদি স্বনামধন্যা লেখিকা ও চিত্রকারিণী সুখলতা। সেই সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি'র অনুসরণে ভাইবোনের ডাকনাম হয়েছিল হাসি ও তাতা। অন্য দুই বোন পুণ্যলতা ও শান্তিলতারও লেখার ক্ষমতা ছিল। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেও সন্দেশের পাতায় শান্তিলতার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। পুণ্যলতাও সন্দেশে লিখতেন আর তারপর, 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে যে সাহিত্যিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে চোখের দুর্বলতার জন্য তা পূর্ণভাবে রক্ষা করতে না পারলেও আজকের সন্দেশে তাঁর ছোট্টদের জন্য লেখা ছোট্ট কথিকাগুলি যে প্রতিভাসিঞ্চিত তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর কন্যা নলিনী দাশের লেখা আজকালকার সন্দেশের পাঠক-পাঠিকার কাছে সুপরিচিত।

মেজভাই সুবিনয় শিশুসাহিত্যে খ্যাতি পেয়েছিলেন এবং উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের অকালমৃত্যুর পর রুগ্‌ণ শরীরে বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে 'সন্দেশে'র হাল ধরেছিলেন। ছোটভাই সুবিমল সন্দেশে লিখতেন, তাঁর রচনায় যে অদ্ভুত রসের পরিচয় পাওয়া যেত নানা বিপর্যয়ের প্রতিকূলতায় তার পূর্ণবিকাশ হতে পারে নি।

প্রমদারঞ্জনের দ্বিতীয়া কন্যা লীলা মজুমদারের অনবদ্য শিশুসাহিত্য-সৃষ্টি এই প্রতিভারই ধারাবাহী।

উপেন্দ্রকিশোরের ছোটবোনের বিয়ে হয়েছিল তখনকার নামকরা সৌগন্ধিক, আনন্দমোহন বসুর ভাইপো হেমেন্দ্রমোহন বসুর (এইচ. বসু) সঙ্গে। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মালতী ঘোষাল গানে আর ছেলেদের মধ্যে 'কার্তিক, গণেশ' ক্রিকেট খেলায় মাতুলবংশের ঐতিহ্য রেখেছিলেন। তৃতীয় পুত্র নীতীন বসু ছায়াছবির জগতে

অনেকদিন পথপ্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের স্থান অধিকার করেছিলেন।

সুকুমার রায়ের একমাত্র পুত্র সত্যজিতের খ্যাতি ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

পরিবার-পরিবেশ : সুকুমার রায় এই পরিবারের যে অদ্ভুত শাখায় জন্ম নিয়েছিলেন তার শীর্ষে ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাশালী উপেন্দ্রকিশোর। এঁর সংসারের কথা উপলব্ধি করতে পারলে তবেই বুঝতে পারা যায় যে এত অল্প বয়সে সুকুমারের সত্তার এত পরিপূর্ণ বিকাশ কি করে সম্ভব হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোরের কর্ম ও মননধারাকে প্রায় সর্বত্রগামী বলে বর্ণনা করা যায়। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংগীতকলানিপুণ ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের অন্যান্য মহাজনদের মতো তিনি নিজ ক্ষেত্রে এক হাতে সৃষ্টি ও রক্ষার সামগ্রিক প্রয়াস করেছিলেন। ছোটদের জন্য লিখেছিলেন, এঁকেছিলেন এবং অযোগ্য মেশিনের স্থূলতায় সুন্দর সৃষ্টিকে বিকৃত হতে দেখে ছবিতোলা ও ছাপার জগতে দেশ-বিদেশে নতুন অধ্যায় যোজনা করেছিলেন। ছবি-গান-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-রম্যরচনা প্রভৃতি দিয়ে যে অনবদ্য শিশুজগৎ তিনি রচনা করেছিলেন তারই পূর্বনীড় ছিল তাঁর সংসার।

এই সংসারে কোনো খিল ছিল না, ছোট বড় সবাই মিলে খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ, পড়ালেখা, ছবি-আঁকা, গানবাজনার মধ্যে যে অখণ্ড সঙ্গ স্থাপিত হয়েছিল তার পূর্ণপাত্র উপচে উঠে পরিবারের অন্যান্য শাখাকে অভিষিক্ত করে গোটা সমাজ-টাকেই সিঞ্চিত করেছিল।

উপেন্দ্রকিশোর ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। মৈমনসিংহের জিলাস্কুলে পড়বার সময়ে তিনি সহপাঠী ব্রাহ্মভাবাপন্ন গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেন। পরে, ১৮৮০ বা ১৮৮১ সালে কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমশ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

তেইশ বছর বয়সে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতা, প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ও তেজস্বী দেশসেবক দ্বারকানাথ গাংগুলির মেয়ে বিধুমুখীকে বিয়ে করেন। জাত-ধর্মের বেড়াভাঙা এই বিয়েতে আত্মীয়স্বজনেরা হয়তো প্রথমটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিবারিক স্নেহবন্ধনেরই জয় হয়েছিল।

বিয়ের কিছুদিন পর উপেন্দ্রকিশোর বিধুমুখীকে নিয়ে ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে লাহাদের প্রকাণ্ড লাল বাড়ির কয়েকটা ঘর ভাড়া করে সংসার পাতেন। এই বাড়িতে আরো কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার ছিলেন। শ্বশুরমশাই দ্বারকা-নাথ গাংগুলি ও তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী স্বনামধন্যা কাদম্বিনী গাংগুলিও এই বাড়িতেই থাকতেন। তাছাড়া, এখানে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও তার বোর্ডিং ছিল এবং এই বাড়ির ছাতে প্রতি বৎসর ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসবের সময়ে বালক-বালিকা সম্মেলন হতো।

উপেন্দ্রকিশোরের ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে পাঁচটি এখানে জন্মেছিলেন আর এসেছিলেন সুরমা ভট্টাচার্য। এঁর মায়ের মৃত্যুর পর বাবা রামকুমার বিদ্যারত্ন তাঁর তিন মেয়েকে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে যান ও রামানন্দস্বামী নাম নেন। সেই থেকে নামে মাসি 'সুরমা মাসি' বাড়ির মেয়ের মতো বড় হয়েছিলেন ও

পরে উপেন্দ্রকিশোরের সবচেয়ে ছোট ভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোরের ষষ্ঠ সন্তান জন্মানোতে এবং কুলদারঞ্জনের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর তিন সন্তানসহ এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলে পরিবারটির আয়তন আরো বাড়ে। অদ্ভুত এই বাড়িটায় একদিকে জাতীয় নবজাগরণের উপকরণ, অন্যদিকে জাতির ভবিষ্যতের উপাদান, দুয়ের আদান-প্রদানে একটা নতুন সত্তা জেগে উঠছিল।

যে-সব বড়রা এই বাড়িতে সর্বদা আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিখ্যাত সমাজসংস্কারক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ধার্মিক নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছোটবেলা থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের সংগীতে ঝোঁক ছিল, তিনি বাঁশি ও বেহালা বাজাতেন এবং কলকাতায় আসার পর সম্ভবত গানবাজনার সূত্র ধরেই জোড়াসাঁকোয় যাতায়াত করতে থাকেন। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে আজীবনসখ্য স্থাপিত হয়েছিল তার রেশ তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সন্তানদের—বিশেষত সুকুমার ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি স্নেহরূপে বর্ষিত হয়েছিল।

এই পরিবারের আবহাওয়াটা অসাধারণ ছিল : লীলা মজুমদার লিখেছেন—"মনে হয়, ওঁদের ছিল অবারিত দ্বার, কোনো দুঃখী, নিরাশ্রয় ওঁদের বাড়ি থেকে ফিরে যেতো না। কত রুগ্ণ লোক এসে চিকিৎসা করিয়ে যেত। একবার এক বৃদ্ধ পাগল ভদ্রমহিলাও অনেকদিন থেকে গেলেন। বাড়িসুদ্ধ সকলে নাস্তানাবুদ, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির দরজা তবুও তেমনি খোলা রইলো।" পুণ্যলতা চক্রবর্তীও স্মৃতিচারণ করেছেন, "আমাদের বাড়িটা ছিল আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অতিথি অভ্যাগত সকলেরই সুখের মিলনের জায়গা—'বারো মাসে তেরো পার্বণে'র মতো ছোটখাটো কত আনন্দের উৎসব নিত্য লেগে থাকতো। ভগবানের নামগানে, প্রাণখোলা আদর-যত্নে, হাসি-আলাপে, গান-বাজনায় সকলেই কত তৃপ্তি ও আনন্দ পেতেন। বাবার এক বন্ধু বলতেন, 'এ বাড়ির মানুষগুলো সব সময়েই যেন হাসছে—বাড়িটাও যেন হাসছে'!"

এই বিরাট বাড়িটাতেই বাংলার নতুন সমাজের একটা ছোট সংস্করণ ছিল। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গেই পড়তো, বিকেলবেলায় বাড়িটার আবাসিক সমস্ত ছেলেপিলে প্রকাণ্ড ছাতে খেলা করতো, পুণ্যলতা চক্রবর্তী লিখেছেন, "লুকোচুরি, চোর-চোর, কুমির-কুমির, কানামাছি এ-সব খেলা তো ছিলই তাছাড়া মন থেকে বানিয়ে কতরকম খেলা হত—নতুন নতুন খেলার কল্পনা দাদার মাথায় খুব আসতো।"

সন্ধেবেলায় সকলে মিলে গোল হয়ে বসাটা একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। কোন-কোনদিন অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে ম্যাজিক লণ্ঠন, শ্যাডোপ্লে এই-সব দেখা হতো আর "রোজ সন্ধ্যায় ছিল গল্প শোনার পালা—কত দেশ-বিদেশের কথা, রূপকথা, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, যুদ্ধ ও বিপদের কত রোমাঞ্চকর গল্প, শুনতে শুনতে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে চলে যেতাম।"

সাধনার তীর্থক্ষেত্র এই বাড়িতে কয়েকটা কাজের ঘর ছিল। পুণ্যলতা চক্রবর্তী বলেছেন, "একটাকে আমরা বলতাম, 'কংকালের ঘর'...এটা ছিল আমাদের ডাক্তার দিদিমার পড়াশোনার ঘর। আরেকটা ছিল 'অন্ধকার ঘর' তার চারদিক বন্ধ। ভিতরে

লাল কাচের ঝাপসা ভুতুড়ে আলোয় আবছায়া দেখা যেত, বড়-বড় শাদা চৌকোনা ডিশ, আরো অনেক শিশিবোতল ও যন্ত্রপাতি। এটা ছিল ফোটোগ্রাফির 'ডার্ক-রুম'।"

এই পরিবারের আবহাওয়ায় তিনটে স্রোত বইতো : একটা হাসি, খেলা, গান, গল্পের উল্লসিত সহজ স্রোত, আরেকটা জ্ঞানসাধনার, নব নব আবিষ্কারের স্রোত, আর তৃতীয়—নতুন সমাজ ও জাতির তেজস্বী জাগরণের স্রোত। এই পবিত্র ত্রিস্রোতায় অবগাহন করে সহজ প্রতিভাধারী সন্তানসন্ততি বিকশিত হচ্ছিলেন।

শৈশব : এই বাড়িতে ১২৯৪ সনের ১৩ কার্তিক (১৮৮৭) সুকুমার রায়-চৌধুরীর জন্ম হয়। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়, প্রথম সুখলতা, তৃতীয় পুণ্যলতা, তারপর সুবিনয়, শান্তিলতা ও সুবিমল। সুকুমার ছোটবেলা থেকেই চঞ্চল ও ফুর্তিবাজ ছিলেন আর তাঁর কৌতূহলও খুব বেশি ছিল। কলের খেলনাগুলোকে ঠুকে ঠুকে ভেঙে ভেতরকার রহস্য বের করতে চাইতেন আর বিকেলে ছাতে উঠে ছোট্ট লাঠি হাতে বোর্ডিঙের মেয়েদের তাড়া করে বেড়াতেন।

যাঁরা প্রতিভার ভাগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাঁদের মধ্যে ছোটবেলায় অনেক সময়েই এ প্রাণশক্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। তাছাড়া তাঁর প্রতিভার অন্যান্য প্রমাণও তিনি শৈশব থেকেই দিয়েছিলেন। পুণ্যলতা লিখেছেন, "ছোটবেলা থেকেই দাদাও চমৎকার গল্প বলতে পারতো। বাবার প্রকাণ্ড একটা বই থেকে নানা জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে টুনী (শান্তিলতা), মণি (সুবিনয়) আর আমাকে অনেক আশ্চর্য আর মজার গল্প বলতো। বইয়ের গল্প ছাড়াও নিজের মনগড়া কত অদ্ভুত জীবের গল্প—মোটা 'ভবন্দোলা' কেমন দুলেদুলে থপথপিয়ে চলে, 'মন্তুপাইন' তার সরু লম্বা গলাটা কেমন পেঁচিয়ে, গিঁট পাকিয়ে রাখে, গোলমুখো, ড্যাবাচোখো 'কোম্পু' অন্ধকার বারান্দার কোণে, দেয়ালের পেরেকে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে।"—এদেরই আমরা পরে দেখলাম আবোল তাবোল, হযবরল আর হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরিতে।

শৈশব থেকেই সুকুমার অভিনয় করতে ভালোবাসতেন। প্রথমে তখনকার ছোটদের পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়াগল্প নিয়ে আবৃত্তি ও অভিনয় করাতেন। পুণ্যলতা লিখেছেন—"বিকেলে যখন ছাতে অনেক লোক জমা হতো, তখন দুজনে 'ইঁদুর-ভায়া,' 'নাপতে ভায়া', 'গণেশবাবু' ইত্যাদি মজার কবিতা বিচিত্র মুখভঙ্গির সঙ্গে অভিনয় করে সবাইকে হাসাতাম। কতরকম মুখভঙ্গিই যে দাদা করতে পারতো!"

উপেন্দ্রকিশোর ছবি আঁকতেন আর নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও আঁকতে শেখাতেন। প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর হাত থাকলেও সুখলতা আর সুকুমারের হাত সবচেয়ে ভালো ছিল। পরবর্তী জীবনের প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে সুখলতার সুন্দর আর সুকুমারের মজার জিনিস আঁকার প্রতি ঝোঁক প্রকাশ পেত। পড়ার বইয়ের খালি পাতাগুলি তিনি মজার ছবি এঁকে ভরিয়ে দিতেন আর শাদাকালো ছবিগুলোয় রঙ দিয়ে দিতেন।

রসিকতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। মাস্টারমশাই বলেছিলেন নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখতে আর ভাইবোনেরা যদি কিছু ছড়িয়ে ফেলে রাখে, তাও তুলে ফেলতে। ছোটবোন টুনী মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন করছিলেন, সুকুমার তাঁকে সুদ্ধ তুলে নিয়ে ডেস্কে ভর্তি করলেন।

একবার হাওয়া বদলাতে দার্জিলিঙে গিয়ে তাঁর এক মাসি তাঁকে আদবকায়দা শেখাতে বসলেন। তিনি বিদ্রোহ করলেন, ঝগড়াঝাঁটি করে নয়, অতি বোকা এবং আনাড়ি সেজে সকলকে হাসিয়ে! মাসি যতই ধমকধামক করেন, তিনি ততই হাঁদার মতো মুখ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকান, যেন কতই ভয় পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মাসিকে সহজ সরল এই পরিবারটিকে সাহেবি রীতিতে দুরস্ত করার পরিকল্পনা ছাড়তে হলো।

মাঘোৎসবের মধ্যে বালক-বালিকা সম্মেলনের ভোজের জন্য ময়রা এক ড্রাম ভর্তি রসগোল্লা নিয়ে এলো। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "এই এত রসগোল্লা কে একা খেতে পারে?" কেউ পারে না, তাই সবাই চুপচাপ, সুকুমার জোরে বলে উঠলেন, "আমি পারি!" তারপর ফিস ফিস করে যোগ করলেন, "অনেক দিনে।" শাস্ত্রী মহাশয় খুব হাসলেন—"ইতি গজ নাকি?"

নবদ্বীপচন্দ্র দাস বেজায় মোটা ছিলেন বলে সবাই তাঁকে জালা বলে তামাশা করতো। একদিন তিনি খেতে বসতে যাচ্ছেন, সুকুমার তাড়াতাড়ি তাঁর পিঁড়ির পাশে একটা বিঁড়ে এনে রাখলেন।

সুরমা, হাসি আর খুশি টবে ফুলগাছ লাগিয়েছিলেন। ওঁদের গাছে রঙিন কুঁড়ি ধরলো আর খুশির গাছে শাদা। খুশির তাতে মহা দুঃখ। পরদিন সকালে দেখা গেল খুশির গাছে নানা রঙের কুঁড়ি। তার আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু একটু লক্ষ্য করতে ধরা পড়লো মেঝেতে রঙের ছিটে। ভোরবেলায় উঠে সুকুমার তুলি নিয়ে তাঁর বোনের গাছের ফুলের কুঁড়িগুলোকে রাঙিয়ে রেখেছেন।

সহানুভূতি সুকুমারের চরিত্রের অঙ্গ ছিল। তাঁদের পোষা বেড়ালে তাঁদেরই পোষা খরগোসের ছানা খেয়ে ফেলেছে। বেড়ালটাকে কি শাস্তি দেয়া যায় তার আলোচনায় দুঃখের চোটে শিশুমনে যখন নানা হিংস্রতার চিন্তা দানা বাঁধছে তখন সুকুমার দৃঢ়ভাবে বললেন, "না ও-সব শাস্তি দিতে পারবে না, ও কি বোঝে? মরা বাচ্চাগুলো দেখিয়ে ওকে বেশ করে পিটি দিয়ে দাও, তাহলেই আর কখনো এরকম করবে না।"

ছোট্ট সুকুমারের সাহসের একটা উদাহরণ : এক ছুটিতে ওঁরা মসুয়ায় দেশের বাড়িতে গেছেন। দুপুরবেলা সুকুমার, সুখলতা আর পুণ্যলতা বাইরের পুকুরের নির্জন বাঁধাঘাটে বসে আছেন এমন সময় প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক এসে উপস্থিত, তার হাত রক্তমাখা আর হাতে ধরা লম্বা ছুরি থেকে রক্ত ঝরছে। লোকটিকে ভীষণ দস্যু ডাকাত ভেবে বোনেরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন কিন্তু ছয় বছরের শিশু সুকুমার এগিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। পরে অবিশ্যি জানা গেল লোকটি ওঁদেরই বাড়িতে পাঁঠা কেটে পুকুরে হাত ধুতে এসেছিল।

বাড়ির মধ্যেই ইস্কুল ছিল বলে এঁরা খুব তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়েছিলেন আর মেয়েদের ইস্কুল হলেও শিশুশ্রেণীতে ভাইবোন, মামামাসি (দ্বারকানাথ গাংগুলির দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়ে) সবাই এক জায়গাতেই পড়তেন। এছাড়া গৃহশিক্ষকও থাকতেন, কিন্তু এঁদের আসল শিক্ষা হতো বাড়িতে, বাবার কাছে। উপেন্দ্রকিশোর মুখে মুখে গল্পচ্ছলে সহজ বিজ্ঞানের কথা, পৃথিবীর জন্ম কথা, চাঁদসূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের কথা, ওঁদের শিখিয়ে দিতেন; দূরবীন দিয়ে আকাশের চাঁদতারা, গ্রহনক্ষত্র দেখাতেন।

কোনো মেলা বা একজিবিশনে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর ছেলেমেয়েদের সব জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁরা যেখানেই যেতেন, তাঁদের চারদিকে ভিড় জমে যেতো—সবাই ছেলেপিলেদের সঙ্গে ছোট হয়ে গিয়ে কথাগুলো শুনতো। এই শিক্ষা সব অবস্থায়, সব সময়ে চলতো। একবারের কথা পুণ্যলতা লিখেছেন—"আমরা রেলগাড়িতে চড়ে কোথায় যেন বেড়াতে যাচ্ছি, আর ক্রমাগত বাবাকে প্রশ্ন করে চলেছি—'এটা কি?' 'ওটা কেন?'—বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। খানিক পরে ওদিককার সিট থেকে একজন ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন, 'মাফ করবেন, আপনার সঙ্গে আলাপ না করে পারছি না। কি আশ্চর্য সুন্দর করে আপনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন! আমি এরকম আর দেখি নি'।"

বাল্য ও কৈশোর : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের খেলার প্রকৃতিও বদলাতে লাগলো আর এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠলো। একটা খেলা ছিল 'রাগবানানো'। পুণ্যলতা এর বর্ণনা দিয়েছেন, "হয়তো কারো ওপর রাগ হয়েছে, অথচ তার শোধ দিতে পারছি না, তখন দাদা বলত, 'আয় রাগ বানাই!'—বলেই সেই লোকটি সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্রভাব কিছু থাকতো না, সে ব্যক্তির কোনো অনিষ্টচিন্তা থাকতো না, শুধু মজার মজার কথা।...হাসির স্রোতে রাগটাগ সব কোথায় ভেসে যেতো—মনটা আবার বেশ হাল্কা খুশিতে ভরে উঠতো।" হ-য-ব-র-লয়ের হিজিবিজবিজের জন্মস্থান কোথায় তা এর থেকেই বোঝা যায়।

ছান্দসিকতা রায়বংশের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। লোকনাথ রায়ের দাদা ভোলানাথ রায় অনেক সময় সাধারণ কথাবার্তাও ছড়া কেটে বলতেন। মুন্সী শ্যামসুন্দর নিজের রচিত স্তোত্র দিয়ে গৃহদেবতার পুজো করতেন। উপেন্দ্রকিশোর ছেলেমেয়েদের কবিতায় চিঠি লিখতেন। পরিবারের সান্ধ্য আসরেও ছড়াকাটার খেলা হতো। একজন কবিতার একটা ছত্র বলতেন, আরেকজন তার সঙ্গে মিল দিয়ে পরের ছত্র—এইভাবে বলতো। একদিন আরম্ভ হল—

'একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি',
'যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি',
'তিনদিন তিনরাত নাহি তার নিদ্রা',
'সেঁক দেয়, তেল মাখে, লাগায় হরিদ্রা!'

ক্রমে মুক্তিদারঞ্জন যখন বললেন, "ভিতরে ঢুকায়ে দিল দীর্ঘ তার চঞ্চু"—তখন কেউ আর তার মিল দিতে পারে না। কিন্তু সুকুমার চট করে বলে ফেললেন,

"বক সে চালাক অতি চিকিৎসক-চুঞ্চু!"

সকলে আপত্তি করে উঠলো, "চুঞ্চু" আবার কি কথা! মুক্তিদারঞ্জন তাঁর পিঠ চাপড়ে বলে দিলেন, "চুঞ্চু মানে, ওস্তাদ, এক্সপার্ট।"

সুকুমারের এই বয়সের রচিত রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ববীণা" গানের "আষাঢ়" অংশের একটা 'প্যারডি' পাওয়া যায়—

"বৃষ্টি বেগভরে রাস্তা গেল ডুবিয়ে,

ছাতা কাঁধে, জুতা হাতে, নোংরা ঘোলা কালো
হাঁটু জল ঠেলি চলে যত লোকে রাস্তাতে!
অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল, অতি পিচ্ছিল, বিচ্ছিরি রাস্তা,
ধরণী, মহা দুর্দম কর্দমগ্রস্তা,
যাওয়া দুষ্কর, মুস্কিল রে, ইস্কুলে,
সর্দিজ্বর, বৃদ্ধি বড়, নিত্যি লোকে বদ্যি ডেকে তিক্ত বড়ি খায়!"

আগেই আবৃত্তি করতে ভালোবাসতেন, ক্রমে অভিনয়ের পালা শুরু হল। প্রথম প্রথম অন্যদের লেখা নাটক, তারপর তাঁর নিজের নাটক 'রামধনবধ', একদিকে যেমন তাঁর নাট্যকৃতির প্রথম প্রয়াস, অন্যদিকে তেমনি তাঁর দেশপ্রেমের পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় এর কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না, কিন্তু পুণ্যলতা লিখেছেন—"র‍্যাম্স্ডেন (রামধন) সাহেব মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার কাছে কোথায় লাগে! 'নেটিভ নিগার' দেখলেই সে নাক সিঁটকোয়, পাড়ার ছেলেরাও তাকে দেখলেই চেঁচায় 'বন্দে মাতরম্!' আর সে রেগে তেড়ে মারতে আসে, বিদঘুটে গালাগালি দেয়, পুলিশ ডাকে। এহেন সাহেব কি করে ছেলেদের হাতে জব্দ হলো, তারই গল্প।"

রামধনবধের একটা গান—

"আমরা দিশি পাগলার দল,
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল,
(যদিও) দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি
(তাহোক) এতে দেশেরই মঙ্গল।"

লেখা হয়েছিল মেজভাই মণির প্রতি পরিহাসছলে। সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশে জাতীয় চেতনার একটি বিরাট উচ্ছ্বাস উঠেছিল। মেজভাই সুবিনয় স্বদেশীর নেশায় মেতেছিলেন। তখন দিশি শিল্পজাত জিনিস পাওয়া দুষ্কর ছিল এবং যাও বা পাওয়া যেতো তাও ছিল অতি নিম্নমানের, কিন্তু সুবিনয় দিশি সুতোর মোটা কাপড়, হাতে তৈরি তুলোট কাগজ, ট্যারাব্যাঁকা পেয়ালাপিরিচ খুঁজেপেতে নিয়ে এসে বাড়ির সবাইকে দিয়ে ব্যবহার করাতেন। এই জন্যেই ঠাট্টা। এই সুকুমারই আবার গম্ভীরভাবের স্বদেশপ্রেমের গান লিখেছিলেন—'টুটিল কি আজ ঘুমের ঘোর।'

বন্দেমাতরমের যুগের আগেই যে সুকুমার দেশের কথা ভাবতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গের আগে ১৮৯৪ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত বুঅর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই বৃটিশ শক্তির সমর্থন করতেন। একদিন কাগজে একটা যুদ্ধে ইংরেজের জয়ের খবর পড়ে পুণ্যলতা আনন্দ প্রকাশ করাতে সুকুমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "নিজেরা মার খেয়ে মাটিতে পড়ে আছিস আবার অন্যের মার খাওয়া দেখে হাসছিস!"

এই সময়ে সুকুমারের ফোটোগ্রাফির "সখ"টা পরিণত হচ্ছিল। তিনি বিলিতি কাগজে ছবি পাঠিয়ে পুরস্কার পেতে আরম্ভ করেছিলেন এবং আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শি অনেকের ছবি তুলে দিতেন।

কিশোর সুকুমার হঠাৎ লম্বা হয়ে গেছিলেন, চরিত্রেও পরিণত হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু তাঁর ছেলেমানুষী যায় নি। বস্তুত এই আজীবন-ছেলেমানুষী তাঁর রসের বিশেষ লক্ষণ ছিল।

অভিনয়ের জন্য এ'রা যে-সব গোঁফদাড়ি কিনতেন, তার মধ্যে থেকে একটা চাপদাড়ি লাগিয়ে চোগাচাপকান আর কালো চশমা পরে গণৎকার সেজে হঠাৎ-লম্বা-হয়ে-যাওয়া সুকুমার বন্ধুবান্ধবদের ঠকাতে লাগলেন এবং একবার এক ঠকে-যাওয়া বন্ধুর সঙ্গে তাঁর মাকে পর্যন্ত ঠকিয়ে ফেললেন। মজাটা ভালোই জমেছিল, কিন্তু বন্ধুর মা যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে নবীন গণৎকারের পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিলেন তখনই হলো অপ্রস্তুতের ব্যাপার।

ছেলেদের স্কুলে (সিটি স্কুল) ভর্তি হয়ে সুকুমার সহজেই সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের নেতা হয়ে উঠলেন; কেবল সমবয়সীরা নয়, অনেক সময়ে বড়রাও তাঁর কথা শুনতেন।

সিটি স্কুলের একজন পিউরিটান-গোছের মাস্টার মশাই 'বায়োস্কোপ' দেখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সুকুমার তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে 'লে মিজেরাব্লে' ছবিটা দেখিয়ে এনে স্বীকার করিয়েছিলেন যে সিনেমা মাত্রেই অনিষ্টকর কিছু একটা নয়, যা দেখলে চরিত্রের উন্নতি হতে পারে এমন ফিল্মও আছে।

আরেকবার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে একটা জিওনো মাগুরমাছকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে একটা ছোট টিনে ভর্তি করতে দেখে দৃঢ় প্রতিবাদে নিরস্ত করেছিলেন।

ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত এক পত্রিকায় শিক্ষিত মেয়েদের বিষয়ে অভদ্র কুৎসা-মূলক একটা চিঠি প্রকাশিত হওয়ায় সুকুমার তখনই তার লেখকের কাছে গিয়ে কঠিন আপত্তি করে তাঁকে তাঁর সমস্ত কথা প্রত্যাহার করে, ক্ষমা চেয়ে আরেকটা চিঠি লিখতে বাধ্য করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর দাদামশাই দ্বারকা-নাথ গাংগুলি অনুরূপ একটা ঘটনায় এক পত্রিকার সম্পাদককে তাঁর কাগজে প্রকাশিত শিক্ষিতা মেয়েদের কুৎসামূলক রচনার অংশটা গিলিয়েছিলেন।

কর্মজীবনের দ্বারে: ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের পর কিছুদিন ৩৮ নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনে কাটিয়ে ১৯০০ সালে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে এসে এ'রা বাসা বাঁধলেন।

১৩ নম্বরের গবেষণার ঘরের কাজ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিশি ছাপাখানার নিকৃষ্টমানের কাজ নিয়ে অসন্তোষ গভীর হচ্ছিল। উপেন্দ্রকিশোর নিজের ছাপাখানা করবার জন্য জিনিসপত্রের অর্ডার দিয়ে ৩৮ নম্বরের অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িতে উঠে গেলেন। উপেন্দ্রকিশোর নিজের চেষ্টায় হাফটোন ছবি ছাপার প্রণালী আয়ত্ত করেছিলেন আর কয়েকটি লোককে শিখিয়ে তৈরি করে নিয়ে আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর ছবি ছাপবার জন্য ভালো আয়োজন করলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই আবার এখানেও কুলোলো না, তখন তাঁরা ২২ নম্বরের আরো বড় বাড়িটাতে উঠে গেলেন। সেখানে নীচে ছাপাখানা বসলো আর তিনতলার ওপরে কাঁচের ছাতওয়ালা স্টুডিও তৈরি হল। মেঘলা দিনে অথবা রাতে কাজের জন্য "আর্কল্যাম্প" আর নতুন ক্যামেরা, প্রেস আর আরো অনেক যন্ত্রপাতি এলো।

দেখতে দেখতে 'ইউ. রায় এণ্ড সন্সে'র কারবার ভারতে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বলে বিখ্যাত হল। উপেন্দ্রকিশোর গবেষণা করে হাফটোন ছবি সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন এবং বিদেশে প্রকাশিত হলে প্রচুর যশ পেলেন।

সমস্ত যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক কাজের মধ্যেও তাঁর গানবাজনা, ছবি আঁকা ও সাহিত্যসৃষ্টি অটুট ছিল এবং তাঁর ছেলেমেয়েরাও সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সুকুমার নাটক লিখতে লাগলেন, পর পর 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি রচনা করে ভাইবন্ধুদের নিয়ে একটা দল গড়লেন এবং সম্ভবত ১৯০৭ সাল থেকে এই দল 'ননসেন্স ক্লাব' নাম নিয়ে দানা বেঁধে ওঠে। 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নামে একটা হাতে-লেখা পত্রিকা এই ক্লাবের মুখপত্র ছিল। পুণ্যলতা লিখেছেন, "কাগজের সম্পাদক দাদা, মলাট ও মজার মজার ছবিগুলো সব দাদার আঁকা, অধিকাংশ লেখাও দাদারই।...বিশেষ করে 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন' নামে সম্পাদকের পাঁচ-মিশেলি আলোচনার পাতাটি বড়রাও আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন; পঞ্চতিক্ত নাম হলেও সেটা কিন্তু মোটেই তেতো ছিলো না, বরং খুব মুখরোচক ছিল। দাদার ঠাট্টার বিশেষত্বই এই ছিল যে তাতে কেউ আঘাত পেত না, কারো প্রতি খোঁচা থাকতো না, থাকতো শুধু মজা, শুধু সহজ নির্মল আনন্দ।"

ননসেন্স ক্লাবের অভিনয়ও ছিল সুকুমারের সমস্ত কাজের মতোই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। বাঁধা স্টেজ, সিন, সাজসজ্জা, মেক-আপ প্রায় কিছুই থাকতো না, রস জমতো নিছক সাহিত্যসৃষ্টি ও অভিনয়ের উৎকর্ষের জন্য। সুকুমার নাটক লিখতেন, অভিনয় শেখাতেন আর সাধারণত প্রধান পার্টটা নিজেই নিতেন। পুণ্যলতা লিখেছেন—" 'প্রধান' মানে সবচেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট! হাঁদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না!"

সুকুমারের পুত্র সত্যজিতের মধ্যেও নাট্যকৃতির এই সব্যসাচিত্ব দেখতে পাই, কেবল 'হাঁদারাম' বা যে-কোনো অংশে অভিনয় ছাড়া।

সুকুমারের এই সহজ নেতৃত্বের কথা তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় বিমলাংশু-প্রকাশ রায় খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন—"তাঁর দল গড়ে উঠেছিল অতি সহজ, স্বাভাবিকভাবে, যেমন করে জলাশয়ের মধ্যেকার একটা খুঁটিকে আশ্রয় করে ভাসমান পানার দল গিয়ে জমাট বাঁধে। সত্যই তিনি ছিলেন খুঁটিস্বরূপ, আমাদের অনেকের আশ্রয়। তাঁর বন্ধুপ্রীতি ছিল অপূর্ব। তাঁর স্নিগ্ধ, শান্ত, উদার চোখ-দুটির মধ্যে একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল। যার দিকে তাকাতেন তাকেই বশ করে ফেলতেন।.. তাঁর দলের আসন ছিল পথে পথে, তদানীন্তন সমাজপাড়ার 'প্রবাসী' কার্যালয়ের সামনে সংকীর্ণ গলিতে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বা অধুনা অবলুপ্ত 'পান্ডির মাঠে' (যেখানে এখন বিদ্যাসাগর হস্টেল হয়েছে) বসে, অথবা তাঁর ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের ভাড়াটে বাড়িতে, ননসেন্স ক্লাবের সাময়িক বৈঠকে, বা ১০ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে গগন হোম মহাশয়ের বাড়িতে প্রশস্ত রান্নাঘরে বসে বা দাঁড়িয়েই মাছভাজা বা আলুভাজা চর্বণের সঙ্গে সঙ্গে। আবার অনেক সময়ে আড্ডা জমতো প্রশান্ত মহলানবিশের ঘরে।"

এই দলের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ গংগোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও গুরুচরণ মহলানবিশদের বাড়ির ছেলেরা এবং আরো অনেকে।

তখন ব্রাহ্ম যুবকদের ছাত্রসমাজ বলে একটা সংগঠন ছিল কিন্তু তার অবস্থা ভালো ছিল না দেখে সুকুমার ব্রাহ্ম যুবসমিতি গঠিত করলেন। এই সমিতির সভ্যেরা সমাজসেবামূলক কাজ এবং সভা করে আধ্যাত্মিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করতেন। বুধবার বুধবার যুবকেরাই ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা

করতেন। তাছাড়া মাসে একবার করে সুকুমার এঁদের নিয়ে চড়ুইভাতি, স্টিমার-যাত্রা প্রভৃতি আনন্দোৎসব করতেন।

তাঁরই প্রস্তাবে ১৯১০ সালে ব্রাহ্ম যুবসমিতির মাসিক মুখপত্র 'আলোক' বেরোলো। দাম হলো প্রতি সংখ্যা চার আনা কিন্তু প্রথম সংখ্যাটি সুকুমার নিলামে চড়ালেন এবং তাঁর মংলুমামা (দ্বারকানাথ গংগোপাধ্যায়ের পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র গংগোপাধ্যায়) দশ টাকায় কিনে নিলেন। দুঃখের বিষয়, সুকুমার বিলেত যাওয়ার পর এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে ডবল অনার্স নিয়ে বি. এস-সি. পাশের পর গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি পেয়ে তিনি আলোকচিত্র ও ছাপাখানার প্রযুক্তিবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশ যাত্রা করলেন। ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে 'এরেবিয়া' জাহাজে গেলেন এবং শিক্ষাসমাপ্তান্তে য়ুরোপের কয়েকটা দেশে ঘুরে ১৯১৩র শেষাশেষি দেশে ফিরে এলেন।

আলোকচিত্র ও ছাপার কাজ ভালো করে শিখে ইউ. রায় এন্ড সন্সের কাজের আরো উন্নতি করা তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আরেকটা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলি ওদেশের বিশেষজ্ঞদের সামনে প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরা।

প্রবাসে : কলকাতা থেকে ট্রেনে বোম্বে গিয়ে সুকুমার জাহাজ ধরলেন। লন্ডনে পৌঁছে তিনি উঠলেন ২১ নম্বর ক্রমওয়েল রোডে নর্থব্রুক সোসাইটির হোস্টেলে। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর নিজের কাজের সূত্রে পেনরোজের পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ওই পত্রিকার সম্পাদক মিঃ গ্যাম্বলের চিঠি নিয়ে সুকুমার লন্ডনের L. C. C. School of Photo-Engraving and Lithography তে বিশেষ ছাত্র হিসেবে কাজ আরম্ভ করলেন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। অধ্যক্ষ মিঃ নিউটন, মিঃ গ্রিগ বলে লিথোগ্রাফি ও কলোটাইপের খুব ভালো শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হল, প্রথমে তিনি যে-সব পদ্ধতি আগে দেখেন নি সে সম্বন্ধে কিছু কার্যিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর কয়েকটা ছাপাখানা ঘুরে ঘুরে দেখবেন। অধ্যক্ষ সে-সব জায়গায় "Son of a Celebrated photo-engraver" বলে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তাছাড়া সুকুমার নিজের স্কুলের স্টুডিওতে অধ্যক্ষ এবং ছাত্রদের সামনে উপেন্দ্রকিশোরের উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। তাঁকে স্কুলের সাধারণ ক্লাসে যেতে হতো না। কলোটাইপ এন্ড লিথোগ্রাফির ঘরে কাজ করতেন, ঘুরে ঘুরে কতকগুলো বড়-বড় প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখতেন আর ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতেন। নিজের তোলা ছবি বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে তিনি ভালো ফোটোগ্রাফার হিসেবে পরিচিত হন এবং দেশে ফিরেও এই যোগাযোগ বজায় রাখেন। কয়েক বছর পরে তিনি রয়াল ফোটো-গ্রাফিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হন।

এইরকমের শিক্ষানবিশির কাজেই তিনি ১৯১২-র ফেব্রুয়ারিতে শিল্প-নগরী ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে ওখানকার স্কুল অব্ টেকনোলজির বিশেষ ছাত্র হিসেবে স্টুডিও ও লেবরেটরিতে কাজ করে মে-মাসের প্রথমে আবার লন্ডনে তাঁর পুরনো স্কুলে যোগ দেন। এতদিনে তিনি দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের পথে অনেকটা এগিয়েছেন, কঠিন ও সূক্ষ্ম কাজ হাতে নিতে ভরসা পাচ্ছেন এবং ওদের কাগজপত্রে

তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশিত হচ্ছে।

এই সময়ে তিনি কেবল ফোটোগ্রাফির কাজেই ডুবে থাকেন নি, ইংলন্ডের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীতের জগতে দৃশ্যশ্রাব্য যা কিছু পেয়েছেন উপভোগ করে নিজের অভিজ্ঞতা ও রসবোধকে বিস্তারিত করেছেন, প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গেছেন এবং ওদেশের লোকেদের সামনে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ পি. কে. রায়ের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। সেখানে যে-সব বাঙালিদের সঙ্গে মেলামেশা হতো তাঁদের মধ্যে ছিলেন সতীশ মুখার্জি ও তাঁর স্ত্রী, স্যর কে. জি. গুপ্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সরোজিনী নাইডু ও তাঁর ছোট বোন মৃণালিনী চ্যাটার্জি, এবং পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার দেবেন বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতি।

ডাঃ পি. কে. রায়ের স্ত্রী কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে টাকা তুলতে ভারতীয় দেবদেবী-দের নিয়ে একটা 'ট্যাব্লো' করেছিলেন। সুকুমার বৃটিশ মিউজিয়মে পড়াশুনো করে তার জন্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। খুব ঘটা করে ট্যাব্লোটি হয় এবং অনেক টাকা ওঠে। চিরপরিহাসপ্রিয় সুকুমার তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তার একটা 'প্যারডি' করার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু কাজের ভিড়ে তা হয়ে ওঠে নি।

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যেতেন ও মাঘোৎসবে যোগ দিয়ে-ছিলেন। তাঁর চিঠিতে সমাজে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'কর্মযোগ' বিষয়ে ভাষণের উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজদের মধ্যে যে-সব প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল তার মধ্যে ছাপাখানা ও আলোকচিত্র বিশেষজ্ঞ ছাড়াও ছিলেন শিল্পী হ্যাভেল ও রথেনস্টাইন, কবি ব্রিজেস ও ইয়েটস, কবি আর্নল্ড ও তাঁর স্ত্রী, ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ, সিলভাঁ লেভি, মিঃ পিয়ার্সন, 'Wisdom of the East' সিরিজের সম্পাদক ক্র্যানমর বিং প্রভৃতি।

লন্ডনে ডাঃ পি. কে. রায়ের বাড়ির সমাবেশে তিনি তাঁর 'রামায়ণ' (লক্ষ্মণের শক্তিশেল) আর 'ভাবুকসভা' পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সমাবেশে তাঁর গানের খুব আদর হয়েছিল।

মিঃ পিয়ার্সন তাঁর বাড়িতে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়তে ডাকলেন। সুকুমার অনেক খেটে, ইন্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরি থেকে বইটই ঘেঁটে, তৈরি করলেন—"The Spirit of Rabindranath" এবং তার সঙ্গে কবির কতকগুলি কবিতারও অনুবাদ করলেন। অকুস্থলে গিয়ে দেখেন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির মধ্যে কবীন্দ্র স্বয়ং উপবিষ্ট। যাই হোক, রচনাটি পড়া ও প্রশংসিত হল এবং পরে সেটা Quest পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মিঃ ক্র্যানমর বিং বইয়ের আকারে ছাপাবার উদ্দেশ্যে সুকুমারকে রবীন্দ্রনাথের আরো কবিতা অনুবাদের জন্য অনুরোধ করেন. সুকুমার স্বীকৃতিও দেন কিন্তু কাজের ভিড়ে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো এটিও হয়ে ওঠে নি।

বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অনেক দ্রষ্টব্য জিনিস তিনি দেখেন। সাফ্রেজেট আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। হ্যাম্পটন কোর্টে বেড়িয়ে আসেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে থিয়েটারে গিয়ে হাসির নাটক ও His Majesty's Theatre -এ Oliver

Twist দেখেন। আর দেখেন 'Kinema Colom'—সেটা নাকি দেশে যা দেখেছিলেন তার চেয়ে অনেক ভালো।

তখনো রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান নি কিন্তু রয়াল কোর্ট থিয়েটারে 'ডাকঘর' অভিনীত হয়েছিল আর মালিনী ও চিত্রাঙ্গদার অভিনয়ের তোড়জোড় চলছিল।

ছুটির ফাঁকে তিনি বোর্ণমাথ ও ব্রেভোজ সোয়ানেজে বেড়িয়ে এলেন এবং শেষে য়ুরোপের কন্টিনেন্টের কয়েকটি দেশ ঘুরে ১৯১৩-র অক্টোবরে দেশে ফিরলেন।

পূর্ণজীবন : ছবি ছাপার যে কোনো সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয় হাতে নেওয়ার সাহস ও দক্ষতা অর্জন করে দেশে ফিরে সুকুমার ইউ. রায় এন্ড সন্সের কাজে লাগলেন। এর প্রয়োজন ছিল, কারণ উপেন্দ্রকিশোর তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত—দুর্বল।

ঢাকার খ্যাতনামা সমাজসেবক কালীনারায়ণ গুপ্তের দৌহিত্রী, স্যর কে. জি. গুপ্তের ভাগ্নী—সুপ্রভার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। এই বিয়েতে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। সুপ্রভা অপূর্ব সুন্দর গান গাইতেন আর কারুশিল্পেও তাঁর দক্ষতা আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান এত পছন্দ করেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে তো বটেই, কলকাতায় এসেও অনেক সময়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে নিজের নতুন গান শিখিয়ে দিতেন। সেবায়, নিষ্ঠায় তিনি প্রায় আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। রায়বাড়ির সম্মান শুধু রক্ষা করবার নয়, বাড়িয়ে তুলবার মতো মেয়ে ছিলেন সুপ্রভা। বস্তুত এ বিয়ে রাজযোটক হয়েছিল।

ঘটনাস্রোত দ্রুত বয়ে চলছিল। সুকুমার দেশে ফেরার আগেই, ১৯১৩ সালে সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হল। ১৯১৪ সালে ১০০ নম্বর গড়পার রোডের নতুন বাড়িতে 'ইউ. রায় এন্ড সন্স'-সহ রায়পরিবার উঠে এলেন। সামনের দিকে একতলায় আপিস ও ছাপাখানা, আর দোতলায় স্টুডিও ইত্যাদি; পেছনে একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত থাকার জায়গা। কিন্তু সুখের পাত্র পূর্ণ হতে না হতে যেন ফুটো হয়ে গেল। ১৯১৫ সালে, মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর মারা গেলেন। মাত্র আটাশ ও তেইশ বছর বয়সে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঝড়ের মাঝখানে, সুকুমার আর সুবিনয় কারবার ও সংসারের সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিলেন।

কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েও দুই ভায়ের সামাজিক জীবনে শৈথিল্য এলো না। সুকুমার ব্রাহ্ম যুবসমিতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুললেন, কাজের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদও মিশিয়ে নিলেন। সেইরকম উপলক্ষে তাঁর ছড়া পাওয়া যায়—

> "মাঘোৎসবের স্টিমার পার্টি মস্ত মজার ব্যাপার,
> জ্বরোরুগী চল্ল খেপে মাথায় বেঁধে র‍্যাপার।
> খাবার দাবার নিয়ে সবাই উঠলো নায়ে চেপে,
> মংলু এলো শিং বাগিয়ে জংলু এলো খেপে।"

মংলু আর জংলু হলেন দ্বারকানাথ গংগোপাধ্যায়ের দুই ছেলে প্রফুল্লচন্দ্র এবং প্রভাতচন্দ্র গংগোপাধ্যায়।

সুকুমারের রসবোধ কি করে অনেক সময়ে সামাজিক সংকটের উদ্ধারে সাহায্য করতো তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ভিন্ন প্রদেশবাসী কোন ব্যক্তির সম্বর্ধনায় প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন হয়, কিন্তু আরম্ভেই দুই দল যুবকের মধ্যে বচসার সূত্রপাতে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় সকলে অস্থির হয়ে উঠেছেন এমন সময়ে সুকুমার হঠাৎ তাঁর লক্ষ্মণের শক্তিশেলের গান ধরলো—

"কেন, কেন, কেনরে,
চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙো কেন?"

অমনি হাসির রোলের মধ্যে সমস্ত তিক্ততা ধুয়ে ভেসে গেল।

আরেকবার কংগ্রেসের সভামণ্ডপে গায়কদলের মধ্যে সুকুমার রয়েছেন। ওঁদের সামনে এক ভলাণ্টিয়ার সর্দার ঘোরাঘুরি করছে। মিলিটারি ধরনের উর্দি পরে বোধহয় তার মাথা ঘুরে গেছে, সে বীরদর্পে পায়চারি করতে করতে এমন ভঙ্গিতে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে যে সকলে বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু আগের দিন ভলাণ্টিয়ার ও দর্শকদের মধ্যে একটা মারামারি হয়ে যাওয়াতে ভয়ে কেউ কিছু বলতে চাইছেন না। এই সময়ে সুকুমার, ছোটরা দুষ্টুমি করলে বড়রা যেমনভাবে ভর্ৎসনা করেন তেমনি ভঙ্গিতে তার দিকে চেয়ে, হেসে, বললেন, "দুৎ!" যুবকটি অপ্রস্তুত হয়ে পালালো।

আরেকবার, ঢাকাতে একদল বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছেন, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মাঝখানে ছবি বন্ধ হয়ে গেল। দর্শকেরা অধৈর্য হয়ে উঠে যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে তখন তিনি সদলবলে গান ও অভিনয় আরম্ভ করে দিলেন— অমনি সব চুপ! অভিনয় প্রায় শেষ হতে চলেছে, এমন সময়ে ম্যানেজার এসে মিনতি করে বললেন, "মশাইরা দয়া করে আরেকটু-খন চালিয়ে যান, আমাদের প্রায় সব ঠিক হয়ে এসেছে।"

সুকুমার ঘনিষ্ঠ নিকট বন্ধুদের নিয়ে ননসেন্স ক্লাবের উত্তরসাধনে "মন-ডে ক্লাব" বা "মণ্ডা ক্লাব" স্থাপিত করলেন। এর বিষয়ে প্রভাতকুমার গংগোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"জীবনে বহু ক্লাবের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রার সদস্য হইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল, কিন্তু বলিতে দ্বিধা নাই যে মন-ডে ক্লাবের ন্যায় এত বিচিত্র, এত রসে ভরপুর কোন ক্লাব আর আমি দ্বিতীয় দেখি নাই।" (শ্রীপরিমল গোস্বামীর সৌজন্যে)

এই ক্লাবের গৃহীত সংগীত ছিল রবীন্দ্রনাথের "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।" সভ্যদের অনেকেই খুব লম্বাচওড়া ছিলেন—গড়পারের দোতলার বসবার ঘরে ধেই ধেই নৃত্যসহকারে যখন এই গানটি গাওয়া হতো তখন তার নীচের ঘরে খাবারের রেকাব সাজাতে সাজাতে বৌ-রা ভাবতেন ছাতটা ভেঙে মাথায় না পড়ে! অন্য একটা গান—

"আমাদের মন-ডে সম্মিলন,
হা রে রে আমাদের মন-ডে সম্মিলন!
চারুবাবুর দধি, কারু ঘোলের নদী,
জংলিভায়ার সরবতেতে মন মাতালে নিরবধি"—

রচিত হয়েছিল "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানের প্যারডি করে।

সভ্যতালিকায় যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, প্রভাতচন্দ্র গংগোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, জীবনময় রায়, কালিদাস নাগ, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অজিতকুমার চক্রবর্তী, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অমলচন্দ্র হোম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কিরণ-শঙ্কর রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র শর্মা, কিরণকুমার বসাক, হিরণকুমার সান্যাল, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ইত্যাদি।

ক্লাবে নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া বিভিন্ন রসপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা হত। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব কিছু এঁদের বৈঠক থেকে বাদ পড়তো না।

এখানেও সুকুমারের ছড়াকাটার অদম্য অভ্যাস পদে পদে কাজ করে গেছে। নেমন্তন্নের চিঠি বেরোচ্ছে ছড়ায়—

"সতেরোই শনিবার অপরাহ্ণ বেলা,
গড়পারে হৈ হৈ সরবতী মেলা,
সরবৎ, সদালাপ, সংগীত ভীতি,
ফাঁকি দিলে নাহি লাভ,
জেনে রেখো ইতি।"

ক্লাবের 'অধিকারী' শিশিরকুমার দত্ত বা 'খোদন' নোটিস দিয়েছেন যে সভায় সুকুমার রায় মিসিং লিংক সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়বেন। এতে ছড়ার বদলে ছবি—ছবিতে খাবারের রেকাব হাতে দাড়িওয়ালা ব্যক্তি অবশ্যই শিশিরকুমার দত্ত আর পাঠরত লোকটির সুকুমারের সঙ্গে সাদৃশ্য না থাকলেও, মিসিং লিংকের সঙ্গে আছে প্রচুর এখানে উল্লেখ্য যে শিশিরকুমার দত্ত ছিলেন সুপ্রভার মাসতুত ভাই, অর্থাৎ সুকুমারের সম্পর্কে শালা।

বড়বউ সুপ্রভার ডাকনাম 'টুলু' আর সুবিনয়ের বিয়ে হল মধ্যপ্রদেশের নামকরা ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে পুষ্পলতা বা পুষুর সঙ্গে। ক্লাবের চিঠি বেরোলো—

"আসছে কাল, শনিবার
অপরাহ্ণ সাড়ে চার,
আসিয়া মোদের বাড়ি,
শুভ পদধূলি ঝাড়ি,
কৃতার্থ করিলে সবে
টুলুপুষু খুশি হবে।"

আরেকটা চিঠিতে সভ্যদের নাম নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে—

'কেউ বলেছে খাবো খাবো,
কেউ বলেছে খাই,
সবাই মিলে গোল তুলেছে—
আমি তো আর নাই।

ছোটকু বলে 'রইনু চুপে
কমাস ধরে কাহিল রূপে,'
জংলি বলে 'রামছাগলের
মাংস খেতে চাই।'
যতই বলি 'সবুর কর'—কেউ শোনে না—কালা!
জীবন বলে কোমর বেঁধে 'কোথায় লুচির থালা?'
খোদন বলে রেগে মেগে,
ভীষণ রোষে বিষম লেগে
'বিষ্যুতে কাল গড়পারেতে
হাজির যেন পাই।'

চিঠির শেষে জরুরি বিজ্ঞপ্তি—"ইনসিওর ইওর লাইফ উইথ গ্রেশামস্ এ্যাট্-ওয়ান্স!"—শিশিরকুমার দত্ত যে 'গ্রেশাম' কোম্পানির দালালি করতেন এটা তারই প্রতি বক্রোক্তি।

'অধিকারী' তাঁর দালালির কাজে কিছুদিন বিহার সফরে গেলেন। তখন চিঠি দেয়া হল—

'ক্লাবটিরে ছাড়ি হল অধিকারী
মাস তিনচারি বিহার-বিহারী।
বিরহেতে তারি ব্যথা পেয়ে ভারি
নিঃশ্বাস ছাড়ি ভিজাইল দাড়ি
যত বুড়োধাড়ি সভ্যের সারি—
ঘোর বাড়াবাড়ি!'

তিনি ফিরে এলেন। পরের চিঠিতে তাঁর ছোট্ট ছাগলদাড়িওয়ালা চন্দ্রবদনের ছবির নীচে লেখা হল—

'শুনেছিনু গেছে গেছে.
শুনেছিনু নেই সে,
দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায়
আষাঢ়ের বাইশে!'

আরেকটি ছড়ায় চিঠি দিয়ে এই অংশ শেষ করি, শিশিরকুমার দত্তের বকলমে লেখা হয়েছে—

'আমি, অর্থাৎ সেক্রেটারি,
মাস তিনেক কলকাতা ছাড়ি
যেই গিয়েছি অন্য দেশে,
অমনি কি সব গেছে ফেঁসে!
বদলে গেছে ক্লাবের হাওয়া,
কাজের মধ্যে কেবল খাওয়া,
চিন্তা নেই কো গভীর বিষয়,
আমার প্রাণে এ-সব কি সয়?
এখন থেকে সমঝে রাখো,

এ-সমস্ত চলবে না কো,
আমি আবার এইছি ঘুরে,
তান ধরেছি সাবেক সুরে,
মংগলবার আমার বাসায়,—
আর থেকো না ভোজের আশায়—
শুনবে এসো সুপ্রবন্ধ
গিরিজার বিবেকানন্দ।'

প্রথমে ননসেন্স ক্লাব ও পরে মন-ডে ক্লাবের জন্য সুকুমার যে-সব প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ইত্যাদি লিখেছিলেন তার অনেকগুলিই তাঁর জীবনকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পরে কিছু কিছু এম. সি. সরকার এণ্ড কোং ও সিগনেট প্রেস ছাপান।

মন-ডে ক্লাবের অভিনয়ের মধ্যে ছিল শ্যারাড বা নাট্যাকারে লুকোনো শব্দের ধাঁধা। এগুলি লিখে রাখলে সভাসমিতিতে মজা করবার উপযুক্ত সাহিত্য হয়ে থাকতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গ-কৌতুকের' মধ্যে শ্যারাড আছে।

কবির জন্মতিথিতে সুকুমার শান্তিনিকেতনে যেতেন। এ-সম্বন্ধে কতকগুলি খবর শ্রীমতী সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি'তে পাওয়া যায়। ১৯১১ সালে তিনি 'অদ্ভুত রামায়ণ' (লক্ষ্মণের শক্তিশেল) থেকে 'ঐ আসে, ঐ আসে—' গানটি গেয়েছিলেন। ওটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে তাঁর নামই হয়ে গেছিল 'ঐ আসে!'

১৯১৭ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক গিয়ে তিন-চারদিন থেকেছিলেন; তখন 'অদ্ভুত রামায়ণে'র গান এবং অন্য কয়েকটি হাসির গান ও কবিতা আর 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' পড়ে শুনিয়েছিলেন আর কয়েকটি শ্যারাডের অভিনয় করিয়েছিলেন।

এইবার একটি 'বাঙালসভা'র আয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে শ্রীমতী সুপ্রভাকে সভানেত্রী করা হোক, কিন্তু তিনি রাজি না হওয়াতে সুকুমার সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি হয়েছিলেন, কিন্তু জন্মাবধি কলকাতাবাসী হয়ে বাঙাল ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা ভালোভাবে আয়ত্ত ছিল না বলে তাঁর ভাষণটি পুরোপুরি বাঙাল ভাষায় দিতে পারেন নি।

এই সময়ে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরভ্যুত্থান প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা এই নবজাগরণের প্রবক্তার স্থান নিয়েছিল এবং ওই দুটি কাগজে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও তাঁদের শিষ্যদের অনেক ছবি ছাপা হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে বিমলাংশুপ্রকাশ রায়চৌধুরীর এক প্রবন্ধকে অবলম্বন করে একটি তর্কযুদ্ধ হয়েছিল। তার সর্বশেষ প্রবন্ধটি ছিল সুকুমারের।

১৯২১ সালে তাঁর বহুপ্রার্থিত একমাত্র সন্তান সত্যজিতের জন্ম হলো। তারপরই তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন। গ্রামের জমিদারী দেখতে গিয়ে রোগ নিয়ে এলেন এবং পিতার মতো তিনি এমন রোগে গেলেন যাতে আজ আর কেউ মরে না।

দীর্ঘ আড়াই বছর তিনি রোগশয্যায় ছিলেন। এই সময়ে তাঁর ঘরটি ছিল সন্দেশের প্রাণকেন্দ্র, বাংলার শিশুসাহিত্যতীর্থ। কখনো মোটা তাকিয়ায় ভর দিয়ে

উপুড় হয়ে শুয়ে, কখনো-বা তাতে পিঠ দিয়ে আধবসা হয়ে ড্রইং বোর্ডের ওপর সরঞ্জাম নিয়ে লিখতেন, আঁকতেন। লোকে দেখা করতে এলে বোর্ডটি পাশে সরিয়ে রেখে কথা বলতেন। কখনো ওইভাবেই সুবিনয়ের সঙ্গে সন্দেশ পত্রিকা, ইউ. রায় এণ্ড সন্স বা অন্য কোন জটিল বৈষয়িক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন।

পিতার মতোই সুকুমার স্বাস্থ্যের সন্ধানে ঘুরলেন—দার্জিলিং, শান্তিনিকেতন। সোদপুর-পানিহাটিতে জমিদার গোপালদাস চৌধুরী তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে দরমা দিয়ে ঘিরে সুন্দর থাকার জায়গা করে দিয়েছিলেন। সেখানে কিছুদিন রইলেন। গঙ্গার ধারে পশ্চিমের জানলার পাশে শুয়ে সূর্যাস্তের রঙিন ছবি আঁকলেন। স্বাস্থ্য খুঁজে পেলেন না—ফিরে এলেন।

শান্ত, সমাহিত মনে কাজ করে চললেন। প্রিয় শিশুদের জন্য কবিতায় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস 'অতীতের ছবি' আর একটি স্তোত্র—'নমি সত্য সনাতন নিত্যধনে'—রচনা করলেন।

আচার্য ক্ষিতিমোহন এসে পুরনো ভক্তিকথা শোনাতেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান শোনাতেন। শেষ যেদিন কবি গাইলেন সেদিন সুকুমার নিজে চেয়ে শুনলেন—

"দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,
গভীর শান্তি এ যে।"

প্রথম প্রভাতেই জীবনসূর্য অস্ত গেল। অসামান্যা স্ত্রী সুপ্রভা, প্রতিভার ধারাবাহী শিশুপুত্র সত্যজিৎ আর স্নেহমুগ্ধ ভাইবোনেরা পড়ে রইলেন। রূপবান, গুণবান, সহিষ্ণু সুবিনয় রইলেন সেই ঝড়ের সাগরে ফুটো নৌকোর হাল ধরতে। তিনিও পারলেন না, স্বাস্থ্য ভেঙে গেল।

চার বছরের মধ্যে গড়পাড়ের বাড়ি ছেড়ে আসতে হল। পরিবারের সকলে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। বিধুমুখী দেওর মুক্তিদারঞ্জনের বাড়িতে মারা গেলেন। স্বাধীনচেতা সুবিনয় সরকারি চাকরি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারে নানা রচনা দান করে চললেন। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে তিনিও গেলেন।

তবু শেষ হল না। সুকুমারের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটা কবিতা স্বহস্তে লিখে সুপ্রভাকে পাঠিয়েছিলেন—

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিলে,
আগুন হয়ে জ্বলবে।"

আগুন ছিল এই পরিবারে; তাই যে-সব গুপ্ত আঘাতে তরী ডুবেছিল সেটা ইতিহাস নয়—ঝড়ে জলে অবিচলিত প্রতিভার দীপশিখাই সত্য।

কল্যাণী কার্লেকর

আবোল তাবোল

কৈফিয়ৎ

যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।

পুস্তকের অধিকাংশ ছবি ও কবিতা নানা সময়ের "সন্দেশ" পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে আবশ্যকমত সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া এবং নানা স্থলে নূতন মালমশলা যোগ করিয়া সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল।

গ্রন্থকার

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে ক্ষ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।

আয় ক্ষ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥
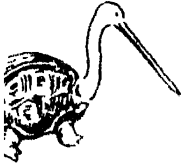
খিচুড়ি
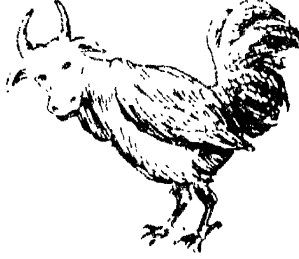
হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।"
টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি!
জিরাফের সাধ নাই মাঠে-ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢঙ ধরি সেও চায় উড়িতে।
গরু বলে, "আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?"
হাতিমির দশা দেখ—তিমি ভাবে জলে যাই,
হাতি বলে, "এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।"
সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।
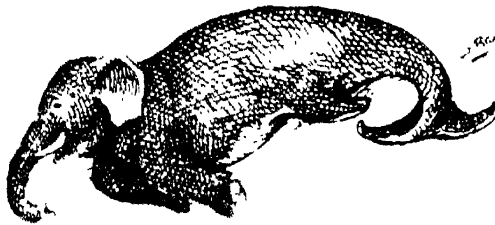
কাঠ-বুড়ো

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে গুন্ গুন্ সংগীত—
ভাব দেখে মনে হয় না-জানি কি পণ্ডিত!
বিড়্ বিড়্ কি যে বকে নাহি তার অর্থ—
"আকাশেতে ঝুল ঝোলে, কাঠে তাই গর্ত।"
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম,
রেগে বলে, "কেবা বোঝে এ-সবের মর্ম?
আরে মোলো, গাধাগুলো একেবারে অন্ধ,
বোঝে নাকো কোনো কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব।
কোন্ কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব—
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত?"

আশে পাশে হিজি বিজি আঁকে কত অঙ্ক—
ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ হিসাব অসংখ্য;
কোন্ ফুটো খেতে ভালো, কোন্‌টা-বা মন্দ,
কোন্ কোন্ ফাটলের কিরকম গন্ধ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক শব্দ,
বলে, "জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ।
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
এ কাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।
কোন্ কাঠ পোষ মানে, কোন্ কাঠ শান্ত,
কোন্ কাঠ টিম্‌টিমে, কোন্‌টা-বা জ্যান্ত।
কোন্ কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন্ কাঠে কেন থাকে গর্ত।"

গোঁফ চুরি

হেড আফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জান্‌ত?
দিব্যি ছিলেন খোসমেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা বসে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হটাৎ গেলেন ক্ষেপে!
আঁৎকে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল!
হটাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল!"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ-বা হাঁকে পুলিশ,
কেউ-বা বলে, "কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস।"
ব্যস্ত সবাই এদিক-ওদিক করছে ঘোরাঘুরি—
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি!"
গোঁফ হারানো! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমে নি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধরে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয় নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।

রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারি নে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

সৎ পাত্র

শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে?
মন্দ নয়, সে পাত্র ভালো—
রঙ যদিও বেজায় কালো;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি? বলছি মশাই—
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়!
উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।
বিষয় আশয়? গরিব বেজায়—
কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে যায়।
মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার–
একটা পাগল একটা গোঁয়ার;
আরেকটি সে তৈরি ছেলে,
জাল ক'রে নোট গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়
যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।
গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংসরাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।—
যাহোক, এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে?

প্যাঁচা আর প্যাঁচানি

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি,
খাসা তোর চ্যাঁচানি!
শুনে শুনে আন্‌মন
নাচে মোর প্রাণমন!
মাজা-গলা চাঁচা সুর
আহ্লাদে ভরপুর!
গলা-চেরা গমকে
গাছ পালা চমকে,
সুরে সুরে কত প্যাঁচ
গিট্‌কিরি ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌!
যত ভয় যত দুখ
দুরু দুরু ধুক্‌ ধুক্‌,
তোর গানে পেঁচি রে
সব ভুলে গেছি রে—
চাঁদামুখে মিঠে গান
শুনে ঝরে দু'নয়ান।

কাতুকুতু বুড়ো

আর যেখানে যাও না রে ভাই সপ্তসাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার!
সর্বনেশে বৃদ্ধ সে ভাই যেও না তার বাড়ি—
কাতুকুতুর কুল্‌পি খেয়ে ছিঁড়বে পেটের নাড়ি।
কোথায় বাড়ি কেউ জানে না, কোন্‌ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর ক'রে ভাই গল্প শোনায় প'ড়ে।
বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্‌ দেশী,
শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি।
না আছে তার মুণ্ডু মাথা, না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাসতে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।
কেবল যদি গল্প বলে তাও থাকা যায় সয়ে,
গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বা পালক লয়ে।
কেবল বলে, "হোঃ হোঃ হোঃ, কেষ্টদাসের পিসি—
বেচ্‌ত খালি কুমড়ো কচু হাঁসের ডিম আর তিসি।
ডিমগুলো সব লম্বা মতন, কুমড়োগুলো বাঁকা,
কচুর গায়ে রঙ-বেরঙের আল্‌পনা সব আঁকা।
অষ্ট প্রহর গাইত পিসি আওয়াজ ক'রে মিহি,
ম্যাও ম্যাও ম্যাও বাকুম বাকুম ভৌ ভৌ ভৌ চীঁহি।"
এই না বলে কুটুৎ ক'রে চিম্‌টি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে সুড়সুড়ি সে আপনি লুটোপুটি,
যতক্ষণ না হাসবে তোমার কিচ্ছুতে নাই ছুটি।

গানের গুঁতো

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা—
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা!
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপণ,
ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্‌ভন্‌।
মরছে কত জখম হয়ে করছে কত ছট্‌ফট্‌—
বলছে হেঁকে, "প্রাণটা গেল, গানটা থামাও ঝট্‌পট্‌।
বাঁধন-ছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত;
ভীষ্মলোচন গাইছে তেড়ে নাইকো তাহে দৃক্‌পাত।
চার পা তুলি জন্তুগুলি পড়ছে বেগে মূর্ছায়,
লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা বলছে রেগে "দূর ছাই!"

জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপচাপ্‌,
গাছের বংশ হচ্ছে ধ্বংস পড়ছে দেদার ঝুপ্‌ঝাপ্‌।
শূন্য মাঝে ঘূর্ণা লেগে ডিগবাজি খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে, "আর না দাদা. গানটা থামাও লক্ষ্মী।"
গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিলকুল,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোশমেজাজে দিল্‌ খুল্‌।
এক যে ছিল পাগলা ছাগল, এমনি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলে গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
'বাপ রে' বলে ভীষ্মলোচন একেবারে ঠাণ্ডা।
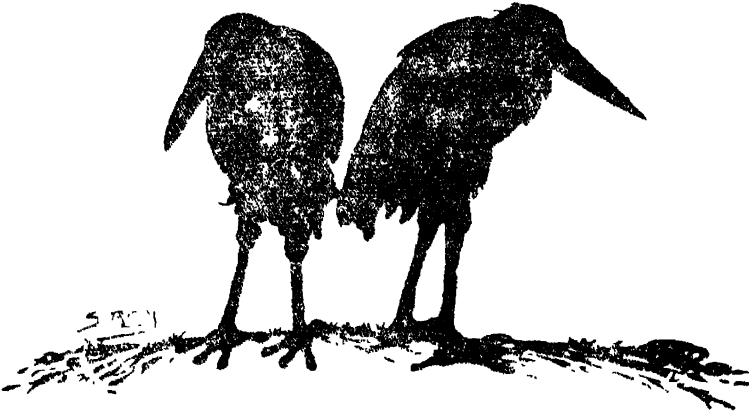
খুড়োর কল

কল করেছেন আজবরকম চণ্ডীদাসের খুড়ো—
সবাই শুনে সাবাস্ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।
খুড়োর যখন অল্প বয়স—বছর খানেক হবে—
উঠ্ল কেঁদে 'গুংগা' বলে ভীষণ অট্টরবে।
আর তো সবাই 'মামা' 'গাগা' আবোল তাবোল বকে,
খুড়োর মুখে 'গুংগা' শুনে চম্‌কে গেল লোকে।
বল্‌লে সবাই, "এই ছেলেটা বাঁচলে পরে তবে,
বুদ্ধি জোরে এ সংসারে একটা কিছু হবে।"
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে,
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘণ্টায় চলে।
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা পাঁচেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা।
বলব কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে একেবারে খাসা।

সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যেরকম রুচি—
মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট্ খাজা কিংবা লুচি।
মন বলে তায় 'খাব খাব', মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে।
এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁস্ রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।
হেসে খেলে দু-দশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।

লড়াই-ক্ষ্যাপা

ওই আমাদের পাগলা জগাই, নিত্যি হেথায় আসে;
আপন মনে গুনগুনিয়ে মুচকি-হাসি হাসে।
চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থমক লেগে থামে,
তড়াক করে লাফ দিয়ে যায় ডাইনে থেকে বামে।
ভীষণ রোখে হাত গুটিয়ে সামলে নিয়ে কোঁচা,
'এইয়ো' বলে ক্ষ্যাপার মতো শূন্যে মারে খোঁচা।
চেঁচিয়ে বলে, "ফাঁদ পেতেছ? জগাই কি তায় পড়ে?
সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।"
উৎসাহেতে গরম হয়ে তিড়িংবিড়িং নাচে,
কখনো যায় সামনে তেড়ে, কখনো যায় পাছে।

এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপ্‌ধাপ্ কত!
চক্ষু বুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মতো।
লাফের চোটে হাঁফিয়ে ওঠে গায়েতে ঘাম ঝরে,
দুড়ুম করে মাটির পরে লম্বা হয়ে পড়ে।
হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচায় খালি চোখটি ক'রে ঘোলা,
"জগাই মোলো হঠাৎ খেয়ে কামানের এক গোলা!"
এই না বলে মিনিট খানেক ছট্‌ফটিয়ে খুব,
মড়ার মতন শক্ত হ'য়ে একেবারে চুপ!
তার পরেতে সটান বসে চুলকে খানিক মাথা,
পকেট থেকে বার করে তার হিসেব লেখার খাতা।
লিখ্‌ল তাতে—"শোন্ রে জগাই, ভীষণ লড়াই হলো,
পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে জগাইদাদা মোলো।"

ছায়াবাজি

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জানো না বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেকরকম পুঁজি!
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুরবেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পানসে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এ-সব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছুপিছু।
তোমরা ভাব গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভূঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে;
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো,
বলছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছট্‌ফটিয়ে এদিক-ওদিক চায়।
সেই সময়ে গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্‌ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাতলা ছায়া, ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।
গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্‌ রে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।

আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়,
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে,
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে!
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

কুম্‌ড়োপটাশ

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে;
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমুলার গাছে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার! খবরদার! বসবে না কেউ ছাদে;
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে;
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কৃষ্ণ রাধে'!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ হাসে—
থাকবে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্নাঘরের পাশে;
ঝাপ্‌সা গলায় ফার্সি কবে নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে;
তিনটি বেলা উপোস করে থাকবে শুয়ে ঘাসে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ছোটে—
সবাই যেন তড়বড়িয়ে জানলা বেয়ে ওঠে;
হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে;
ভুলেও যেন আকাশ পানে তাকায় না কেউ মোটে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ডাকে—
সবাই যেন শাম্‌লা এঁটে গামলা চড়ে থাকে;
ছেঁচকি শাকের ঘণ্ট বেটে মাথায় মলম মাখে;
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে!

তুচ্ছ ভেবে এ-সব কথা করছে যারা হেলা,
কুম্‌ড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।
দেখবে তখন কোন্‌ কথাটি কেমন করে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিও না, আগেই রাখি বলে।
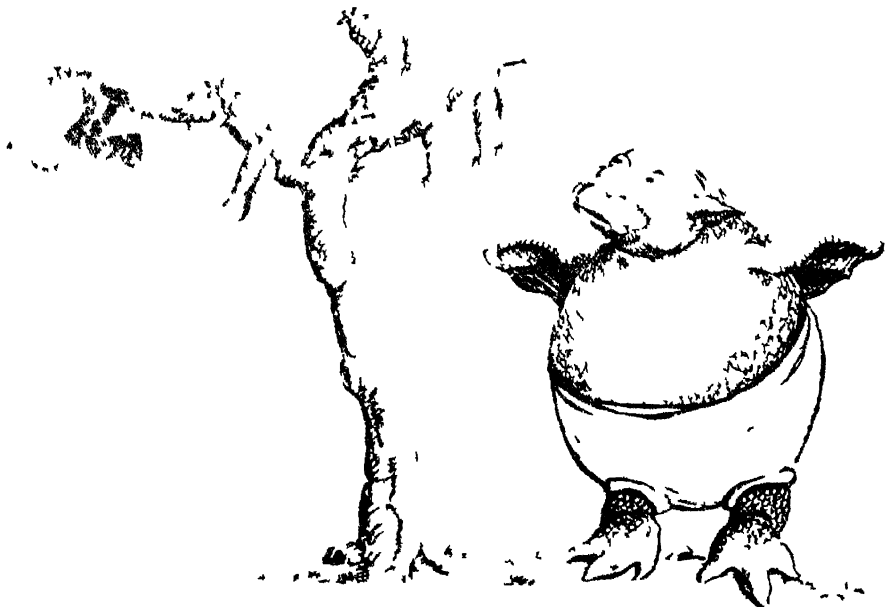
সাবধান

আরে আরে, ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস?
ফোঁস্‌ফোঁস্‌ অত জোরে ফেলো নাকো নিশ্বাস!
জানো না কি সে-বছর ও-পাড়ার ভুতোনাথ,
নিশ্বাস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাৎ?
হাঁপ ছাড় হ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্‌ ওরকম হাঁ করে—
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল' রায়,
মাছি খেয়ে পাঁচমাস ভুগেছিল কলেরায়।
তাই বলি— সাবধান! ক'রো নাকো ধুপ্‌ধাপ্‌,
টিপি টিপি পায় পায় চলে যাও চুপ্‌চাপ্‌।
চেয়ো নাকো আগে পিছে, যেয়ো নাকো ডাইনে
সাবধানে বাঁচে লোকে— এই লেখে আইনে।
পড়েছ তো কথামালা? কে যেন সে কি করে
পথে যেতে পড়ে গেল পাতকোর ভিতরে?
ভালো কথা— আর যেন সকালে কি দুপুরে,
নেয়ো নাকো কোনোদিন ঘোষেদের পুকুরে;

এরকম মোটা দেহে কি যে হবে কোন্‌ দিন,
কথাটাকে ভেবে দেখ কিরকম সঙ্গিন!
চটো কেন? হয় নয় কেবা জানে পষ্ট,
যদি কিছু হয়ে পড়ে পাবে শেষে কষ্ট।
মিছিমিছি ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ কেন কর তর্ক?
শিখেছ জ্যাঠামো খালি, ইঁচড়েতে পক্ক,
মানবে না কোনো কথা চলা ফেরা আহারে,
একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।
রমেশের মেজমামা সেও ছিল সেয়না,
যত বলি ভালো কথা কানে কিছু নেয় না—
শেষকালে একদিন চান্নির বাজারে
পড়ে গেল গাড়ি চাপা রাস্তার মাঝারে!

বাবুরাম সাপুড়ে

বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা—
যে সাপের চোখ্ নেই, শিং নেই, নোখ্ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্‌ফাঁস্, মারে নাকো ঢুঁশ্‌ঢাঁশ,
নেই কোনো উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত—
সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আন্ তো!
তেড়ে মেরে ডাণ্ডা ক'রে দিই ঠাণ্ডা।
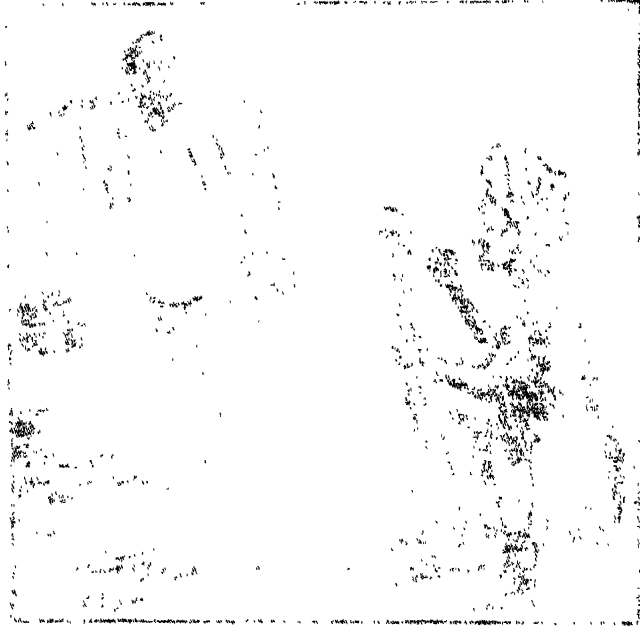
হাতুড়ে

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামৎ—
কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা চট্‌পট্ মেরামৎ।
কয়েছেন গুরু মোর, "শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্‌স।"
উৎসাহে কি না হয়? কি না হয় চেষ্টায়?
অভ্যাসে চট্‌পট্ হাত পাকে শেষটায়।
খেটে খুটে জল হ'ল শরীরের রক্ত—
শিখে দেখি বিদ্যেটা নয় কিছু শক্ত।
কাটা ছেঁড়া ঠুক্‌ঠাক্, কত দেখ যন্ত্র,
ভেঙে চুরে জুড়ে দেই তারও জানি মন্ত্র।
চোখ বুজে চট্‌পট্ বড়-বড় মূর্তি,
যত কাটি ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ তত বাড়ে ফূর্তি।
ঠ্যাং-কাটা গলা-কাটা কত কাটা হস্ত,
শিরিষের আঠা দিয়ে জুড়ে দেয় চোস্ত।
এইবারে বলি তাই, রোগী চাই জ্যান্ত—
ওরে ভোলা, গোটাছয় রোগী ধরে আন্ তো!

গেঁটেবাতে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী,
কিছুতেই সারাবে না এই তার ফন্দি—
একদিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে,
গেঁটেবাত ঘেঁটে-ঘুঁটে সব দেব ঘুলিয়ে।
কার কানে কট্‌কট্ কার নাকে সর্দি,
এস, এস, ভয় কিসে? আমি আছি বদ্যি।
শুয়ে কেরে? ঠ্যাং-ভাঙা? ধ'রে আন্ এখেনে,
স্ক্রুপ দিয়ে এঁটে দেব কিরকম দেখে নে।
গালফোলা কাঁদো কেন? দাঁতে বুঝি বেদনা?
এস এস ঠুকে দেই— আর মিছে কেঁদো না;
এই পাশে গোটা দুই, ওই পাশে তিনটে—
দাঁতগুলো টেনে দেখি— কোথা গেল চিমটে?
ছেলে হও, বুড়ো হও, অন্ধ কি পঙ্গু,
মোর কাছে ভেদ নাই, কলেরা কি ডেঙ্গু—
কালাজ্বর, পালাজ্বর, পুরানো কি টাট্‌কা,
হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আট্‌কা!

চোর ধরা

আরে ছি ছি! রাম রাম! ব'লো না হে ব'লো না—
চল্‌ছে যা জুয়াচুরি, নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক ক'মে যায় খাবারের ভাগেতে!
রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানি নেকো কারা সে—
কালকে যা হ'য়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাট্‌লেট্‌, লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙ্‌নি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!

তাই আজ ক্ষেপে গেছি—কত আর পার্‌ব?
এতদিন স'য়ে স'য়ে এইবারে মার্‌ব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁশিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।
রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোস্‌—
যেই হও এইবারে থেমে যাবে ফোঁস্‌ফোঁস্‌।
খাট্‌বে না জারিজুরি আঁট্‌বে না মার্‌প্যাঁচ্‌,
যারে পাব ঘাড়ে ধ'রে কেটে দেব ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ।
এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।

রোজ বলি 'সাবধান!' কানে তবু যায় না?
ঠেলাখানা বুঝ্‌বি তো এইবারে আয় না।

অবাক কাণ্ড

শুন্‌ছ দাদা! ওই যে হোথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,
সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
শুন্‌ছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে?

চল্‌তে গেলে ঠ্যাং নাকি তার ভুঁয়ের পরে ঠেকে?
কান দিয়ে সব শোনে নাকি? চোখ দিয়ে সব দেখে?
শোয় নাকি সে মুণ্ডুটাকে শিয়র পানে দিয়ে?
হয় কি না হয় সত্যি মিথ্যা চল্‌ না দেখি গিয়ে!

ভাল রে ভাল

দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর—
এই দুনিয়ার সকল ভালো,
আসল ভালো নকল ভালো,
শস্তা ভালো দামীও ভালো,
তুমিও ভালো আমিও ভালো,
হেথায় গানের ছন্দ ভালো,
হেথায় ফুলের গন্ধ ভালো,
মেঘ-মাখানো আকাশ ভালো,
ঢেউ-জাগানো বাতাস ভালো,
গ্রীষ্ম ভালো বর্ষা ভালো,
ময়লা ভালো ফর্‌সা ভালো,
পোলাও ভালো কোর্মা ভালো,
মাছ-পটোলের দোল্‌মা ভালো,
কাঁচাও ভালো পাকাও ভালো,
সোজাও ভালো বাঁকাও ভালো,
কাঁসিও ভালো ঢাকও ভালো,
টিকিও ভালো টাকও ভালো,
ঠেলার গাড়ি ঠেল্‌তে ভালো,
খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভালো,
গিট্‌কিরি গান শুনতে ভালো,
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভালো,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভালো,
কিন্তু সবার চাইতে ভালো—
পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

কিম্ভূত

বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত,
সারাদিন ধ'রে তার শুনি শুধু খুঁতখুঁত।
মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ আব্দারে ঘন ঘন নালিশে।
এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না—
কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।
কোকিলের মতো তার কণ্ঠেতে সুর চাই,
গলা শুনে আপনার বলে, 'উঁহু, দূর ছাই!'
আকাশেতে উড়ে যেতে পাখিদের মানা নেই,
তাই দেখে মরে কেঁদে— তার কেন ডানা নেই!
হাতিটার কী বাহার দাঁতে আর শুঁড়ে—
ওরকম জুড়ে তার দিতে হবে মুণ্ডে!
ক্যাঙ্গারুর লাফ দেখে ভারি তার হিংসে—
ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিম্‌সে!
সিংহের কেশরের মতো তার তেজ কই?
পিছে খাসা গোসাপের খাঁজকাটা লেজ কই?
একলা সে সব হ'লে মেটে তার প্যাখ্‌না;
যারে পায় তারে বলে, 'মোর দশা দেখ্ না!'

কেঁদে কেঁদে শেষটায়— আষাঢ়ের বাইশে—
হ'ল বিন। চেষ্টায় চেয়েছে যা তাই সে।
ভুলে গিয়ে কাঁদাকাটি আহ্লাদে আবেশে
চুপি চুপি একলাটি ব'সে ব'সে ভাবে সে—
লাফ দিয়ে হুশ্ করে হাতি কভু নাচে কি?
কলাগাছ খেলে পরে ক্যাঙ্গারুটা বাঁচে কি?
ভোঁতামুখে কুহুডাক শুনে লোকে কবে কী?
এই দেহে শুঁড়ো নাক খাপছাড়া হবে কি?
'বুড়ো হাতি ওড়ে' ব'লে কেউ যদি গালি দেয়?
কান টেনে ল্যাজ্ ম'লে 'দুয়ো' ব'লে তালি দেয়?
কেউ যদি তেড়েমেড়ে বলে তার সামনেই—
'কোথাকার তুই কেরে, নাম নেই ধাম নেই?'
জবাব কি দেবে ছাই, আছে কিছু বল্‌বার?
কাঁচুমাচু ব'সে তাই. মনে শুধু তোল্‌পাড়—
'নই ঘোড়া. নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু,
মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।
মাছ ব্যাঙ গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,
নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!'

ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক'বার

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা—
ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।
গায়ে আঁটা গরম জামা পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা;
রাজা বলে, "বৃষ্টি নামা— নইলে কিচ্ছু মিলছে না।"
থাকে সারা দুপুর ধ'রে ব'সে ব'সে চুপ্‌টি ক'রে,
হাঁড়িপানা মুখটি ক'রে আঁক্‌ড়ে ধ'রে শ্লেটটুকু;
ঘেমে ঘেমে উঠছে ভিজে ভ্যাবাচ্যাকা একলা নিজে,
হিজিবিজি লিখছে কি যে বুঝছে না কেউ একটুকু।

ঝাঁঝা রোদ আকাশ জুড়ে, মাথাটার ঝাঁঝ্‌রা ফুঁড়ে,
মগজেতে নাচছে ঘুরে রক্তগুলো ঝনর্‌ ঝন্‌;
ঠাঠা'-পড়া দুপুর দিনে, রাজা বলে, "আর বাঁচি নে,
ছুটে আন্‌ বরফ কিনে— ক'চ্ছে কেমন গা ছন্‌ছন্‌।"

সবে বলে, "হায় কি হল! রাজা বুঝি ভেবেই মোলো!
ওগো রাজা মুখটি খোল— কও না ইহার কারণ কি?
রাঙামুখ পান্‌সে যেন তেলে ভাজা আম্‌সি হেন,
রাজা এত ঘামছে কেন— শুনতে মোদের বারণ কি?"

রাজা বলে, "কেইবা শোনে যে কথাটা ঘুরছে মনে,
মগজের নানান্‌ কোণে— আনছি টেনে বাইরে তায়,
সে কথাটা বলছি শোন, যতই ভাব যতই গোণ,
নাহি তার জবাব কোনো কূলকিনারা নাই রে হায়!
লেখা আছে পুঁথির পাতে, 'নেড়া যায় বেলতলাতে,'
নাহি কোনো সন্দ তাতে— কিন্তু প্রশ্ন 'কবার যায়?'
এ কথাটা এদ্দিনেও পারে নিকো বুঝতে কেও,
লেখে নিকো পুস্তকেও, দিচ্ছে না কেউ জবাব তায়।

লাখোবার যায় যদি সে যাওয়া তার ঠেকায় কিসে?
ভেবে তাই পাই নে দিশে নাই কি কিচ্ছু উপায় তার?"
এ কথাটা যেমনি বলা রোগা এক ভিস্তিওলা
ঢিপ্‌ ক'রে বাড়িয়ে গলা প্রণাম করল দু'পায় তাঁর।
হেসে বলে, "আজ্ঞে সে কি? এতে আর গোল হবে কি?
নেড়াকে তো নিত্যি দেখি আপন চোখে পরিষ্কার—
আমাদেরি বেলতলা সে নেড়া সেথা খেলতে আসে
হরে দরে হয়তো মাসে নিদেন পক্ষে পঁচিশ বার।"

বুঝিয়ে বলা
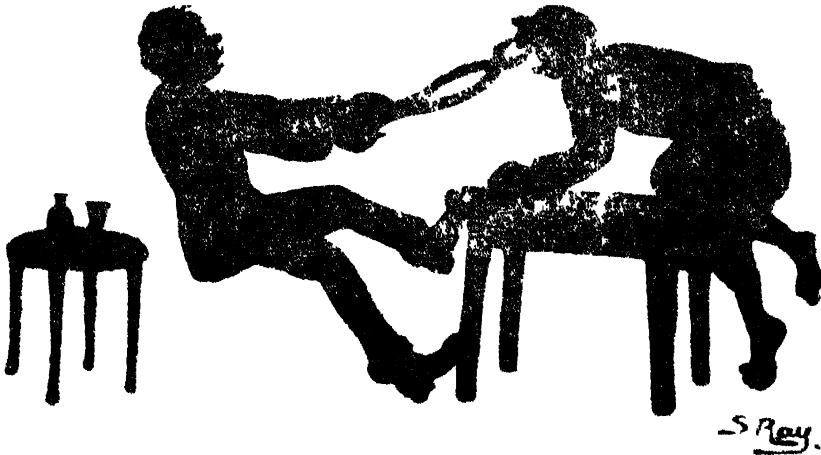
ও শ্যামাদাস! আয় তো দেখি, বোস তো দেখি এখেনে,
সেই কথাটা বুঝিয়ে দেব পাঁচ মিনিটে, দেখে নে।
জ্বর হয়েছে? মিথ্যে কথা! ও-সব তোদের চালাকি—
এই যে বাবা চেঁচাচ্ছিলি, শুনতে পাই নি? কালা কি?
মামার ব্যামো? বদ্যি ডাকবি? ডাকিস নাহয় বিকেলে;
নাহয় আমি বাৎলে দেব বাঁচবে মামা কি খেলে!
আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব—
না বুঝবি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব।
কোন্ কথাটা? তাও ভুলেছিস্? ছেড়ে দিছিস্ হাওয়াতে?
কি বল্ছিলেম পরশু রাতে বিষ্টু বোসের দাওয়াতে?
ভুলিস নি তো বেশ করেছিস্, আবার শুনলে ক্ষেতি কি?
বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস্, মাড়াস্ নে যে এদিক্ই!
বলছি দাঁড়া, ব্যস্ত কেন? বোস্ তাহলে নিচুতেই—
আজকালের এই ছোক্রাগুলোর তর্ সয় না কিছুতেই।
আবার দেখ! বসলি কেন? বইগুলো আন্ নামিয়ে—
তুই থাক্তে মুটের বোঝা বইতে যাব আমি এ?
সাবধানে আন্, ধরছি দাঁড়া— সেই আমাকেই ঘামালি,
এই খেয়েছে! কোন্ আক্কেলে শব্দকোষটা নামালি?
ঢের হয়েছে! আয় দেখি তুই বোস্ তো দেখি এদিকে—
ওরে গোপাল গোটাকয়েক পান দিতে বল্ খেঁদিকে।—
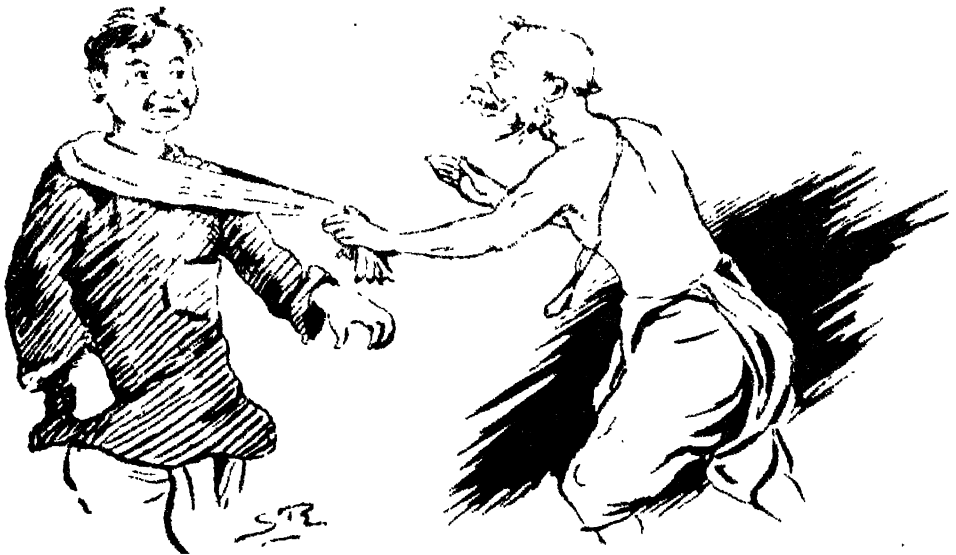
বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর্, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে—
আবার দেখ! এরই মধ্যে হাই তোলবার মানে কি?
আকাশপানে তাকাস্ খালি, যাচ্ছে কথা কানে কি?
কি বল্লি তুই? এ-সব শুধু আবোল তাবোল বকুনি?
বুঝতে হলে মগজ লাগে, ব'লেছিলাম তখনি।
মগজভরা গোবর তোদের হচ্ছে ঘুঁটে শুকিয়ে,
যায় কি দেওয়া কোনো কথা তার ভিতরে ঢুকিয়ে?—
ও শ্যামাদাস! উঠলি কেন? কেবল যে চাস্ পালাতে!
না শুনবি তো মিথ্যে সবাই আসিস্ কেন জ্বালাতে?
তত্ত্বকথা যায় না কানে যতই মরি চেঁচিয়ে—
ইচ্ছে করে ডান্‌পিটেদের কান ম'লে দি পেঁচিয়ে।

শব্দকল্পদ্রুম

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা—
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্‌পন্, ভয়ে কান্ বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপ্‌ধাপ্— ওকি শুনি ভাই রে!
দেখ্‌ছ না হিম পড়ে— যেও নাকো বাইরে।
চুপ চুপ ঐ শোন্! ঝুপ্ ঝাপ্ ঝ—পাস!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল?—গব্ গব্ গ—বাস!
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ওই রে!
দুড়্ দাড়্ চুরমার— ঘুম ভাঙে কই রে!
ঘর্‌ঘর্ ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন নাচে শোন্— ধেই ধেই ধিন্‌তা!
ঠুং ঠাং ঢং ঢং, কত ব্যথা বাজে রে—
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হৈ হৈ মার্ মার্ 'বাপ্ বাপ্' চিৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড়্ এইবার।

বুড়ির বাড়ি

গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি,
ঝুরঝুরে প'ড়ো ঘরে থুরথুরে বুড়ি।
কাঁথাভরা ঝুলকালি, মাথাভরা ধুলো,
মিট্‌মিটে ঘোলা চোখ, পিটখানা কুলো।
কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর— আঠা দিয়ে সেঁটে,
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতু দিয়ে চেটে।
ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে,
খক্ খক্ কাশি দিলে ঠক্ ঠক্ নড়ে।
ডাকে যদি ফিরিওয়ালা, হাঁকে যদি গাড়ি,
খসে পড়ে কড়িকাঠ ধসে পড়ে বাড়ি।
বাঁকাচোরা ঘরদোর ফাঁকা ফাঁকা কত,
ঝাঁট দিলে ঝ'রে পড়ে কাঠকুটো যত।
ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে,
একা বুড়ি কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি,
থুর্‌থুরে বুড়ি তার ঝুর্‌ঝুরে বাড়ি॥

আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে,
দেখে চেয়ে কত লোক সব কাজ ফেলে;
তাই দেখে খুঁতধরা বুড়ো কয় চটে,
দেখছ কি, এই রঙ পাকা নয় মোটে॥

ঢপ্ ঢপ্ ঢাক ঢোল ভপ্ ভপ্ বাঁশি,
ঝন্ ঝন্ করতাল্ ঠন্ ঠন্ কাঁসি।
ধুমধাম বাপ্ বাপ্ ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা,
বাবুদের ছেলেটার দাঁত গেছে দেখা॥

বোম্বাগড়ের রাজা

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা—

ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?

রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?

পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?

কেন সেথায় সর্দি হ'লে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে?

জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে?

ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?

টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে!

রাত্রে কেন ট্যাঁক্‌ঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে?

কেন রাজার বিছ্‌না পাতে শিরিষ কাগজ দিয়ে?

সভায় কেন চেঁচায় রাজা 'হুক্কা হুয়া' ব'লে?

মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে?

সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?

কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?

রাজার খুড়ো নাচেন কেন হুঁকোর মালা প'রে?

এমন কেন ঘটছে তা কেউ বলতে পার মোরে?
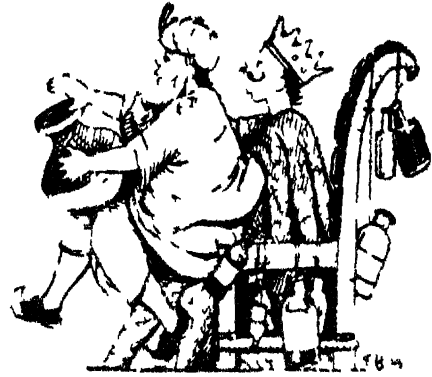
একুশে আইন

শিব ঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছ্‌লে প'ড়ে
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার॥

সেথায় সন্ধে ছ'টার আগে,
হাঁচতে হ'লে টিকিট লাগে,
হাঁচ্‌লে পরে বিন্‌টিকিটে—
দম্‌দমাদম্‌ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে॥

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্‌স চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার॥

চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিক-ওদিক ডাইনে বাঁয়,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাতা জল গেলায়॥

যে-সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধ'রে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান্‌ সুরে,
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা॥

হঠাৎ সেথায় রাত দুপুরে,
নাক ডাকালে ঘুমের ঘোরে,
অম্‌নি তেড়ে মাথায় ঘষে,
গোবর গুলে বেলের কষে,
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে
একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে॥

হ্ঁকোম্খো হ্যাংলা বাড়ি তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?
নাই তার মানে কি? কেউ তাহা জানে কি?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?
শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার,
আর তার কেহ নাই এ-ছাড়া—
তাই বুঝি একা সে মুখখানা ফ্যাকাশে,
ব'সে আছে কাঁদ'-কাঁদ' বেচারা?
থপ্ থপ্ পায়ে সে নাচ্ত যে আয়েসে,
গালভরা ছিল তার ফুর্তি,
গাইতো সে সারাদিন 'সারে গামা টিম্‌টিম্'
আহ্লাদে গদ-গদ মূর্তি।
এই তো সে দুপ'রে বসে ওই উপরে,
খাচ্ছিল কাঁচকলা চট্‌কে—
এর মাঝে হল কি? মামা তার মোলো কি?
অথবা কি ঠ্যাং গেল মট্‌কে?
হ্ঁকোম্খো হেঁকে কয়, "আরে দূর, তা তো নয়,
দেখছ না কিরকম চিন্তা?
মাছি মারা ফন্দি এ যত ভাবি মন দিয়ে—
ভেবে ভেবে কেটে যায় দিনটা।

বসে যদি ডাইনে, লেখে মোর আইনে—
এই ল্যাজে মাছি মারি ত্রস্ত;
বামে যদি বসে তাও, নহি আমি পিছপাও,
এই ল্যাজে আছে তার অস্ত্র।
যদি দেখি কোনো পাজি বসে ঠিক মাঝামাঝি
কি যে করি ভেবে নাহি পাই রে—
ভেবে দেখ একি দায় কোন্ ল্যাজে মারি তায়
দুটি বৈ ল্যাজ মোর নাই রে।"

দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম

ছুটছে মোটর ঘটর ঘটর ছুটছে গাড়ি জুড়ি;
ছুটছে লোকে নানান্ ঝোঁকে করছে হুড়োহুড়ি;
ছুটছে কত ক্ষ্যাপার মতো পড়ছে কত চাপা—
সাহেব মেমে থম্‌কে থেমে বলছে 'মামা! পাপা!'
আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

বর্ষাকালের বৃষ্টিবাদল রাস্তা জুড়ে কাদা,
ঠাণ্ডা রাতে সর্দিবাতে মরবি কেন দাদা?
হোক্ না সকাল হোক্ না বিকাল
হোক্ না দুপুর বেলা,
থাক্ না তোমার আপিস যাওয়া
থাক্ না কাজের ঠেলা—
এই দেখ না চাঁদ্‌নি রাতের গান এনেছি কেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

মুখ্যু যারা হচ্ছে সারা পড়ছে ব'সে একা,
কেউ-বা দেখ কাঁচুর মাচুর
কেউ-বা ভ্যাবাচ্যাকা;
কেউ-বা ভেবে হন্দ হল, মুখটি যেন কালি;
কেউ-বা ব'সে বোকার মতো মুণ্ডু নাড়ে খালি।
তার চেয়ে ভাই, ভাবনা ভুলে গাও না গলা ছেড়ে
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

বেজার হয়ে যে যার মতো করছ সময় নষ্ট,
হাঁটছ কত খাটছ কত পাচ্ছ কত কষ্ট!
আসল কথা বুঝছ না যে, করছ না যে চিন্তা,
শুনছ না যে গানের মাঝে তবলা বাজে ধিন্‌তা?
পাল্লা ধরে গায়ের জোরে গিটকিরি দাও ঝেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম্—
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম॥

বল্‌ব কি ভাই হুগ্‌লি গেলুম,
বল্‌ছি তোমায় চুপি-চুপি—
দেখতে পেলাম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি॥
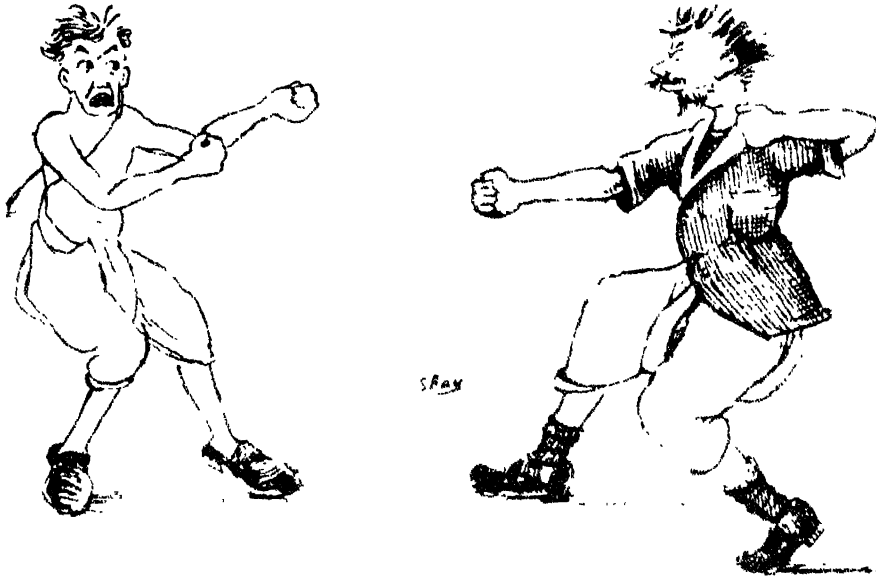
নারদ নারদ

"হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল   সাদাকে বল্‌ছিলি লাল?
(আর) সেদিন নাকি রাত্রি জুড়ে   নাক ডেকেছিস বিশ্রী সুরে?
(আর) তোদের পোষা বেড়ালগুলো   শুনছি নাকি বেজায় হুলো?
(আর) এই যে শুনি তোদের বাড়ি   কেউ নাকি রাখে না দাড়ি?
ক্যান্‌ রে ব্যাটা ইস্‌টুপিড?   ঠেঙিয়ে তোরে কর্‌ব ঢিট্‌!"
"চোপরাও তুম্‌ স্পিক্‌টি নট্‌,   মার্‌ব রগে পটাপট্‌—
ফের যদি ট্যারাবি চোখ   কিম্বা আবার কর্‌বি রোখ,
কিম্বা যদি অম্‌নি করে   মিথ্যেমিথ্যি চ্যাঁচাস জোরে—
আই ডোন্ট কেয়ার্‌ কানাকড়ি—জানিস্‌ আমি স্যান্ডো করি?
ফের লাফাচ্ছিস্‌? অল্‌রাইট্‌   কামেন্‌ ফাইট্‌! কামেন্‌ ফাইট্‌!"
"ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি,   টেরটা পাবে আজ এখনি।
আজকে যদি থাক্‌ত মামা   পিটিয়ে তোমায় কর্‌ত ঝামা।
আরে! আরে! মার্‌বি নাকি?   দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি!
হাঁহাঁহাঁহাঁ! রাগ ক'রো না   কর্‌তে চাও কি তাই বল না?"
"হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো সত্যি বটেই   আমি তো চটি নি মোটেই!
মিথ্যে কেন লড়তে যাবি?   ভেরি-ভেরি সরি, মসলা খাবি?
'শেক্‌হ্যান্ড' আর 'দাদা' বল   সব শোধ বোধ ঘরে চল।
ডোন্ট পরোয়া অল্‌ রাইট্‌   হাউ ডুয়ুডু গুড্‌ নাইট্‌।"

কি মুস্কিল

সব লিখেছে এই কেতাবে দুনিয়ার সব খবর যত,
সরকারী সব আফিসখানার কোন্ সাহেবের কদর কত।
কেমন ক'রে চাট্‌নি বানায়, কেমন ক'রে পোলাও করে,
হরেক্ রকম মুষ্টিযোগের বিধান লিখছে ফলাও ক'রে।
সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দা কেতা,
পূজা পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখছে হেথা।
সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছি নেকো লেখা কোথায়—
পাগলা ষাঁড়ে কর্‌লে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!

ভূতুড়ে খেলা

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছ্‌নাতে।

কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত-পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকি হাসি কট্‌কটে—
দেখছে নেড়ে ঝুন্‌টি ধ'রে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক ছেড়ে,
খ্যাঁশ্‌ খ্যাঁশানি শব্দে যেন করাত দিয়ে কাঠ চেরে!
যেমন খুশি মারছে ঘুঁষি, দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা।
বলছে আবার, "আয় রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে,
দেখ না ফিরে প্যাখ্‌না ধরে হুতোম-হাসি মুখ করে!

ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁৎকা রে,
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁৎকা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টি রে,
ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি রে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছ্‌না হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবরাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্‌ রে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস রে—"
এই না ব'লে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট্‌ ক'রে,
কোথায়-বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্‌ ক'রে!

ডানপিটে

বাপ্‌ রে কি ডানপিটে ছেলে!—
কোন্‌ দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে,
ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙে শেলেট দিয়ে ঠুকে!
অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে,
খাট থেকে রাগ ক'রে দুম্‌দাম্‌ পড়ে!

বাপ্‌ রে কি ডানপিটে ছেলে!—
শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে!
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘ'ষে,
এক মনে মোমবাতি দেশলাই চোষে!
আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে,
কপ্‌কপ্‌ মাছি ধ'রে মুখে দেয় তুলে!

বাপ্‌ রে কি ডানপিটে ছেলে!—
খুন হ'ত টম্‌ চাচা ওই রুটি খেলে!
সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে,
রেগে তাই দুই ভাই ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ফোলে!
নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে,
বাপ্‌ বাপ্‌ ব'লে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে

শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টক্‌টক্‌ গন্ধ?
টক্‌টক্‌ থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

কহ ভাই কহ রে, অ্যাঁকা চোরা শহরে,
বদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না?
লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে,
ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না!

রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাসব না-না, না-না!"
সদাই মরে ত্রাসে— ওই বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে!"
যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!
সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে!
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।
হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা,
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়,
নিষেধ সেথায় হাসা।
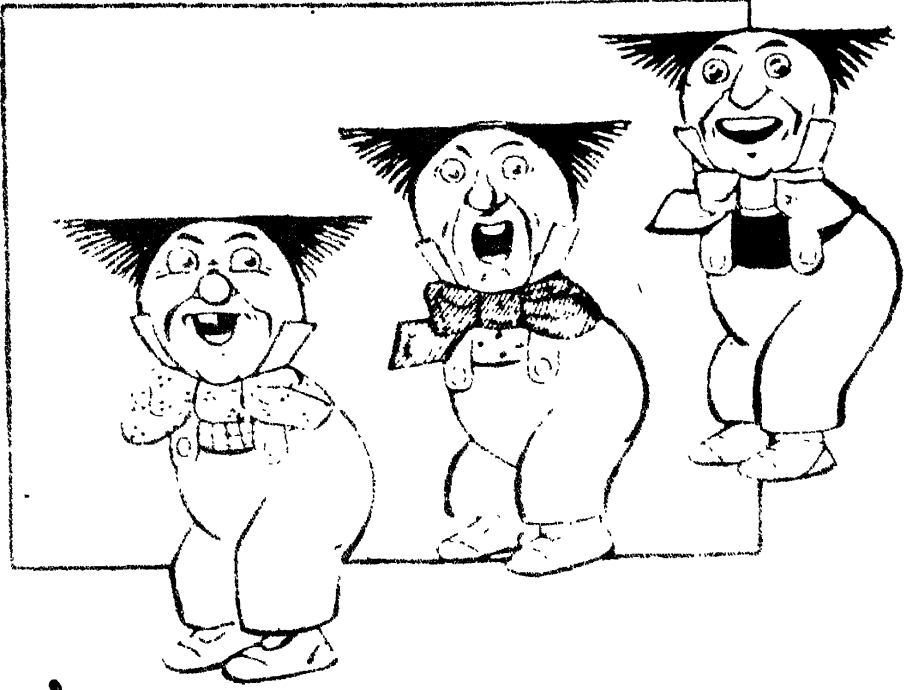
আহ্লাদী

হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিনজনেতে জট্‌লা ক'রে ফোক্‌লা হাসির পাল্লা দি।
হাসতে হাসতে আসছে দাদা আসছি আমি আসছে ভাই,
হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।
ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ ক'রে,
ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক ক'রে।
পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে,
পাচ্ছে হাসি চিম্‌টি কেটে নাকের ভিতর নোখ গুঁজে।
হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড়।
পড়তে গিয়ে ফেলছি হেসে 'ক খ গ' আর শ্লেট দেখে—
উঠছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।

ও পাড়ার নন্দ গোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।
ছিল না তার অসুখবিসুখ, ছিল সে যে মনের সুখে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকোহাতে হাস্যমুখে।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হল, চলল সে তার হাত দেখাতে—
ফিরে এল শুকনো সরু, ঠকাঠক্ কাঁপছে দাঁতে!
শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।
শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশাই,
সবাই বলে, 'কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দ গোঁসাই?'

খুড়ো বলে, 'বলব কি আর, হাতে আমার পষ্ট লেখা
আমার ঘাড়ে আছেন শনি, ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখা।
এতদিন যায় নি জানা ফিরছি কত গ্রহের ফেরে—
হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখবে কে রে?
ষাটটা বছর পার হয়েছি বাপদাদাদের পুণ্যফলে—
ওরে তোদের নন্দ খুড়ো এবার বুঝি পটোল তোলে।
কবে যে কি ঘটবে বিপদ কিছু হায় যায় না বলা—
এই ব'লে সে উঠল কেঁদে ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা।
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো,
বুড়ো আছে নেই কো হাসি, হাতে তার নেই কো হুঁকো।

শোন শোন গল্প শোন, 'এক যে ছিল গরু,'
এই আমার গল্প হল শুরু।
যদু আর বংশীধর যমজ ভাই তারা,
এই আমার গল্প হল সারা।

গন্ধ বিচার

সিংহাসনে বস্‌ল রাজা বাজল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্‌ফটিয়ে উঠল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা, "মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?"
মন্ত্রী বলে, "এসেন্স দিছি—গন্ধ তো নয় মন্দ!"
রাজা বলেন, "মন্দ ভালো দেখুক শুঁকে বদ্যি,"
বদ্যি বলে, "আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।"
রাজা হাঁকেন, "বোলাও তবে—রাম নারায়ণ পাত্র।"
পাত্র বলে, "নস্যি নিলাম এক্ষনি এইমাত্র—
নস্যি দিয়ে বন্ধ যে নাক গন্ধ কোথায় ঢুকবে?"
রাজা বলেন, "কোটাল তবে এগিয়ে এস, শুঁকবে।"
কোটাল বলে, "পান খেয়েছি মশলা তাহে কর্পূর,
গন্ধে তারি মুণ্ড আমার একেবারে ভরপুর।"
রাজা বলেন, "আসুক তবে শের পালোয়ান ভীমসিং,"
ভীম বলে "আজ কচ্ছে আমার সমস্ত গা ঝিম্‌ ঝিম্‌।
রাত্রে আমার বোখার হল বলছি হুজুর ঠিক বাৎ,"
ব'লেই শুল রাজসভাতে চক্ষু বুজে চিৎপাত।
রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধ'রে শেষটা,
বল্‌ল রাজা, "তুমিই নাহয় কর না ভাই চেষ্টা।"
চন্দ্র বলেন, "মারতে চাও তো ডাকাও নাকো জল্লাদ,
গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কি আহ্লাদ?"
ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির বয়সটি তার নব্বই,
ভাবল মনে, 'ভয় কেন আর একদিন তো মরবই—'
সাহস ক'রে বল্‌লে বুড়ো, "মিথ্যে সবাই বকছিস,
শুঁকতে পারি হুকুম পেলে এবং পেলে বক্‌শিশ্‌।"
রাজা বলেন, "হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য",
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠল বুড়ো মদ্দ।
জামার পরে নাক ঠেকিয়ে—শুঁকল কত গন্ধ,
রইল অটল দেখল লোকে বিস্ময়ে বাক্‌ বন্ধ।
রাজ্যে হল জয় জয়কার বাজল কাঁসর ঢক্কা,
বাপ রে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না সে যে অক্কা?

কাঁদুনে
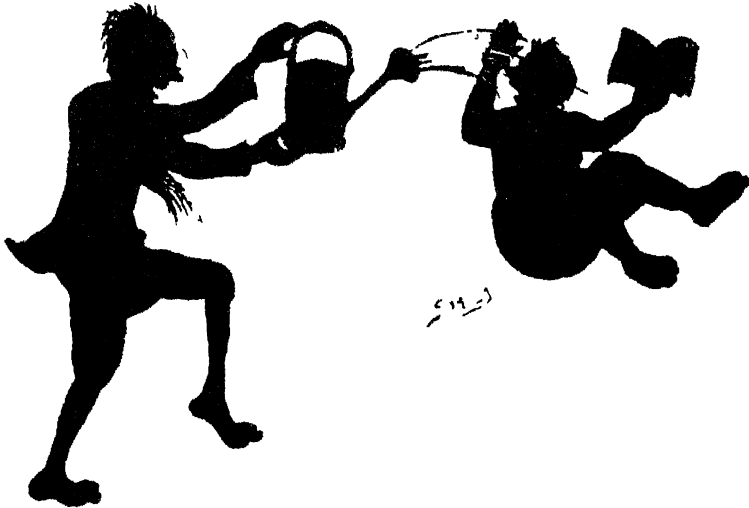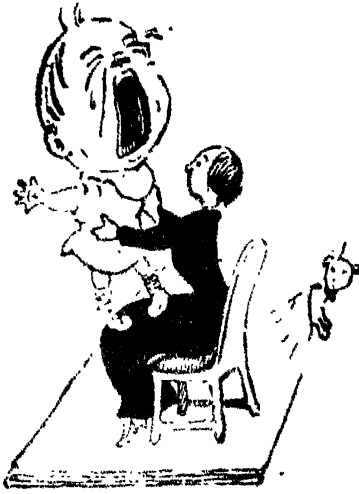
ছিঁচ্‌কাঁদুনে মিচ্‌কে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘ্যাঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানে আর প্যানপ্যানে—
কুঁকিয়ে কাঁদে ক্ষিদের সময়, ফুঁপিয়ে কাঁদে ধম্‌কালে,
কিম্বা হঠাৎ লাগলে ব্যথা, কিম্বা ভয়ে চম্‌কালে;
অল্পে হাসে অল্পে কাঁদে, কান্না থামায় অল্পেতেই,
মায়ের আদর দুধের বোতল কিম্বা দিদির গল্পেতেই—
তারেই বলি মিথ্যে কাঁদন; আসল কান্না শুনবে কে?
অবাক্ হবে থম্‌কে রবে সেই কাঁদনের গুণ দেখে!
নন্দঘোষের পাশের বাড়ি বুথ্ সাহেবের বাচ্চাটার
কান্নাখানা শুনলে বলি কান্না বটে সাচ্চা তার।
কাঁদবে না সে যখন তখন, রাখবে কেবল রাগ পুষে,
কাঁদবে যখন খেয়াল হবে খুন-কাঁদুনে রাক্ষুসে!
নাইকো কারণ নাইকো বিচার মাঝরাতে কি ভোরবেলা,
হঠাৎ শুনি অর্থবিহীন আকাশ-ফাটন জোর গলা।
হাঁকড়ে ছোটে কান্না যেমন জোয়ার বেগে নদীর বান,
বাপ-মা বসেন হতাশ হয়ে শব্দ শুনে বধির কান।
বাস্ রে সে কি লোহার গলা? এক মিনিটও শান্তি নেই?
কাঁদন ঝরে শ্রাবণ ধারে, ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই!
ঝুমঝুমি দাও, পুতুল নাচাও, মিষ্টি খাওয়াও একশোবার,
বাতাস কর, চাপড়ে ধর, ফুটবে নাকো হাস্য তার।
কান্নাভরে উল্‌টে পড়ে কান্না ঝরে নাক দিয়ে,
গিল্‌তে চাহে দালানবাড়ি হাঁ'খানি তার হাঁক্ দিয়ে,
ভূত-ভাগানো শব্দে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—
কান্না শুনে ধন্যি বলি বুথ সাহেবের বাচ্চারে।

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা,
জট্‌বাঁধা ঝুল কালো বটগাছতলে,
ধক্‌ধক্‌ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে,
চুপচাপ চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলো,
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
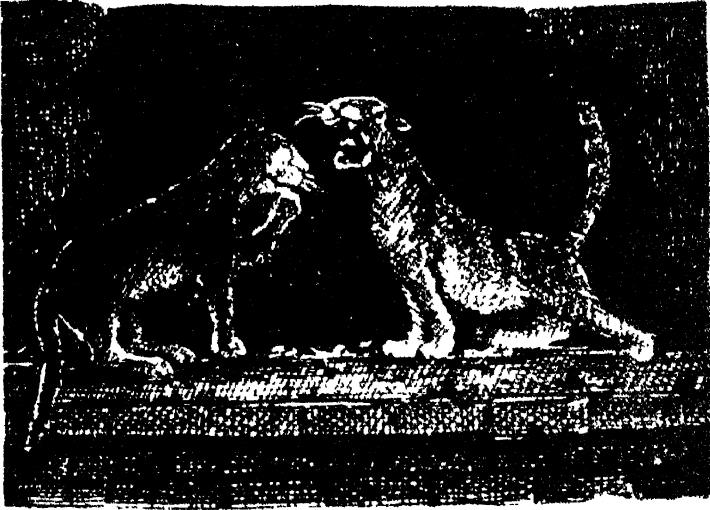
গীত গাই কানে কানে চিৎকার ক'রে,
কোন্‌ গানে মন ভেজে শোন্‌ বলি তোরে।
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ্‌ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্‌ ক'রে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়্‌ দুড়্‌ ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা,
ধুক ক'রে নিভে গেল বুকভরা আশা;
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিল্‌কুল্‌ সব দেখি ভেল্‌কির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন চিম্‌নির কালি।
মন-ভাঙা দুখ্‌ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।

ঠিকানা

আরে আরে জগমোহন— এস, এস, এস—
বল্‌তে পার কোথায় থাকে আদ্যানাথের মেসো?
আদ্যানাথের নাম শোন নি? খগেনকে তো চেনো?
শ্যাম বাগ্‌চি খগেনেরই মামাশ্বশুর জেনো।
শ্যামের জামাই কেষ্টমোহন, তার যে বাড়িওলা—
(কি যেন নাম ভুলে গেছি), তারই মামার শালা;
তারই পিসের খুড়তুতো ভাই আদ্যানাথের মেসো,
লক্ষ্মী দাদা, ঠিকানা তার একটু জেনে এসো।
ঠিকানা চাও? বলছি শোন; আমড়াতলার মোড়ে,
তিন-মুখো তিন রাস্তা গেছে, তারি একটা ধ'রে
চল্‌বে সিধে নাকবরাবর, ডানদিকে চোখ রেখে,
চল্‌তে চল্‌তে দেখবে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে।
দেখবে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে পথ গিয়েছে কত,
তারি ভিতর ঘুরবে খানিক গোলকধাঁধার মতো।
তার পরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে মোচড় মেরে,
ফিরবে আবার বাঁয়ের দিকে তিনটে গলি ছেড়ে।
তবেই আবার পড়বে এসে আমড়াতলার মোড়ে,
তার পরে যাও যেথায় খুশি, জ্বালিয়ো নাকো মোরে।

গল্প বলা

"এক যে রাজা"—"থাম্ না দাদা,
রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা।"
"তার যে মাতুল"—"মাতুল কি সে?
সবাই জানে সে তার পিসে।"
"তার ছিল এক ছাগল ছানা"—
"ছাগলের কি গজায় ডানা?"
"একদিন তার ছাতের 'পরে"—
"ছাত কোথা হে টিনের ঘরে?"
"বাগানের এক উড়ে মালী"—
"মালী নয়তো! মেহের আলি"—
"মনের সাধে গাইছে বেহাগ,"
"বেহাগ তো নয়! বসন্ত রাগ।"

"থও না বাপু ঘ্যাচা ঘেঁচি"—
"আচ্ছা বল, চুপ করেছি।"
"এমন সময় বিছ্‌না ছেড়ে,
হঠাৎ মামা আস্‌ল তেড়ে,
ধর্‌ল সে তার ঝুঁটির গোড়া—"
"কোথায় ঝুঁটি? টাক যে ভরা।"
"হোক না টেকো তোর তাতে কি?
লক্ষ্মীছাড়া মুখ্যু ঢেঁকি!
ধর্‌ব ঠেসে টুঁটির 'পরে,
পিটব তোমার মুণ্ডু ধ'রে—
কথার উপর কেবল কথা,
এখন বাপু পালাও কোথা?"

নোট বই

এই দেখ পেনসিল্, নোটবুক এ-হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিল্‌বিল লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট্‌পট্ লিখি তায়-
ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায়;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্,
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্।
দেখে শিখে প'ড়ে শুনে ব'সে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কান করে কট্‌কট্ ফোড়া করে টন্‌টন্—
ওরে রামা ছুটে আয়, নিয়ে আয় লণ্ঠন।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা,
ঝোলাগুড় কিসে দেয়? সাবান না পট্‌কা—
এই বেলা প্রশ্নটা লিখে রাখি গুছিয়ে,
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
পেট কেন কাম্‌ড়ায় বল দেখি পার কে?
বল দেখি ঝাঁজ কেন জোয়ানের আরকে?
তেজপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?
কার নাম দুন্দুভি? কাকে বলে অরণি?
বল্‌বে কি, তোমরাও নোটবই পড় নি।

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না—
সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পারব না।
মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না—
জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এস এস গর্তে এস, বাস ক'রে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রিদিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাকবে না?
মুগুর আমার হাল্‌কা এমন মারলে তোমার লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

ট্যাঁশ্ গরু

ট্যাঁশ্ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে;
যার খুশি দেখে এস হারুদের আফিসে।
চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।
তিন-বাঁকা শিং তার, ল্যাজখানি প্যাঁচান—
একটুকু ছোঁও যদি, বাপ্ রে কি চ্যাঁচান!
লট্‌খটে হাড়গোড় খট্‌খট্ ন'ড়ে যায়,
ধমকালে ল্যাগ্‌ব্যাগ্ চমকিয়ে প'ড়ে যায়।
বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার,
চেহারার কি বাহার—ঐ দেখ ছবি তার।
ট্যাঁশ্ গরু খাবি খায় ঠ্যাস দিয়ে দেয়ালে,
মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে না জানি কি খেয়ালে;
মাঝে মাঝে তেড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে রেগে যায়,
মাঝে মাঝে কুপোকাৎ দাঁতে দাঁত লেগে যায়।
খায় না সে দানাপানি—ঘাস পাতা বিচালি,
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি;
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে,
সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্‌খক্,
সারা গায়ে ঘিন্‌ঘিন্ ঠ্যাং কাঁপে ঠক্‌ঠক্।
একদিন খেয়েছিল ন্যাক্‌ড়ার ফালি সে—
তিন মাস আধমরা শুয়েছিল বালিশে।
কারো যদি শখ্ থাকে ট্যাঁশ গরু কিন্‌তে,
শস্তায় দিতে পারি, দেখ ভেবে চিন্তে।

ফস্‌কে গেল

দেখ্‌ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি   দেখ্‌ রে খেলা দেখ্‌ চালাকি,
ভোজের বাজি ভেল্‌কি ফাঁকি   পড়্‌ পড়্‌ পড়্‌ পড়্‌বি পাখি—ধপ্‌!

লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে   তাক্‌ ক'রে যাই তীর ধনুকে,
ছাড়্‌ব সটান ঊর্ধ্বমুখে   হুশ ক'রে তোর লাগ্‌বে বুকে—খপ্‌!

গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়িয়ে হামা   খাপ্‌ পেতেছেন গোষ্ঠমামা,
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা,   এইবারে বাণ চিড়িয়া নামা—চট্‌!

ওই যা! গেল ফস্কে ফেঁসে—   হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে?
ঘ্যাঁচ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে   লাগ্‌ল কি বাণ ছুট্‌কে এসে—ফট্‌?

খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন।
একদিন এক গুণ্ডা তাকে বাঁশ বাগিয়ে মার্‌ল বেগে—
ভাঙল সে-বাঁশ শোলার মতো মট্ ক'রে তার কনুই লেগে।
এই তো সেদিন রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে দৈব বশে,
উপর থেকে প্রকাণ্ড ইঁট পড়ল তাহার মাথায় খ'সে।
মুণ্ডুতে তার যেম্‌নি ঠেকা অম্‌নি সে ইঁট এক নিমেষে,
গুঁড়িয়ে হ'ল ধুলোর মতো, ষষ্ঠি চলেন মুচ্‌কি হেসে।
ষষ্ঠি যখন ধমক হাঁকে কাঁপতে থাকে দালান বাড়ি,
ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্টে পড়ে গরুর গাড়ি।
ধুম্‌সো কাঠের তক্তা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্তেকে,
একশো জালা জল ঢালে রোজ স্নানের সময় পুকুর থেকে।
সকাল বেলার জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া,
সঙ্গে তারি চৌদ্দ হাঁড়ি দই কি মালাই মুড়কি দেওয়া।
দুপুর হলে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্‌চি ভ'রে,
বরফ দেওয়া উনিশ কুঁজো সরবতে তার তৃষ্ণা হরে।
বিকাল বেলা খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া,
সন্ধ্যা হ'লে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।
রাত্রে সে তার হাত-পা টেপায় দশটি চেলা মজুত থাকে,
দুম্‌দুমাদুম্ সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায় তাকে।
বল্‌লে বেশি ভাববে শেষে এ-সব কথা ফেনিয়ে বলা—
দেখবে যদি আপন চোখে যাও না কেন বেনিয়াটোলা।
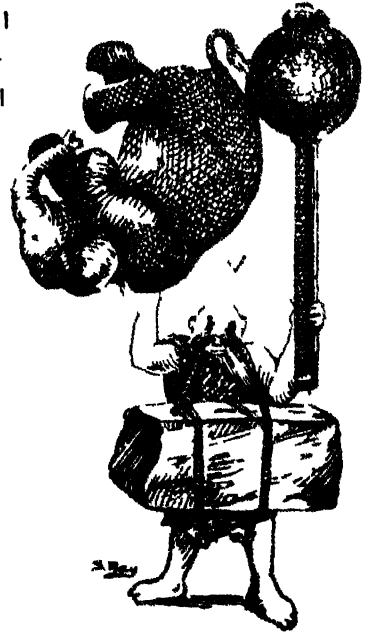
বিজ্ঞান শিক্ষা

আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটস্কোপ' দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।
কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন দিকে থেকে যায় চাপা;
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্‌ঠকে ফাঁপা।
মন তোর কোন্ দেশে থাকে, কেন তুই ভুলে যাস্ কথা—
আয় দেখি কোন্ ফাঁক দিয়ে, মগজেতে ফুটো তোর কোথা।
টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা ফাটা-মতো মনে হয় যেন,
আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে—চোপ্‌রও ভয় পাস্ কেন?
কাৎ হয়ে কান ধ'রে দাঁড়া, জিভখানা উল্‌টিয়ে দেখা,
ভালো ক'রে বুঝে শুনে দেখি—বিজ্ঞানে যেরকম লেখা।
মুণ্ডুতে 'ম্যাগনেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্‌ট' ক'রে,
ইঁট দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'ষে দেখি মাথা ঘোরে কি-না ঘোরে।

আবোল তাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,
রামধনুকের আব্‌ছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন-দোলা হাওয়ায় দোলে
সুরের নেশার ঝরনা ছোটে,
আকাশকুসুম আপনি ফোটে
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ!
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে
নাই-বা তাহার অর্থ হোক্‌
নাই-বা বুঝুক বেবাক্‌ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্‌ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট্‌ ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্‌
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্‌।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!
হ্যাংলা হাতি চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

দেশ-বিদেশের গল্প

'সন্দেশে'র ডালিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে দেশ-বিদেশের নানাকথা সংগ্রহ করতেন রায়পরিবার। সুকুমার রায়ের অবদানেরও শুরু সেখান থেকেই। হাস্যরস তাঁর প্রধান প্রতিভা হলেও যে বিচিত্র সাহিত্যিক দক্ষতা তাঁর ছিল তার প্রমাণ আগের গুচ্ছের কবিতায় আর এই গুচ্ছের গল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে।

এর মধ্যে 'অন্ধের বর চাওয়া' (অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩২৬) আর 'একটি বর' (শ্রাবণ, ১৩২৮) একই গল্পের সামান্য পরিবর্তিত দুই রূপ বলে প্রথম রূপটি এখানে গৃহীত হয়েছে, দ্বিতীয়টি পরিশিষ্টে দেওয়া হবে।

সূচীপত্র

ওয়াসিলিসা

ওয়াসিলিসা এক সওদাগরের মেয়ে। তার মা ছিল না, কেউ ছিল না– ছিল খালি এক দুষ্টু সৎমা আর ছিল সেই সৎমার দুটো ডাইনির মতো মেয়ে।

ওয়াসিলিসার মা যখন মারা যান, তখন তিনি তাকে একটা কাঠের পুতুল দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, "একে কখনো ছেড়ো না, সর্বদা কাছে কাছে রেখো, আর যখন তোমার বিপদ-আপদ ঘটবে, একে চারটি কিছু খেতে দিও। তবেই দেখবে, এ মানুষের মতো তোমার সঙ্গে কথা বলবে; তখন এর পরামর্শ মতো চোলো।" তার পরে এতদিনে ওয়াসিলিসা বড় হয়ে উঠেছে।

সৎমা তার মেয়েদের সঙ্গে মিলে কেবল ওয়াসিলিসার অনিষ্ট চেষ্টা করত। ওয়াসিলিসা দেখতে যেমন সুন্দর, তার কথাবার্তা তেমনি মিষ্টি। গ্রামের যত লোক সবাই তাকে ভালোবাসে। আর সেই সৎমাটার যে দুটো মেয়ে--তাদের দাঁত যেমন উঁচু, চোখ তেমনি টেরা, নাক তার চেয়েও বাঁকা, আর তার ওপরে তারা এমনি দুষ্টু আর হিংসুকে আর ঝগড়াটে, তাদের কে ভালোবাসবে? তাই তারা হিংসায় ওয়াসিলিসাকে ধরে মারত। গ্রামের এক কিনারায় ওয়াসিলিসাদের বাড়ি আর বাড়ির পাশেই প্রকাণ্ড বন। সেই বনের মধ্যে সবুজ মাঠের ওপরে ডাইনিবুড়ি বাবায়াগার বাড়ি। সে বুড়ি মানুষ খায় সুন্দর মেয়েদের ধরতে পেলে তো খুব উৎসাহ করেই খায়!

একদিন রাত্রে দুষ্টু সৎমা তার মেয়েদের বলল, "এক কাজ কর। ঘরের আগুনটা নিবিয়ে দে তো। তা হলেই ওয়াসিলিসাকে আনতে আগুন আনবার জন্যে সেই সবুজ মাঠে বাবায়াগার বাড়িতে পাঠানো হবে, আর বাবায়াগা তাকে ধরে গিলে ফেলবে। কেমন মজা!" যেই ও কথা বলা অমনি বড় মেয়েটা উঠে ইচ্ছে করে ছাইমাটি চাপা দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিল। তার পরেই চেঁচাতে লাগল, "ঐ যা! আগুন তো নিবে গেল! ওয়াসিলিসা ওয়াসিলিসা শিগ্গির ওঠো। বনের মধ্যে সবুজ মাঠ আছে, তার মধ্যে বাবায়াগার বাড়ি, তার বাড়ির আগুন নাকি কখনো নিবে যায় না। শিগ্গির যাও, দৌড়ে যাও, সেই আগুন খানিকটা নিয়ে এস।"

এই না বলে তারা ওয়াসিলিসার চুল ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে তাকে বাড়ির বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে, ঘরে খিল এঁটে দিল। ওয়াসিলিসা বাইরে বসে কাঁদছে, এমন সময় তার সেই ছোট কাঠের পুতুলের কথা মনে হল। তখন সে তাড়াতাড়ি তার কাপড়ের মধ্যে থেকে পুতুলটাকে বের করে তার মুখে একটু খাবার দিয়ে বলতে লাগল, "কাঠের পুতুল, খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" অমনি কাঠের পুতুলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল-- তারপর সে বলতে লাগল, "কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়? তুমি ভয় পেও না, বাবায়াগার বাড়ি সোজা চলে যাও।"

ওয়াসিলিসা চলতে লাগল। রাত গেল, সকাল গেল, দুপুর গেল, তখন দেখা গেল সবুজ মাঠ, তার ঠিক মধ্যখানে ভাঙাচোরা সাদা বাড়ি, তার গায়ে সারি সারি

মড়ার খুলি, তার দরজা জানলা ফটক কবাট সব আস্ত আস্ত হাড়ের তৈরি। হুড়কো, কবজা, কাঁটা, পেরেক কোথাও কিছু নেই—কিছু দিয়ে বাঁধা নেই; জোড়া নেই, অথচ বাড়িখানা চারটে পাখির ঠ্যাঙের উপর ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওয়াসিলিসা অবাক হয়ে দেখছে, এমন সময় হঠাৎ একটা সাদা লোক ঝক্‌ঝকে সাদা পোশাক পরে, সাদা ঘোড়ায় চড়ে সাঁই সাঁই করে কোথা থেকে ছুটে এলো। এসেই, সোজা বাড়ির ফটকের ওপরে ছুটে পড়ল আর ধাঁ করে বাড়ির সঙ্গে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা চেয়ে দেখল, তখন বিকেল হয়ে এসেছে, রোদ পড়ে আসছে।

তারপর একজন লোক এল, রাঙা সূর্যের মতো লাল তার রঙ—তার পোশাক, তার ঘোড়া, সবই লাল। সেও তেমনি ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে মিশে গেল। ওয়াসিলিসা দেখল, সন্ধে হয়েছে, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

তারপর একজন এল অন্ধকারের মতো কালো কালো পোশাক, কালো ঘোড়া। সে যেই বাড়ির মধ্যে মিশে গেল আর চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, কেবল সেই বাড়ির গায়ে মড়ার খুলিগুলো আপনা থেকে ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলে উঠল—আর দাঁত বের করে চারিদিকে আলো ছড়াতে লাগল।

তারপরে একটা প্রকাণ্ড হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা নিজে এসে হাজির। সে এসেই তো ওয়াসিলিসার গন্ধ পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেল। ওয়াসিলিসা আগুন নিতে এসেছে শুনেই সে বলল, "বটে! আগুনের বুঝি দাম লাগে না? তিন দিন আমার বাড়িতে কাজ কর—যদি ভালো কাজ করতে পারিস আগুন পাবি; আর তা যদি না পারিস তোকে আমি ঝোল রেঁধে খাব। আচ্ছা, এখন আমার খাবারগুলো উনুন থেকে নামিয়ে আমায় দে তো!"

ওয়াসিলিসা খাবার এনে দিল। বুড়ি চেটেপুটে খেয়ে বলল, "কাল সকালে আমি বেরিয়ে যাব। সন্ধ্যার সময় এসে যেন দেখতে পাই—আমার ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়েছে, আমার রান্না ঠিকমত করা হয়েছে, আর ঐ কোণে এক ঝুড়ি সোনার ধান দেখবি তার মধ্যে অনেক কাঁকর, অনেক খুদ, আর তার চাইতেও বেশি কালো ধান মেশানো আছে—সমস্ত ঝেড়ে বেছে রাখিস। খবরদার কিছু ভুল হয় না যেন।"

ওয়াসিলিসা বসে বসে কাঁদতে লাগল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হ'ল। সে পুতুলের মুখে একটু খাবার দিয়ে বলতে লাগল, "কাঠের পুতুল, খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, সে বলতে লাগল—"কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়? তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও গিয়ে।"

ওয়াসিলিসা ঘুমোতে লাগল। সকালবেলায় বাবায়াগা তার হামানদিস্তায় চড়ে বেরিয়ে গেল। আর কি আশ্চর্য! ঘরদোর সব আপনা থেকে ঝাঁট হয়ে গেল। খাবার-গুলো উনুনে চড়ে আপনা থেকে সিদ্ধ হতে লাগল। ওয়াসিলিসা অবাক হয়ে সেই ধানগুলো দেখতে গিয়ে দেখে তার কাঠের পুতুল সমস্ত ধান বেছে সোনার ধান, কালো ধান, কাঁকর আর খুদ সব আলগা করে ফেলেছে।

বিকেলবেলা সাদা লোকটা ফিরে এল, সন্ধের সময় লাল লোকটা ফিরে এল আর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রে কালো লোকটা ফিরে এল—তারপর ঝমঝম খট্‌খটাং করে হামানদিস্তা হাঁকিয়ে বাবায়াগা ঘরে এল। এসেই সে হামানদিস্তার বাঁটটা দিয়ে ঘরের সব জায়গায় ধাঁই ধাঁই ক'রে মেরে দেখতে লাগল, কোনখান থেকে ধুলো পড়ে

কিনা! তারপর যখন সে দেখল ঝাঁট দেওয়াও ঠিক হয়েছে, খাবারও রান্না হয়েছে, ধানও বাছা হয়েছে, তখন সে রেগে চিৎকার করে বলতে লাগল, "হতভাগি মেয়ে, কে তোকে বাঁচিয়েছে—শিগ্গির আমায় বল্।" ওয়াসিলিসা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমার মা মারা যাবার সময় আমায় যা আশীর্বাদ করেছিলেন, তাতেই আমি বেঁচেছি।" এই না শুনে ডাইনিবুড়ি ভয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওরে বাবা রে! কার আশীর্বাদ নিয়ে আমার বাড়ি এসেছে রে! আমার সর্বনাশ করবে রে! এই নে তোর আগুন নে—আমার বাড়ি থেকে শিগ্গির বেরো।" এই বলে সে ওয়াসিলিসাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, আর একটি মড়ার খুলি তাকে ছুঁড়ে দিল।

ওয়াসিলিসা একটা লাঠির আগায় খুলিটাকে চড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়িতে নিলে কি হবে? তার যে সেই সৎমা আর তার দুটো দুষ্টু মেয়ে, তাদের তো কেউ কোনদিন আশীর্বাদ করে নি—তারা মহা খুশি হয়ে যেই আগুনটা নিতে গিয়েছে অমনি তাদের গায়ে আগুন ধরে গিয়ে তারা তো মরলই, বাড়িঘর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওয়াসিলিসা আবার বসে কাঁদতে লাগল। তখন তার কাঠের পুতুলের কথা মনে হল। পুতুলের মুখে খাবার দিয়ে বলল, "কাঠের পুতুল, খাবার খাও, আবার তুমি জ্যান্ত হও, আমার সঙ্গে কথা কও।" কাঠের পুতুল জেগে উঠে বলল, "কাঠের পুতুল সঙ্গে রয়, ওয়াসিলিসার কিসের ভয়? তুমি রাজার কাছে যাও তিনি তোমায় সুখী করবেন।"

ওয়াসিলিসা তখন রাজার বাড়ি চলল। এমন সুন্দর মেয়ে, এমন মিষ্টি কথা বলে, কেউ তাকে বারণ করল না, কেউ বাধা দিল না। ওয়াসিলিসা একেবারে রাজসভায় রাজার সামনে গিয়ে উপস্থিত।

রাজা এমন চমৎকার মেয়ে কখনো কোথাও দেখেন নি—তিনি তার কথা শুনবেন কি—তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে পড়লেন, বললেন, "আহা কি সুন্দর মেয়েটি গো! তুমি কার মেয়ে? কি তোমার দুঃখ? তুমি আমায় বিয়ে কর—আমার রাজ্যের রানী হয়ে থাক—আমি তোমার সব দুঃখ দূর করব।"

এমনি করে ওয়াসিলিসা রানী হলেন—আর সেই কাঠের পুতুল সোনার খাটে, মখমলের গদিতে, রেশমের চাদরের ওপর ঝকঝকে পোশাক পরে শুয়ে থাকত।

সন্দেশ—১৩২০

পাজি পিটার

শহরের কোণে মাঠের ধারে এক পুরোনো বাড়িতে পিটার থাকত। তার আর কেউ ছিল না, খালি এক বোন ছিল। পিটারকে সবাই বলত 'পাজি পিটার'—কারণ পিটার কোন কাজকর্ম করে না, কেবল একে ওকে ঠকিয়ে খায়। পিটার একদিন ভাবল ঢের লোক ঠকিয়েছি, এবার রাজাকে ঠকানো যাক। এই ভেবে সে রাজবাড়িতে গেল।

রাজা বললেন, "তুমি কে হে? মতলবখানা কি?"

পিটার বলল, "আজ্ঞে আমি পিটার। ঠকাবার জন্য লোক খুঁজছি।"

রাজা বললেন, "তাই নাকি? লোক খুঁজবার দরকার কি? আমাকেই একবার ঠকিয়ে দাও-না।" পিটার মাথা চুলকাতে লাগল, বলল, "তাই তো আমার সরঞ্জাম সব বাড়িতে ফেলে এসেছি।" রাজা বললেন, "বেশ তো তোমার সরঞ্জাম সব নিয়ে এসো।" পিটার তাই শুনে ভয়ানক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল, আর বলল "দোহাই মহারাজ, অত হাঁটাহাঁটি করলে আমি মরেই যাব।" রাজা বললেন, "তবে এই ঘোড়াটায় চড়ে যা- দেরি করিস নে।" পিটার চিৎকার করতে লাগল, "ও ঘোড়ায় আমি চড়ব না, ঘোড়া আমায় ফেলে দেবে।" কিন্তু সে কথা কেউ শুনল না, তাকে জোর করে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হল। পিটার ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে মোড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে যেই একটু আড়াল পেয়েছে, অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে শহরের বাইরে উপস্থিত। সেখানে সাজ-সরঞ্জামসুদ্ধ ঘোড়াটাকে বিক্রি

করে, সে পকেটভরা টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরল। এদিকে রাজা-উজির পাত্র-মিত্র সভায় বসে—পিটার আসে না, আসে না—এলই না—রাজামশাই বাইরে খুব হাসলেন—বললেন, "ছেলেটা বেজায় চালাক"—কিন্তু মনে মনে ভারি চটলেন। একদিন পিটার দেখতে পেল মাঠের উপর দিয়ে জমকালো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে কে যেন আসছে। পিটার বলল, "এই মাটি করেছে! রাজা আসছে।" পিটার দৌড়ে তার বোনকে বলল—"ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দাও—ফুট্‌তে থাকুক।" এই বলে সে একখানা ভাঙা শিলের উপর হিজিবিজি কি-সব লিখতে বসল। তারপর যেই রাজামশাই তার বাড়ির সামনে এসেছেন, অমনি সে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটাকে সেই শিলের ওপর বসিয়ে বিড়্ বিড়্ করে কি-সব বলতে বলতে ভাতটাকে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগল। রাজামশাই বললেন, "এ আবার কি?" পিটার বলল, "আজ্ঞে ভাত রাঁধছি।" রাজা বললেন, "সে কি রে? তোর আগুন কই?" পিটার জোড়-হাতে বলল, "মহারাজ, আমরা গরিব মানুষ, আগুন-টাগুন কোথায় পাব? সন্ন্যাসী ঠাকুর এই পাথরখানা দিয়েছেন, আর দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের রান্না চলে যায়।"

রাজা বললেন, "দে, ওটা আমায় দে—তোকে আমি মাপ করে দিচ্ছি।" পিটার কাঁদতে লাগল, দেখাদেখি তার দুষ্টু বোনটাও কাঁদতে লাগল। রাজা বললেন, "অত কান্নাকাটির দরকার কি? আমি তো কেড়ে নিচ্ছি না, দাম দিয়ে নিচ্ছি। এই নে!" বলে তিনি একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন। তখন পিটার তাঁকে একটা যা-তা মন্ত্র শিখিয়ে দিল।

রাজামশাই সেই শিলখানা নিয়ে বাড়ি গেলেন। গিয়ে সকলকে বলে পাঠালেন, "কাল সকালে তোমাদের এক আশ্চর্য ভোজ খাওয়াব।" সকাল না হতেই মন্ত্রী উজির কোটাল সকলে আশ্চর্য ভোজ খাবার জন্য রাজবাড়িতে হাজির। রাজামশাই সেই পাথরটিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে তার উপর প্রকাণ্ড হাঁড়ি চাপালেন, আর পোলাওয়ের চাল, ঘি, মাংস, মসলা সব তার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরভাবে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, পোলাও আর হল না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। রাজামশাই রেগে ঘেমে লাল হয়ে উঠলেন। শেষটায় তিনি লাফিয়ে উঠে কাউকে কিছু না বলে এক তলোয়ার হাতে আবার ঘোড়ায় চড়ে পিটারের বাড়ি ছুটলেন। মনে মনে বললেন, 'এবার আর পাজি পিটারকে আস্ত রাখছি নে।'

দূর থেকে রাজাকে দেখেই পিটার এক দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। তার বোনকে সে আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল—সে করল কি একটা খরগোস কেটে তার রক্ত দিয়ে একটা থলি ভরে সেই থলিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

রাজা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "পিটার কই? তাকে শিগ্‌গির ডাক।" পিটারের বোন বলল, "দোহাই মহারাজ, পিটার এখন ঘুমুচ্ছে—সে ভয়ানক রাগী লোক, এখন জাগাতে গেলে আমায় মারবে।" রাজা বললেন, "কিছু ভয় নেই—আমি আছি।"

পিটারের বোন পিটারকে ডাকতে গেল। খানিক বাদেই একটা চিৎকার গর্জনের মতো শোনা গেল, রাজা দৌড়ে গিয়েই দেখেন পিটার একটা ছুরি নিয়ে তার

বোনকে মারল আর সে বেচারা ঠিক যেন মড়ার মতো পড়ে গেল—রক্তে তার কাপড় লাল হয়ে গেল। রাজা বললেন, "তবে রে পাজি পিটার, তোর বোনটাকে শুধু-শুধু মেরে ফেললি?"

পিটার বলল, "মহারাজ, এক মিনিট সবুর করুন।" এই বলে সে একটা ভাঙা শিঙের বাঁশি নিয়ে তার বোনের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটা চোখ মেলে বড়-বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। রাজা তো অবাক! তিনি বললেন, "এই শিঙেটা আমায় দিতে হবে।" পিটার কাঁদতে লাগল—বলল, "দোহাই মহারাজ, ওটা না হলে আমাদের চলবে কেমন করে?" দেখাদেখি বোনটাও কাঁদতে লাগল, "এবার আমি মারা গেলে কি করে বাঁচাবে? দোহাই মহারাজ, পিটারের মেজাজ ভয়ানক।" রাজা বললেন, "আমার মেজাজ তার চাইতেও ভয়ানক—তোদের যে মেরে ফেলি নি এই ঢের—এই নে—" বলে এক মুঠো মোহর ফেলে দিলেন।

রাজা বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলেন, 'এবার থেকে যার উপর রাগ করব—একেবারে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দেব।' বাড়ি ফিরে দেখেন—নিমন্ত্রিত লোকেরা তখনো আশ্চর্য ভোজ খাবার আশায় বসে আছেন। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, আহারের অন্য বন্দোবস্ত করতে বলব কি?" রাজা বললেন, "কি, এত বড় কথা! আমি করছি একরকম বন্দোবস্ত, তুমি করবে অন্য রকম?" বলেই মন্ত্রীর মাথায় এক কোপ বসিয়ে দিলেন। উজির নাজির কোটাল সব হাঁ-হাঁ করে উঠতেই রাজা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তাদেরও মাথা কেটে দিলেন। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল। রাজা বললেন, "ভয় নেই, তোমরা এখন মজা দেখ।" বলে তিনি সেই শিঙেটা মন্ত্রীর মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। কিন্তু ফুঁ দিলে হবে কি—মরা মানুষ কি আর বাঁচে?

তখন রাজার হুকুমে পেয়াদা পুলিশ দৌড়ে গিয়ে পিটারকে ধরে আনল। একটা মজবুত বাক্সের মধ্যে তাকে বন্ধ করে সেই বাক্স মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা বললেন, "পাজি পিটার—তোমার শাস্তি শোন—এই বাক্সে ভরে তিন দিন তিন রাত্রি তোমাকে ঐ পাহাড়ের উপর রাখা হবে। সেখানে রোদে পুড়ে হিমে ভিজে তুমি তোমার দুষ্টুমির কথা ভাববে—তারপর তোমাকে এই পাহাড় থেকে একেবারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে।"

পিটার বললে, "আহা মহারাজের দয়ার শরীর।" পাহাড়ের আগায় বাক্সের মধ্যে শুয়ে পিটার মনে মনে ভাবছে, 'এখন উপায়?' আর মুখে চিৎকার করে গান করছে—

'ধিন্ তাধিনা তাধেই ধেই—
স্বর্গে যাবার রাস্তা এই'—

এমনি করে দুদিন গেল। তিন দিনের দিন এক বুড়ো বিদেশী সওদাগর সেখানে এল। সে বেচারা তীর্থ করতে বেরিয়েছে, পিটারের গান শুনে ব্যাপারটা কি দেখতে এল। সওদাগর বলল, "তুমি কে ভাই? স্বর্গের রাস্তার কথা বলছিলে?" পিটার বলল, "আরে চুপ—কাউকে বোলো না, তা হলে স্বর্গে যাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—মাঝে থেকে আমার স্বর্গে যাওয়া মাটি হবে।" সওদাগর বলল, "ভাই, তুমি একা যাবে কেন? আমায়ও একটু পথ বাতলে দাও না।" পিটার বলল, "সকলের কি তা সম্ভব হয়? এই বাক্সকে মন্ত্র পড়ে এখানে রাখা হয়েছে—যেমন-

তেমন বাক্স হলে হবে না; আজ রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত এসে আমায় নিয়ে যাবে। আবার যে-সে দিন হবে না—এমনি তিথি, এমনি বার, এমনি মাস, এমনি নক্ষত্র সব মেলা চাই—এরকম সুযোগ হাজার বছরে একদিন হয়।" সওদাগর বলল, "ভাই আমি বুড়ো হয়েছি, কবে মরে যাই তার তো ঠিক নেই—আমার টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সব তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি আমায় ও বাক্সটা দাও—আমি স্বর্গে যাই।" পিটার বলল, "খবরদার, আমি ছেলেমানুষ বলে আমায় টাকার লোভ দেখিও না।" বুড়ো কাঁদতে লাগল; অনেক মিনতি করে বলতে লাগল, "এই বুড়ো বয়সে তীর্থ ঘুরে কতটুকু আর পুণ্য হবে—এখন না হলে আর আমার স্বর্গে যাবার আশা নেই।" তখন পিটার রাজি হল।

বাক্স খুলে বুড়ো তার মধ্যে ঢুকল, পিটার তার কাছ থেকে বিষয় সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বাক্সটা আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। যাবার সময় বলে গেল, "রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত আসবে, তখন কিন্তু টুঁ শব্দটি করবে না। তা হলেই আর স্বর্গে যাওয়া হবে না।"

রাত্রে রাজামশাই শান্ত্রী নিয়ে বাক্সটা নেড়েচেড়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। রাজা ভাবলেন, 'আপদ গেল।' দুদিন বাদে রাজা বেড়াতে বেরিয়েছেন—এমন সময় পাজি পিটার জমকালো পোশাক পরে ধব্‌ধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসে সেলাম করে বলল, "মহারাজ আমায় সমুদ্রে ফেলে বড়ই উপকার করেছেন। আহা! সমুদ্রের তলায় যে দেশ আছে—সে বড় চমৎকার জায়গা। আর লোকেরা যে কি ভালো, তা আর কি বলব—আমায় কি ছাড়তে চায়? আসবার সময় থলে ভরা কেবল হীরে মণি মুক্তো সঙ্গে দিল।" এই বলেই সে চম্পট দিল।

রাজামশাই হাঁ করে রইলেন। রাজামশাই জানতে চান সমুদ্রের তলাটার কথা! পাজি পিটার যা বলেছে তা সত্যি কিনা—তা হলে তিনি একবার দেখে আসেন।

সন্দেশ—১৩২১

শ্বেতপুরী আর লালপুরী

শ্বেতপুরীর রাজা আর লালপুরীর রাজা, দুজনের যেমন পাশাপাশি বাড়ি, তেমনি গলাগলি ভাব। শ্বেতপুরী বলে, "আমার ছেলে যখন বড় হবে, তখন তোমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেব।" লালপুরী বলে, "আমার মেয়ের যখন বয়স হবে, তখন তোমার ছেলেকে আমার জামাই করব।" আর দুজনেই বলে, "আহা, রানীরা যদি বেঁচে থাকতেন!"

এমনি করে দিন কেটে যায়। হঠাৎ একদিন কোত্থেকে এক শিকারি এসে রাজপুরীতে অতিথি হল। সে বলে এমন দেশ নেই যা সে দেখে নি। সেই সোনার দেশের কাজলি নদী, তার ওপারে রক্তমুখো অসভ্যেরা থাকে, সেখানে সে হরিণ

মারতে গিয়েছে; নীল সাগরের মধ্যিখানে ছায়ায় ঢাকা রত্নদ্বীপ, সেখানে সে মুক্তো আনতে গেছে; ঐ যে পুরীর সামনে পৃথিবীজোড়া গভীর বন, সেই বনের ওপারে গিয়ে সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এসেছে। সকলে বলল, "অদ্ভুত দৃশ্যটা কিরকম?" শিকারি বলল, "দেখতে পেলাম ঝরনাতলায় বনের বুড়ি, মাথায় তার সোনার চুল। সেই চুল দিয়ে বুড়ি রুপোর তাঁতে কাপড় বুনছে! চকচকে, ঝকঝকে, ফিনফিনে, ফুরফুরে চমৎকার কাপড়—তেমন কাপড় এ রাজ্যে নেই, ও রাজ্যে নেই, কোত্থাও নেই।"

সে রাত্রে রাজাদের চোখে আর ঘুম এলো না। তারা শুয়ে শুয়ে কেবলই ভাবছে, 'আহা! সে কাপড় যদি কিছু আনতে পারতাম।' শেষটায় শ্বেতপুরীর আর সহ্য হল না—উঠে লালপুরীর ঘরে গিয়ে বলল, "লালপুরী ভাই, জেগে আছ?" লালপুরী বলল, "হ্যাঁ ভাই, সেই কাপড়ের কথা ভেবে ভেবে আমার আর ঘুম আসছে না।" শ্বেতপুরী বলল, "আমারও সেই দশা। চল না, দুজনে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি।" লালপুরী বলল, "বেশ কথা। দেখা যাক, সেই বুড়ির সন্ধান পাওয়া যায় কি না।" শ্বেতপুরী চুপচাপ গিয়ে রাজভাণ্ডারীর কানে কানে বলল, "তদবির সিং, আমি কয়দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, তুমি সাবধানে সব সামলে থেকো, আর রাজকুমারকে চোখে চোখে রেখো।" লালপুরী তার বাপের আমলের বুড়ো চাকরকে জাগিয়ে বলল, "নিমকরাম, আমি কয়দিন একটু ঘুরে আসছি, তুমি আমার মেয়েকে দেখো।"

তারপর দুজনে বুড়ির খোঁজে বনের মধ্যে গেল। সেই যে গেল, আর তাদের খবর নেই। দুদিন যায়, দশদিন যায়, এমনি করে সাত মাস গেল। তখন দুষ্টু তদবির সিং নিমকরামকে লোভ দেখিয়ে বলল, "দাদা, বুড়ো হয়ে পড়লে, আর কয়দিনই-বা বাঁচবে। এখন এই বয়সে একটু জিরিয়ে নাও। তোমায় নদীর ধারে বাগান দিচ্ছি, ঘর দিচ্ছি, চাকর-দাসী সব দিচ্ছি—শেষ কটা দিন আরামে থাক। মেয়েটাকে দেখাশোনা, সে আমার গিন্নি করবে।" এই বলে নিমকরামকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঠিয়ে দিল, পুরী থেকে অনেক দূরে।

দিন যতই যায়, রাজকন্যা আর রাজপুত্রের ততই কষ্ট বাড়ে। ক্রমে এমন হল যে তারা ভালো করে খেতেই পায় না, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে, নোংরা ঘরে মাদুর পেতে শোয়। ভাণ্ডারীটার ছেলেমেয়ে, ভাইপো-ভাগনে, ভাইঝি-ভাগনি, মাসি-পিসি আর মেসো-পিসে, তারা সব দলেবলে পুরীতে এসে থাকে। ভালো ঘর সব তারাই নেয়, ভালো কাপড় সব তারাই পরে, ভালো খাবার সব তারাই খায়। শেষটায় একদিন নিমকরামের গিন্নি এসে রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে পুরীর বাইরে তাড়িয়ে দিলো। বলল, "যা, যা, বসে বসে আর খেতে হবে না; মাঠে গিয়ে শুয়োর চরা। যদি ভালো করে চরাস, আর একটাও শুয়োর না হারায়, তা হলে বিকেলে চারটি ভাত পাবি। রাত্রে ঐ হোগলার ঘরে শুয়ে থাকিস।"

দুজনে বনের ধারে, মাঠের মধ্যে শুয়োর চরাতে গেল। একটা শুয়োর ভারি দুষ্টু, কেবলই পালাতে চায়। রাজপুত্র তাকে ধরে এনে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বললেন, "খবরদার! এইখানে চোখ বুজে শুয়ে থাক; নড়েছিস কি মরেছিস!" তারপর দুজনে মিলে গল্প করতে লাগলো। দুঃখের কথা বলে বলেও ফুরোয় না; এদিকে বেলা যে শেষ হয়ে আসছে, তাদের সে খেয়ালই নেই। হঠাৎ রাজপুত্র চেয়ে দেখে, দুষ্টু শুয়োরটা আবার কোথায় পালিয়েছে। কোথায় গেল? কোথায় গেল? চারদিক

চেয়ে দেখে শুয়োর কোথাও নাই; পালের মধ্যে নাই, মাঠের মধ্যে নাই, পুরীতে যাবার পথেও নাই! তা হলে নিশ্চয় বনের দিকে গেছে, এই ভেবে তারা দুজনে গেল বনের মধ্যে খুঁজে দেখতে।

খুঁজতে খুঁজতে, ঘুরতে ঘুরতে, বেলাশেষে যখন তারা শ্রান্ত হয়ে পড়লো, তখন চেয়ে দেখে—কোথায় মাঠ, কোথায় পুরী, তারা গভীর বনে এসে পড়েছে। দেখে তাদের বড় ভয় হল, বনের মধ্যে কোথায় যাবে? এমন সময়ে আঁধার বন ঝলমলিয়ে বনের দেবী চন্দ্রাবতী তাদের সামনে এসে বললেন, "ভয় পেয়েছ? এসো, এসো, আমার ঘরে এসো।" তারা তাঁর সঙ্গে গেল।

বনের মধ্যে প্রকাণ্ড যে বুড়ো বট, তার জটায় ঢাকা বিশাল দেহে চন্দ্রাবতী আঙুল দিয়ে ছুঁতেই গাছের গায় দরজা খুলে গেল। সেই দরজা দিয়ে রাজপুত্র আর রাজকন্যা ভেতরে ঢুকে দেখলো, কি চমৎকার পুরী! সেইখানে হরিণের দুধ আর বনের ফল খেয়ে, তারা সবুজ চাদরঢাকা কাঁচ ঘাসের নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লো। ভোরের বেলা গাছের ফোকরের জানালা দিয়ে এক টুকরো দিনের আলো যেমনি এসে পুরীর মধ্যে পড়েছে, অমনি পাখিরা সব গেয়ে উঠলো; রাজার ছেলে আর রাজার মেয়ে অবাক হয়ে উঠে বসলো। চন্দ্রাবতী বললেন, "এখন ভেবে বল দেখি, আমার কাছে থাকবে, না রাজপুরীতে ফিরে যাবে?"

তারা দুজনেই মাথা নেড়ে বলল, "না, না, দুষ্টু পুরীতে আর কক্ষনো যাব না। তার চাইতে বনের পুরী অনেক ভালো।"

সেই থেকে রাজপুত্র আর রাজকন্যা বনপুরীতেই সুখে থাকে। বনের যত পশুপাখি, চন্দ্রাবতীকে সবাই চেনে। তারা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে, গল্প করে আর কত মজার মজার কথা বলে; দুজনে অবাক হয়ে সেই-সব শোনে। একদিন এক বুড়ো কাক, জানালা দিয়ে উড়ে এসে সিন্দুকের ওপর আরাম করে বসে বলল, "কাঃ কাঃ, ক্যায়া বাৎ!" চন্দ্রা বললেন, "এই যে, ভুষুণ্ডিদাদা যে! খবর-টবর কিছু আছে?" কাক বলল, "হ্যাঁ, খবর বেশ ভালোই। কাঠুরেরা সে বছর যত জঙ্গল কেটেছিল, সব আবার ভরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।" চন্দ্রা বললেন, "সে কিরকম?" কাক বলল, "শহরের মানুষ এসে সারাদিন খালি মাটি খুঁড়ছে আর বীজ লাগাচ্ছে, আবার নতুন বীজ খুঁজে আনছে।" চন্দ্রা বললেন, "তারা এরকম করছে কেন?" কাক বলল, "ওমা, তাও জান না? তোমার এই নন্দবন পার হলেই খণ্ডবন, তার পরে অন্ধবন। মানুষপুরের লোকেরা এসে সেই অন্ধবনের বড়-বড় গাছ কেটে নিয়েছে। তাই অন্ধরাজ দুটো জাঁদরেল মানুষ পাকড়াও করে তাদের দিয়ে বন সারাচ্ছেন।" চন্দ্রা বললেন, "আহা, তা হলে তো মানুষ বেচারিদের বড়ই কষ্ট।" কাক বলল, "তা, কষ্ট তো আছেই। ঘরবাড়ি, ছেলেপুলে, সব ছেড়ে বনের মধ্যে খাটছে, খাটছে, কেবলই খাটছে। যতদিন না কাটা জঙ্গলের সমস্ত জমিতে বীজ পোঁতা হয়, যতদিন না সেই বীজ থেকে চারা বেরোয়, যতদিন না সেই চারা বাড়তে বাড়তে গাছ হয়ে ওঠে, ততদিন তাদের ছুটি নেই।" বলে কাক উড়ে গেল।

কাকের কথা শুনে রাজপুত্র আর রাজকন্যা কাঁদতে লাগলো। তারা বলল, "আমরা অন্ধবনে যাব, আমাদের পথ বলে দাও।" চন্দ্রা বললেন, "নদীর ধার দিয়ে দিয়ে উত্তরমুখী চলে যাও, তা হলেই অন্ধবন খুঁজে পাবে। তার কাছেই ভুষুণ্ডি কাক থাকে, সে তোমাদের পথ দেখাবে। সত্যি কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না। নদীর জল

ছাড়া আর কোন জল খাবে না। কোন গাছের ফুল ছিঁড়বে না, ফল পাড়বে না—তা হলেই তোমাদের কোন বিপদের ভয় নেই।"

ভোরবেলা দুজনে একটি বনরেশমের কম্বল আর পুঁটলি ভরে খাবার সঙ্গে নিয়ে রওনা হল। দুপুরবেলা তারা শ্রান্ত হয়ে নদীর ধারে জল খেতে গেছে। তখন কোথা থেকে এক শিকারি এসে হাজির। সে বলল, "আরে ছি, ছি, ঐ নোংরা জল কি খেতে আছে? এই নাও, বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা জল।" তারা বলল, "না, নদীর জল ছাড়া আর কোন জল আমরা খাব না।" শিকারি রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

রাত্রি হলে শুখনো ঘাসের ওপর কম্বল পেতে দুজনে ঘুমিয়ে রইলো; পরের দিন ভোর না হতে আবার উঠে রওনা হল। সেদিনও যেই তারা নদীর ধারে খেতে বসেছে, অমনি এক শিকারি এসে তাদের বলছে, "আরে, ও-সব বাসি পিঠে খাচ্ছ কেন? চমৎকার ফল রয়েছে, যত ইচ্ছা পেড়ে পেড়ে খাও।" তারা বলল, "না, আমরা বনের ফুল ছিঁড়ব না, বনের ফল পাড়ব না।" শিকারি রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

পরের দিন আবার যেই তারা নদীর ধারে বসেছে, অমনি এক শিকারি এসে তাদের আদর করে, মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" তারা বলল, "আমরা অন্ধবনে যাচ্ছি।" শিকারি বলল, "আরে চুপ চুপ, অন্ধরাজা শুনতে পেলেই সর্বনাশ! ওরকম বলতে নেই—কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, 'কোথাও যাচ্ছি না, এই নদীর ধারে বেড়াচ্ছি'।" তারা বলল, "না, আমরা সত্যি কথা ছাড়া আর কোন কথা বলব না।"

তার পরের দিন তারা অন্ধবন দেখতে পেল। বনের মধ্যে অনেকখানি জায়গা ময়দানের মতো খোলা—কাঠুরেরা সেখানে জঙ্গল কেটে সাফ করেছে। সেই খোলা ময়দানে শ্বেতপুরী আর লালপুরীর রাজা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। তাদের দেখতে পেয়েই রাজপুত্র আর রাজকন্যা 'বাবা, বাবা', বলে দৌড়ে গেল। কিন্তু রাজারা তাদের দিকে ফিরেও চাইলো না। ছেলে আর মেয়ে কত বলল, কত বোঝালো, তারা সে-সব কথা কানেও নিলো না। তারা কেবল মাটি খুঁড়ছে আর নিজেরা বলাবলি করছে যে, এই জমিটা শেষ হলেই আবার বীজ আনতে যেতে হবে।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর বিষণ্ণ-মুখে নদীর ধারে এসে বসলো। এমন সময়ে বুড়ো ভুষুণ্ডিকাক এসে তাদের সামনে ঘাসের ওপর বসে বলল, "কঃ কঃ,—ভাবনা কিসের, কও না শুনি।" তারা সব কথা খুলে বলল। কাক বলল, "এরই জন্য এত ভাবনা? তা হলে বলি শোন। যখন ঐ পাহাড়ের ওপর রাঙা সূর্য ডুবে যাবে, তখন মানুষেরা তাদের কাজকর্ম রেখে বিশ্রাম করবে। তখন যদি চটপট গিয়ে শাবলদুটোকে নদীর মধ্যে ফেলতে পার, তা হলেই তারা কাজের কথা সব ভুলে যাবে। তারপর তাদের সামনে গিয়ে বলবে—'ঝরনাতলায় আপনমনে, কোথায় বুড়ি কাপড় বোনে? রুপোর তাঁতে সোনার চুল, সব কি ফাঁকি, সব কি ভুল?' বললেই সব কথা তাদের মনে পড়ে যাবে। যা দেখছো এ-সমস্তই অন্ধরাজের ফাঁকি—সেই শিকারি সেজে তোমাদের পুরীতে গিয়েছিল, আর বনের পথে তোমাদেরও ভোলাতে চেয়েছিল। যাও, সন্ধ্যা হয়ে এলো, এখনই দৌড়ে যাও।"

তারা দুজনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখলো সূর্য অস্ত যায় যায়। একটু পরেই রাজারা যেমন শাবল রেখে দিয়ে বিশ্রাম করতে বসেছে, অমনি তারা শাবল-

দুটো নিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর ফিরে এসে যেই তারা সেই ভুষুণ্ডির শেখানো কথাগুলো বলেছে, অমনি লালপুরী আর শ্বেতপুরী লাফিয়ে উঠে বলল, "আরে এ কি! তোমরা কোত্থেকে এলে? বনের মধ্যে আসলে কি করে? এত রোগা হয়ে গেছ কেন? তোমাদের সঙ্গে লোকজন কোথায়? আমাদের খবর পেলে কার কাছে?" তারা একে একে সব কথা বলল। তারপর তারা চারজনে মনের আনন্দে হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে পুরীতে ফিরে চলল।

তারপর কি হল? তারপর সবাই পুরীতে ফিরে এলো, আমোদ-আহ্লাদ, ভোজ, উৎসব লেগে গেল। তারপর? তারপর একদিন লালপুরীর রাজকন্যার সঙ্গে শ্বেতপুরীর রাজপুত্রের ধুমধাম করে বিয়ে হল—বনের দেবী চন্দ্রাবতী নিজে এলেন বিয়ে দেখতে। আর হতভাগা তদবির সিং-এর কি হল? তাকে অন্ধবনে পাঠিয়ে দেওয়া হল—আজও সেখানে সে তার গিন্নির সঙ্গে কেবল মাটি খুঁড়ছে আর বীজ পুঁতছে, আর বনে-জঙ্গলে বীজ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সন্দেশ—১৩২৮

দেবতার দুর্বুদ্ধি

স্বর্গের দেবতারা যেখানে থাকেন, সেখান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবার একটিমাত্র পথ; সেই পথ রামধনুকের তৈরী। জলের রঙে আগুন আর বাতাসের রঙ মিশিয়ে দেবতারা সেই পথ বানিয়েছেন। আশ্চর্য সুন্দর সেই পথ। স্বর্গের দরজা থেকে নামতে নামতে পৃথিবী ফুঁড়ে কোন অন্ধকার ঝরনার নীচে মিলিয়ে গেছে। কোথাও তার শেষ নেই।

পথটি পেয়ে দেবতাদের আনন্দও হল, ভয়ও হল। ভয় হল এই ভেবে যে, ঐ পথ বেয়ে দুর্দান্ত দানবগুলো যদি স্বর্গে এসে পড়ে? দেবতারা সব ভাবনায় বসেছেন, এমন সময় চারদিক ঝলমলিয়ে, আলোর মতো পোশাক পরে, হিমদল এসে হাজির হলেন। হিমদল কে? হিমদল হলেন আদি দেবতা অদিনের ছেলে। তাঁর মায়েরা নয়টি বোন, সাগরের মেয়ে। তাঁদের কাছে পৃথিবীর বল, সমুদ্রের মধু আর সূর্যের তেজ খেয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন। তাঁকে দেখেই দেবতারা সব ব'লে উঠলেন, "এসো হিমদল, এসো মহাবীর, আমাদের রামধনুকের প্রহরী হয়ে স্বর্গদ্বারের রক্ষক হও।"

সেই অবধিই হিমদলের আর অন্য কাজ নেই, তিনি যুগ-যুগান্তর রাত্রিদিন স্বর্গদ্বারে প্রহর জাগেন। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, একটিবার পলক ফেললেই বহুদিনের সমস্ত শ্রান্তি জুড়িয়ে যায়। রামধনুকের ছায়ার নীচে সারারাত শিশির ঝরে, তার একটি কণাও হিমদলের চোখ এড়ায় না। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ কচি ঘাস গজায় হিমদল কান পেতে তার আওয়াজ শোনেন। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে ঢুকবে এমন কারো

সাধ্যি নেই। হাতে তাঁর এক শিঙের বাঁশি, সেই বাঁশিতে ফুঁ দিলে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে হুঙ্কার বাজবে 'সাবধান!' 'সাবধান!'—সেই শব্দে ত্রিভুবনের সকল প্রাণী কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠবে। এমনি করে প্রস্তুত হয়ে হিমদল সেখানে পাহারা দিতে লাগলেন।

কিন্তু দেবতাদের মনের ভয় তবুও কিছু কমল না। তাঁরা বললেন, "বিপদ বুঝে সাবধান হয়েও যদি বাইরের শত্রুকে ঠেকাতে না পারি, তখন আমাদের উপায় হবে কি? যদি বাঁচতে হয় তো অক্ষয়দুর্গ গড়তে হবে। আকাশজোড়া স্বর্গটিকে দুর্গ দিয়ে ঘিরতে হবে।" কিন্তু তেমন দুর্গ বানাবে কে? নানাজনে নানারকম মন্ত্রণা দিচ্ছেন, কিন্তু কোন কিছুই মীমাংসা হচ্ছে না। এমন সময় কোথাকার এক অজানা কারিগর এসে খবর দিল হুকুম পেলে আর বকশিশ পেলে সে অক্ষয়দুর্গ বানাতে পারে। হিমের অসুর মামতুরষ যে ছদ্মবেশে কারিগর হয়ে এসেছেন, দেবতারা তা বুঝতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, "কিরকম তুমি বকশিশ চাও?" কারিগর বলল, "চন্দ্র চাই, সূর্য চাই, আর স্বর্গের মেয়ে ফ্রেয়াকে চাই।"

আবদার শুনে দেবতারা সব রেগে উঠলেন। সবাই বললেন, "বেয়াদবকে দূর করে দাও।" কিন্তু দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর নাম লোকি; তিনি সকল-রকম দুর্বুদ্ধির দেবতা। লোকি বললেন, "আচ্ছা কাজটা আগে করিয়ে নিই না—তারপর দেখা যাবে।" দুষ্টু দেবতার কূট-মন্ত্রণা শুনে দেবতারা সব মামতুরষকে বললেন, "তুমি চন্দ্র পাবে, সূর্য পাবে, দেবকন্যা ফ্রেয়াকে পাবে, যদি একলা তোমার ঘোড়ার সাহায্যে শীতকালের মধ্যে এ কাজটাকে শেষ করতে পার।" ছদ্মবেশী অসুর বলল, "অতি উত্তম। এই কথাই ঠিক রইল।"

সেদিন থেকে মামতুরষের বিশ্রাম নেই। সারাদিন সে পাথর বয়ে ঘোড়াকে দিয়ে স্বর্গে তোলায়, সারারাত দুর্গ বানায়। দেবতারা ঠিক যেমন-যেমন বলে দিয়েছেন, তেমনি করে পাথরের পর পাথর জুড়ে আকাশ ফুঁড়ে অক্ষয়দুর্গ গড়ে উঠছে। শীত যখন ফুরোয় ফুরোয়, তখন দেবতারা দেখলেন, সর্বনাশ! দুর্গের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, একটি মাত্র ফটক বাকি—সে তো শুধু একদিনের কাজ! এখন উপায়? এত দিনের চন্দ্র সূর্য স্বর্গ থেকে খসে পড়বে? সুন্দরী ফ্রেয়া শেষটায় কিনা অজানা এক কারিগরকে বিয়ে করবে? ভয়ে ভাবনায় খেপে গিয়ে সবাই বললে, "হতভাগা লোকির কথায় আমাদের এই বিপদ হল, ও এখন এর উপায় করুক, তা না হলে ওকেই আমরা মেরে ফেলব।"

লোকি আর করবে কি? সন্ধ্যা হতেই সে স্বর্গ হতে বেরিয়ে দেখল, অনেক দূরে মেঘের নীচে কারিগরের ঘোড়া পাহাড়ের সমান পাথর টেনে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। লোকি তখন মায়াবলে আকাশ-ঘোটকীর রূপ ধ'রে চিঁহি চিঁহি ক'রে অদ্ভুত সুরে ডাকতে ডাকতে একটা বনের ভিতর থেকে দৌড়ে বেরোল। সেই শব্দে মামতুরষের ঘোড়া চমকে উঠে, লাগাম ছিঁড়ে, সাজ খসিয়ে, ঊর্ধ্বমুখে মন্ত্রে-চালান পাগলের মতো ছুটে চলল। দিক-বিদিকের বিচার নেই, পথ-বিপথের খেয়াল নেই, আকাশের কিনারা দিয়ে, আঁধারের ভেতর দিয়ে, বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড়, কেবল ছুট্ ছুট্ ছুট্। লোকিও ছুটছে, ঘোড়াও ছুটছে, আর 'হায় হায়' চিৎকার ক'রে পিছন পিছন মামতুরষ ছুটে চলেছে। এমনি করে শীতকালের শেষ রাত্রি প্রভাত হল, দুষ্টু দেবতা শূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, অসুর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে

ঘোড়া ধরল। তখন বসন্তের প্রথম কিরণে পূবের মেঘে রঙ ধরেছে, দক্ষিণ বাতাস জেগে উঠছে।

অসুর বুঝল এ-সমস্তই দেবতার ফাঁকি। কোথায়-বা চন্দ্র সূর্য, কোথায়-বা দেবকন্যা ফ্রেয়া! এতদিনের পরিশ্রম সব একেবারেই পণ্ড। ভাবতে ভাবতে অসুরের মাথা গরম হল, ভীষণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে দেবতাদের সে মারতে চলল। দূর থেকে তার মূর্তি দেখেই দেবরাজ থর্ বুঝলেন, অসুর আসছে স্বর্গপুরী ধ্বংস করতে। তিনি তখন ব্যস্ত হয়ে তাঁর বিরাট হাতুড়ি ছুঁড়ে মারলেন। অসুরের বিশাল দেহ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল।

কিন্তু, দেবতাদের মনে আর শান্তি রইল না। এই অন্যায় কাজের জন্য তাঁরা লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। দেবতাদের মুখ মলিন দেখে সাগরের দেবতা ইগিন বললেন, "আমার প্রবালপুরীতে রাজভোজ হবে, তোমরা এসো—ভাবনাচিন্তা দূর কর।" দেবতাদের সবাই এলেন, কেবল লোকিকে কেউ খবর দিল না। সবাই যখন ভোজে বসেছেন, লোকি তখন জানতে পেরে ভোজের সভায় হাজির হয়ে সকলকে গাল দিতে দিতে বিনা দোষে ইগিনের প্রিয় দাস ফন্‌ফেন্‌কে মেরে ফেলল। দেবতারা অনেক দিন অনেক সয়েছেন, আজকে তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। লোকির সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের কথা তাঁদের মনে পড়ল। তাঁরা বললেন, "এই লোকির জন্য স্বর্গের সর্বনাশ হচ্ছে। এই হিংসুকে লোকি থরের স্ত্রীর সোনার চুল চুরি করেছিল; এই কাপুরুষ লোকিই বাজি রেখে নিজের মুণ্ড পণ ক'রে বাজি হেরে পালিয়েছিল; এই বিশ্বাসঘাতক লোকিই স্বর্গের অমৃতফল অসুরের হাতে দিয়েছিল; এই হতভাগা লোকি ফ্রেয়াকে রাক্ষসের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল; এই চোর লোকিই ফ্রেয়ার গলার সোনার মালা সরাতে গিয়ে হিমদলের হাতে সাজা পেয়েছিল; এই পাষণ্ড লোকিই নিষ্পাপ বলোদরের মৃত্যুর কারণ! এই লোকি পৃথিবীতে গিয়ে অত্যাচার করে, পাতালে গিয়ে শত্রুর সঙ্গে মন্ত্রণা করে! মারো এই অপদার্থকে।"

লোকি প্রাণভয়ে পালাতে গেল কিন্তু স্বয়ং দেবরাজ থর্ আর আদি দেবতা অদিন যখন তাঁর পিছনে ছুটলেন, তখন সে আর পালাবে কোথায়? বিষের ঝরনার নীচে হাত-পা বেঁধে লোকিকে ফেলে রাখা হল। লোকির স্ত্রী সিগিন যতক্ষণ ঝরনাতলায় পাত্রে ক'রে বিষ ধরেন আর ফেলে দেন, ততক্ষণ লোকি একটু আরাম পায়; আর সিগিন যদি মুহূর্তের জন্য খেতে যান কি ঘুমিয়ে পড়েন, তবে বিষের যন্ত্রণায় লোকির আর সোয়াস্তি থাকে না। দেবতারা ভাবলেন, স্বর্গের পাপ দূর হল, স্বর্গে এবার শান্তি এল। কিন্তু হায়! তার অনেক আগেই পাপের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। লোকির জন্য স্বর্গের পাপ মর্ত্যে নেমেছে, পাতালে ঢুকে অসুর পিশাচ দৈত্য দানব সবগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে। যে বনের লোহার গাছে লোহার পাতা, সেই বনের ছায়ায় বসে লোকির রাক্ষসী স্ত্রী অঙ্গুর্বদা নেকড়ে-মুখো পিশাচ-রাহুদের যত্ন করে পাপীর হাড় আর পাপীর মজ্জা খাইয়ে খাইয়ে বাড়িয়ে তুলছে। তারা চন্দ্র সূর্যের পিছন পিছন যুগের পর যুগ ছুটে বেড়ায়। এতদিন খেয়ে খেয়ে তাদের মূর্তি এমন ভীষণ হল যে চন্দ্র সূর্য ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগল, পৃথিবী চৌচির হয়ে ফেটে উঠল, আকাশের নক্ষত্রেরা খসে খসে পড়তে লাগল। পাতালের রক্তকুকুর আর রাহুর বাপ ফেনরিস বিকট শব্দে ছুটে বেরোল। লোকি তার বাঁধন ছিঁড়ে লাফিয়ে

উঠল। সৃষ্টির মেরুদণ্ড য়গদ্রাসিল বা জগৎতরুর শিকড় কেটে মহানাগ নিধুগ বিকট মূর্তিতে বেরিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে ভীষণ শব্দে হিমদলের শিঙার আওয়াজ বেজে উঠল—সাবধান! সাবধান! সাবধান!

দেবতারা সব ঘুমের থেকে লাফিয়ে উঠে রামধনুকের রঙিন পথে নেমে আসলেন। যে বিরাট সাপ সমুদ্রের গভীর গুহায় দেবতার ভয়ে লুকিয়ে ছিল, সে আজ সমুদ্রের জল তোলপাড় করে বেরিয়ে এল। হিমের দেশের অসুররা সব ঝাপসা ধোঁয়ার বর্ম পরে কুয়াশায় চড়ে এগিয়ে এল। অগ্নিপুরীর দৈত্য-দানব মশাল জেলে চারিদিক রাঙিয়ে এল। তারপর আকাশ চিরে দৈত্যরাজ সুর্ত্র এলেন; আগুনের শিখার মতো, প্রলয়ের উল্কার মতো, এসেই তিনি স্বর্গদ্বারের সেতুর ওপর দলেবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর রামধনুকের রঙিন সেতু কাঁচের মতন গুঁড়িয়ে গেল।

তারপরই প্রলয় যুদ্ধ। আদি দেবতা অদিনের একটিমাত্র চোখ, তিনি নেকড়ে-অসুর ফেনরিসের সঙ্গে লড়তে গিয়েই বিপদে পড়লেন। রাহুর বাপ ফেনরিস, তার মা হল রাক্ষসী অঙ্গুর্বদা আর তার বাপ স্বয়ং লোকি। অসুরের প্রকাণ্ড দেহ যুদ্ধের উৎসাহে বাড়তে বাড়তে পাহাড় পর্বত ছাড়িয়ে উঠল; তার রক্তমাখা হাঁ-করা মুখে অদিন একবার ঢুকে গেলেন, আর তাঁকে পাওয়াই গেল না। ফ্রেয়ার ভাই মহাবীর ফ্রে গোলমালে তাঁর অজেয় খড়্গ খুঁজেই পেলেন না; তিনি সুর্ত্রের হাতে প্রাণ হারালেন। দেবরাজ থর্ তাঁর ভীষণ হাতুড়ির ঘায়ে সমুদ্রের বিরাট সাপকে খণ্ড খণ্ড করে আপনি তার বিষাক্ত রক্তে ডুবে মরলেন। যমপুরীর রক্তকুকুর যুদ্ধের দেবতা তাইরকে মেরে উল্লাসে তাঁর রক্ত পান করতে লাগল। এদিকে অদিনের পুত্র বিদার এসে পিতৃঘাতী ফেনরিসকে দুই টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। বড়-বড় দেবতা অসুর একে একে সবাই যখন প্রায় শেষ হয়েছে, তখন সুর্ত্রের হাত থেকে আগুনের খড়্গ ছুটে গিয়ে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে প্রলয়ের আগুন জেলে দিল। গাছপালা পুড়ে গেল, নদীর জল শুকিয়ে গেল, স্বর্গের সোনার পুরী ভস্ম হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর সব যখন ফুরিয়ে গেল তখন বিদার দেখলেন, বড়-বড় দেবতা অসুর কেউ আর বাকি নেই। কেবল থরের দুই ছেলে যুদ্ধের শ্মশানে থরের হাতুড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে!

আর লোকি? বিশ্বাসঘাতক লোকি অসুরের দলের মধ্যে মরে রয়েছে—হিমদলের খড়্গ তার বুকে বসান। হিমদলও মহাযুদ্ধে অবসন্ন হয়ে বীরের মতো রক্তাক্ত বেশে মরে আছেন।

সন্দেশ—১৩২৫

দেবতার সাজা

থর্ নরওয়ে দেশের যুদ্ধ-দেবতা।

যুদ্ধের দেবতা কিনা, তাই তাঁর গায়ে অসাধারণ জোর। তাঁর অস্ত্র একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি। সেই সর্বনেশে হাতুড়ির এক ঘা খেলে পাহাড় পর্যন্ত গুঁড়ো হ'য়ে যায়, কাজেই সে হাতুড়ির সামনে আর কেউ এগোতে সাহস পায় না। তার উপরে থরের একটা কোমরবন্ধ ছিল, সেটাকে কোমরে বেঁধে নিলে তাঁর গায়ের জোর দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

থরের মনে ভারি অহংকার, তাঁর সমান বীর আর তাঁর সমান পালোয়ান পৃথিবীতে বা স্বর্গে আর কেউ নেই।

একদিন থর্ দেখলেন, একটা পাহাড়ের পাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য ঘুমিয়ে আছে আর সে এমন নাক ডাকাচ্ছে যে গাছপালা পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। থর্ বললেন, "এইও বেয়াদব, নাক ডাকাচ্ছিস্ যে?" বলেই হাতুড়ি দিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে তার মাথায় তিন ঘা লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওই হাতুড়ির অমন ঘা খেয়েও দৈত্যের কিছু হল না, সে খালি একটু মাথা চুলকিয়ে বলল, "পাখিতে কি ফেলল?"

থর্ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি তো খুব বাহাদুর হে, আমার এ হাতুড়ির ঘা সহ্য করতে পারে, এমন লোক যে কেউ আছে, তা আমি জানতাম না।"

দৈত্য বলল, "তা জানবেন কোত্থেকে, আমাদের দেশে তো যান নি কখন। সেখানে আমার চেয়েও বড়, আমার চেয়ে ষণ্ডা ঢের ঢের দৈত্য আছে।" থর্ বললে, "বটে? তবে তো আমার একবার সেখানে যেতে হচ্ছে।"

দৈত্য তাঁকে দৈত্যপুরীর পথ দেখিয়ে দিল আর বলল, "দেখবেন, সেখানে গিয়ে বেশি বড়াই-টড়াই করবেন না কারণ আপনি যত বড়ই দেবতা হন না কেন, সে দেশে বাহাদুরি করতে গেলে শেষে লজ্জা পেতে হবে।"

দৈত্যপুরীর চারদিকে প্রকাণ্ড বরফের দেওয়াল—সে এত বড় যে তার নীচে দাঁড়ালে চুড়ো দেখা যায় না। সেই দেয়ালের এক জায়গায় বড়-বড় গরাদ দেওয়া আকাশের মতো উঁচু ফটক।

থর্ দেখলেন সে ফটক খোলা তাঁর সাধ্য নয়, তাই তিনি দুটো গরাদের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। দেয়াল-ঘেরা দৈত্যপুরীর রাজসভায় বসে বসে পাহাড়ের মতো বড়-বড় দৈত্যরা সব গল্প করছে; তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে, সেই হচ্ছে দৈত্যের রাজা।

দৈত্যেরা থর্‌কে দেখেও যেন দেখে নি এমনিভাবে গল্প করতে লাগল। খানিক পরে দৈত্যরাজ থরের দিকে তাকিয়ে, বড়-বড় চোখ করে, যেন কতই আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কে ও? আরে, থর্ নাকি? আপনিই কি সেই দেবতা, যার গায়ে ভয়ানক জোর। তা হবেও-বা, শুধু শরীর বড় হ'লেই তো আর গায়ে জোর হয় না? আচ্ছা আপনার সম্বন্ধে যে-সকল ভয়ানক গল্প শুনি সে-সব কি সত্যি?"

থর্ বললেন, "সত্যি কিনা, এখনি বুঝবে। ওরে কে আছিস, আমায় একটু জল দে তো, এক চুমুকে কতখানি খাওয়া যায় তোদের একবার দেখিয়ে দি।"

তখন রাজার হুকুমে একটা শিঙায় ক'রে ঠাণ্ডা জল এনে থরকে দেওয়া হল। রাজা বললেন, "আমাদের মধ্যে বড়-বড় পালোয়ান ছাড়া, কেউ ওটাকে এক চুমুকে খালি করতে পারে না। সাধারণ দৈত্যেরা দুই চুমুকে শেষ করে। তবে যারা নেহাৎ আনাড়ি, তাদের তিন চুমুক লাগে।"

থর্ তাড়াতাড়ি শিঙাটা নিয়ে চোঁ চোঁ চোঁ ক'রে এমন টান দিলেন যে, মনে হল শিঙা নিশ্চয়ই খালি হ'য়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! শিঙা যেমন ভর্তি প্রায় তেমনই রইল। থর্ ভারি লজ্জিত হ'য়ে আবার জল খেতে লাগলেন—ঢক ঢক ঢক ঢক ঢক ঢক ঢক, তবু জল ফুরোল না।

রাজা হো হো ক'রে হেসে বললেন, "তাই তো, অনেকটা যে বাকি রাখলেন।"

থর্ তখন রেগে খুব একটা দম নিয়ে আবার চুমুক দিলেন; খাওয়া আর থামে না—পেট ঢাক হয়ে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু জল তবু ফুরোতে চায় না। তখন থর্ আর কি করে?

তিনি বললেন, "না, জল খাওয়াতে আর বেশি বাহাদুরি কি? পেটুকের মতো খানিকটা জল গিল্‌লেই তো আর গায়ের জোর প্রমাণ হয় না। দেখি তো আমার মতো ভারি জিনিস কে তুলতে পারে।"

দৈত্যরাজ বললেন, "তা বেশ তো। একটা সহজ পরীক্ষা দিয়েই আরম্ভ করা যাক্—ওরে আমার বেড়ালটাকে নিয়ে আয় তো।" বলতেই একটা ছেয়ে রঙের বেড়াল ঘরের মধ্যে ঢুকল। থর্ তাড়াতাড়ি বেড়ালটাকে ঘাড়ে ধরে ছুঁড়ে ফেলতে গেলেন। কিন্তু বেড়ালটা এমনি শক্ত করে মাটি আঁকড়ে রইল যে অনেক টানাটানির পর তার একটি পা মাটি থেকে মাত্র এক আঙুল ওঠান গেল!

দৈত্যরাজ বললেন, "না আমারই অন্যায় হয়েছে। এতটুকু লোক, সেকি ওই ধাড়ি বেড়ালটাকে তুলতে পারে?"

থর্ তখন ভয়ানক চটে গিয়ে বললেন, "বটে! এতটুকু হই আর যাই হই—দেখি তো, কে আমার সঙ্গে কুস্তিতে পারে?"

দৈত্য বলল, "তবেই তো মুস্কিলে ফেললেন! আপনার সঙ্গে লড়াই করবার লোক এখন আমি কোথায় পাই?" আচ্ছা দেখি—"ওরে বুড়ি ঝিটাকে ডেকে আন তো।"

মান্ধাতার আমলের এক বুড়ি, তার চুল সব সাদা, তার মুখে দাঁত নেই, গাল-টাল সব তুব্‌ড়ে গেছে—সে এল কুস্তি করতে! থর্ তো চটেই লাল! বললেন, "একি তামাশা পেয়েছ?" দৈত্যরা তাতে আরো হাসতে লাগল। বলল, "ও বুড়ি, থাক্ থাক্ ওকে মারিস নে—ও ভয় পেয়েছে।" থর্ তখন তেড়ে গিয়ে বুড়িকে এক ধাক্কা দিলেন। তাতে বুড়ি তাঁকে ঘাড় ধ'রে মাটিতে বসিয়ে দিল!

থর্ তখন আর কি করেন? লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সারারাত্রি সে অপমানের কথা ভেবে তাঁর ঘুম হল না। পরদিন সকালবেলাই তিনি বাড়ি চললেন। দৈত্যরাজ খুব খাতির করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুরীর ফটক পর্যন্ত এলেন। ফটকের কাছে এসে দৈত্যরাজ হেসে বললেন, "আপনাকে একটা কথা বলছি, কারণ সেটা না বললে অন্যায় হয়। কাল কিন্তু সত্যিই আপনার হার হয় নি। আপনার অহংকার ভাঙবার জন্যই আমরা আপনাকে একটু ফাঁকি দিয়েছি। ঐ যে শিঙাটা দেখলেন, ওটা সমুদ্রের শিঙা। সমস্ত সমুদ্রের জল না ফুরোলে

ওর জল ফুরায় না। আপনি যে তিন চুমুক দিয়েছিলেন, তাতে কতক জায়গায় সমুদ্রের ধারে চড়া পড়ে গিয়েছে।

"আর ঐ বেড়ালটা কি জানেন? ও হচ্ছে 'স্ক্রাইমিড'—সে সাপের মতো হয়ে সমস্ত পাহাড় নদী সমুদ্রসুদ্ধ পৃথিবীটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে! আপনার টানে পৃথিবীটা প্রায় দশখানা হয়ে ফাটবার জোগাড় হয়েছিল।

"আর ঐ বুড়ি ঝি হচ্ছে জরা, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়স। বুড়ো বয়সে কাকে না কাবু করে? আর, কাল সকালে আপনি যে দৈত্যের মাথায় হাতুড়ি মেরেছিলেন আমিই সেই দৈত্য। সে হাতুড়ি আমার মাথায় একটুও লাগে নি। আমি আগে থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য এক মায়া পাহাড়ের আড়াল দিয়েছিলাম—ওই দেখুন আপনার হাতুড়িতে তার কি দুর্দশা হয়েছে।"

থর্ যখন এ-সব ফাঁকির কথা শুনলেন—তখন তিনি রেগে কাঁপতে লাগলেন। হাতুড়িটাকে মাথার উপরে তুলে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে তিনি যেই সেটা ছুঁড়তে যাবেন, অমনি দেখেন—কোথায় দৈত্য, কোথায় পুরী—চারদিকে কোথাও কিছু নাই!

মনের রাগ মনে মনেই হজম করে থর্ সেদিন বাড়ি ফিরলেন।

সন্দেশ—১৩২১

হারকিউলিস

মহাভারতে যেমন ভীম, গ্রীস দেশের পুরাণে তেমনই হারকিউলিস। হারকিউলিস দেবরাজ জুপিটারের পুত্র কিন্তু তাঁহার মা এই পৃথিবীরই এক রাজকন্যা, সুতরাং তিনিও ভীমের মতো এই পৃথিবীরই মানুষ, গদাযুদ্ধে আর মল্লযুদ্ধে তাঁহার সমান কেহ নাই। মেজাজটি তাঁহার ভীমের চাইতেও অনেকটা নরম, কিন্তু তাঁহার এক-একটি কীর্তি এমনই অদ্ভুত যে, পড়িতে পড়িতে ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ আর হনুমান এই চার মহাবীরের কথা মনে পড়ে।

হারকিউলিসের জন্মের সংবাদ যখন স্বর্গে পেঁৗছিল, তখন তাঁহার বিমাতা জুনো দেবী হিংসায় জ্বলিয়া বলিলেন, "আমি এই ছেলের সর্বনাশ করিয়া ছাড়িব।" জুনোর কথামত দুই প্রকাণ্ড বিষধর সাপ হারকিউলিসকে ধ্বংস করিতে চলিল। সাপ যখন শিশু হারকিউলিসের ঘরে ঢুকিল, তখন তাহার ভয়ংকর মূর্তি দেখিয়া ঘরসুদ্ধ লোকে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, কেহ শিশুকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিল না। কিন্তু হারকিউলিস নিজেই তাঁহার দুইখানি কচি হাত বাড়াইয়া সাপ দুটার গলায় এমন চাপিয়া ধরিলেন যে, তাহাতেই তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। জুনো বুঝিলেন, এ বড় সহজ শিশু নয়!

বড় হইয়া হারকিউলিস সকল বীরের গুরু বৃদ্ধ চীরণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে গেলেন। চীরণ জাতিতে সেণ্টর—তিনি মানুষ নন। সেণ্টরদের কোমর

পর্যন্ত মানুষের মতো, তার নীচে একটা মাথাকাটা ঘোড়ার শরীর বসান। চীরণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া হারকিউলিস অসাধারণ যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এইবার পৃথিবীটাকে একবার দেখিয়া লইব।'

হারকিউলিস পৃথিবীতে বীরের উপযুক্ত কাজ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় দুইটি আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হারকিউলিস দেখিলেন দুইটি মেয়ে—তাহাদের মধ্যে একজন খুব চঞ্চল, সে নাকে-চোখে কথা কয়, তাহার দেমাকের ছটায় আর অলংকারের বাহারে যেন চোখ ঝলসাইয়া দেয়। সে বলিল, "হারকিউলিস, আমাকে তুমি সহায় কর, আমি তোমায় ধন দিব, মান দিব, সুখে-স্বচ্ছন্দে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইবার উপায় করিয়া দিব।" আর-একটি মেয়ে শান্তশিষ্ট, সে বলিল, "আমি তোমাকে বড়-বড় কাজ করিবার সুযোগ দিব, শক্তি দিব, সাহস দিব। যেমন বীর তুমি তাহার উপযুক্ত জীবন তোমায় দিব।" হারকিউলিস খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ধন মান সুখ চাই না—আমি তোমার সঙ্গেই চলিব। কিন্তু তোমার পরিচয় জানিতে চাই।" তখন দ্বিতীয় সুন্দরী বলিল, "আমার নাম পুণ্য। আজ হইতে আমি তোমার সহায় থাকিলাম।"

তাহার পর কত বৎসর হারকিউলিস দেশে দেশে কত পুণ্য কাজ করিয়া ফিরিলেন—তাঁহার গুণের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। থেবিসের রাজা ক্রয়ন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কন্যা মেগারার বিবাহ দিলেন। হারকিউলিস নিজের পুণ্যফলে কয়েক বৎসর সুখে কাটাইলেন। কিন্তু বিমাতা জুনোর মনে হারকিউলিসের এই সুখ কাঁটার মতো বিঁধিল। তিনি কি চক্রান্ত করিলেন, তাহার ফলে একদিন হারকিউলিস হঠাৎ পাগল হইয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সকলকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহার পর যখন তাঁহার মন সুস্থ হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পাগল অবস্থায় কি সর্বনাশ করিয়াছেন, তখন শোকে অস্থির হইয়া এক পাহাড়ের উপরে নির্জন বনে গিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আর বাঁচিয়া লাভ কি?'

হারকিউলিস দুঃখে বনবাসী হইয়াছেন, এদিকে জুনো ভাবিতেছেন, 'এখনো যথেষ্ট হয় নাই।' তিনি দেবতাদের কুমন্ত্রণা দিয়া এই ব্যবস্থা করাইলেন যে, এক বৎসর সে আর্গসের দুর্দান্ত রাজা থিউসের দাসত্ব করিবে।

হারকিউলিস প্রথমে এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে রাজি হন নাই—কিন্তু দেবতাদের হুকুম লঙ্ঘন করিবার আর উপায় নাই দেখিয়া, শেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজা ইউরিসথিউস্ ভাবিলেন, 'এইবার হারকিউলিসকে হাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে দিয়া এমন সব অদ্ভুত কাজ করাইয়া লইব, যাহাতে আমার নাম পৃথিবীতে অমর হইয়া থাকিবে।'

নেমিয়ার জঙ্গলে এক দুর্দান্ত সিংহ ছিল, তাহার দৌরাত্ম্যে দেশের লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা ইউরিসথিউস্ বলিলেন, "যাও হারকিউলিস! সিংহটাকে মারিয়া আইস।" হারকিউলিস সিংহ মারিতে চলিলেন। "কোথায় সেই সিংহ?" পথে যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন সেই বলে, "কেন বাপু সিংহের হাতে প্রাণ দিবে? সে সিংহকে কি মানুষে মারিতে পারে? আজ পর্যন্ত যে-কেহ সিংহ মারিতে গিয়াছে সে আর ফিরে নাই।" কিন্তু হারকিউলিস ভয় পাইলেন না। তিনি একাকী গভীর বনে সিংহের গহ্বরে ঢুকিয়া, সিংহের টুঁটি চাপিয়া তাহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর সেই সিংহের চামড়া পরিয়া তিনি রাজার কাছে সংবাদ

দিতে ফিরিলেন।

রাজা বলিলেন, ''এবার যাও লের্ণার জলাভূমিতে। সেখানে হাইড্রা নামে সাত-মুণ্ড সাপ আছে, তাহার ভয়ে লোকজন দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। জন্তুটাকে না মারিলে তো আর চলে না!'' হারকিউলিস তৎক্ষণাৎ সাতমুণ্ড জানোয়ারের সন্ধানে বাহির হইলেন।

লের্ণার জলাভূমিতে গিয়া আর সন্ধান করিতে হইল না, কারণ হাইড্রা নিজেই ফোঁস ফোঁস শব্দে আকাশ কাঁপাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। হারকিউলিস এক ঘায়ে তাহার একটা মাথা উড়াইয়া দিলেন—কিন্তু, সে কি সর্বনেশে জানোয়ার—সেই একটা কাটা মাথার জায়গায় দেখিতে দেখিতে সাতটা নূতন মাথা গজাইয়া উঠিল। হারকিউলিস দেখিলেন, এ জন্তু সহজে মরিবার নয়। তিনি তাঁহার সঙ্গী ইয়োলাসকে বলিলেন, ''একটা লোহা আগুনে রাঙাইয়া আন তো।'' তখন জ্বলন্ত গরম লোহা আনাইয়া তাহার পর হাইড্রার এক-একটা মাথা উড়াইয়া কাটা জায়গায় লোহার ছ্যাঁকা দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এত করিয়াও নিস্তার নাই, শেষ একটা মাথা আর কিছুতেই মরিতে চায় না—সাপের শরীর হইতে একেবারে আলগা হইয়াও সে সাংঘাতিক হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে। হারকিউলিস তাহাকে পিটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া, তাহার উপর প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। ফিরিবার আগে হারকিউলিস সেই সাপের রক্তে কতগুলো তীরের মুখ ডুবাইয়া লইলেন, কারণ, তাঁহার গুরু চীরণ বলিয়াছেন—হাইড্রার রক্তমাখা তীর একেবারে অব্যর্থ মৃত্যুবাণ।

হারকিউলিস ইউরিসথিউসের দেশে ফিরিয়া গেলে পর, কিছুদিন বাদেই আবার তাঁহার ডাক পড়িল। এবারে রাজা বলিলেন, "সেরিনিয়ার হরিণের কথা শুনিয়াছি, তাহার সোনার শিঙ, লোহার পা, সে বাতাসের আগে ছুটিয়া চলে। সেই হরিণ আমার চাই—তুমি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া আন।" হারকিউলিস আবার চলিলেন। কত দেশ দেশান্তর, কত নদী সমুদ্র পার হইয়া দিনের পর দিন সেই হরিণের পিছন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শেষে উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে বরফের মধ্যে হরিণ যখন শীতে অবশ হইয়া পড়িল, তখন হারকিউলিস সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া রাজার কাছে হাজির করিলেন।

ইহার পর রাজা হুকুম দিলেন, এরিম্যান্থাসের রাক্ষসবরাহকে মারিতে হইবে। সে বরাহ খুবই ভীষণ বটে, কিন্তু তাহাকে মারিতে হারকিউলিসের বিশেষ কোন ক্লেশ হইবার কথা নয়। তাহা ছাড়া, বরাহ পলাইবার পাত্র নয়, সুতরাং তাহার জন্য দেশ-বিদেশে ছুটিবারও দরকার হয় না। হারকিউলিস সহজেই কার্যোদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু মাঝে হইতে একদল হতভাগা সেণ্টর আসিয়া তাঁহার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া বসিল। হারকিউলিস তখন সেই হাইড্রার রক্ত-মাখান বিষবাণ ছুঁড়িয়া তাহাদের মারিতে লাগিলেন। এদিকে বৃদ্ধ চীরণের কাছে খবর গিয়াছে যে, হার-কিউলিস নামে কে একটা মানুষ আসিয়া সেণ্টরদের মারিয়া শেষ করিল। চীরণ তখনই ঝগড়া থামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ হারকিউলিসের একটা তীর ছুটিয়া তাঁহার গায়ে বিঁধিয়া গেল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল, হারকিউলিসও অস্ত্র ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। সেণ্টরেরা অনেক-রকম ঔষধ জানে, হারকিউলিসও তাঁহার গুরুর কাছে অস্ত্রাঘাতের নানারকম

চিকিৎসা শিখিয়াছেন—কিন্তু সে বিষবাণ এমন সাংঘাতিক, তাহার কাছে কোন চিকিৎসাই খাটিল না। চীরণ আর বাঁচিলেন না। এবার হারকিউলিস তাঁহার কাজ সারিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ মনে গুরুর কথা ভাবিতে ভাবিতে দেশে ফিরিলেন।

হারকিউলিস একা সেণ্টরদের যুদ্ধে হারাইয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলে বলিল, ''হারকিউলিস না জানি কত বড় বীর! এমন আশ্চর্য কীর্তির কথা আমরা আর শুনি নাই।'' আসলে কিন্তু হারকিউলিসের বড়-বড় কাজ এখনো কিছুই করা হয় নাই—তাঁহার কীর্তির পরিচয় সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

বরাহ মারিয়া হারকিউলিস অল্পই বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলেন—কারণ তাহার পরই এলিস নগরের রাজা আগিয়াসের গোয়ালঘর সাফ করিবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িল। আগিয়াসের প্রকাণ্ড গোয়ালঘরে অসংখ্য গরু, কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া সে ঘর কেহ ঝাঁট দেয় না, ধোয় না—সুতরাং তাহার চেহারাটি তখন কেমন হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখ। গোয়ালঘরের অবস্থা দেখিয়া হারকিউলিস ভাবনায় পড়িলেন। প্রকাণ্ড ঘর, তাহার ভিতর হাঁটিয়া দেখিতে গেলেই ঘণ্টাখানেক সময় যায়। সেই ঘরের ভিতর হয়তো বিশ বৎসরের আবর্জনা জমিয়াছে—অথচ একজন মাত্র লোকে তাহাকে সাফ করিবে, ঘরের কাছ দিয়া আলফিউস্ নদী স্রোতের জোরে প্রবল বেগে বহিয়া চলিয়াছে—হারকিউলিস ভাবিলেন—'এই তো চমৎকার উপায় হাতের কাছেই রহিয়াছে!' তিনি তখন একাই গাছ পাথরের বাঁধ বাঁধিয়া স্রোতের মুখ ফিরাইয়া, নদীটাকে সেই গোয়ালঘরের উপর দিয়া চালাইয়া দিলেন। নদী হু হু শব্দে নূতন পথে বহিয়া চলিল, বিশ বৎসরের জঞ্জাল মুহূর্তের মধ্যে ধুইয়া সাফ হইয়া গেল। তাহার পর যেখানকার নদী সেখানে রাখিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন।

এদিকে ক্রীটদ্বীপে আর-এক বিপদ দেখা দিয়াছে। জলের দেবতা নেপচুন সে দেশের রাজাকে এক প্রকাণ্ড ষাঁড় উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, ''এই জন্তুটিকে তুমি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া বলি দাও।'' কিন্তু ষাঁড়টি এমন আশ্চর্যরকম সুন্দর যে, তাহাকে বলি দিতে রাজার মন সরিল না—তিনি তাহার বদলে আর-একটি ষাঁড় আনিয়া বলির কাজ সারিলেন। নেপচুন সমুদ্রের নীচে থাকিয়াও এ-সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার ষাঁড়কে আদেশ দিলেন, ''যাও! এই দুষ্টু রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া ইহার অবাধ্যতার সাজা দাও।'' নেপচুনের আদেশে সেই সর্বনেশে ষাঁড় পাগলের মতো চারিদিকে ছুটিয়া সারাটি রাজ্য উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। একে দেবতার ষাঁড়, তাহার উপর যেমন পাহাড়ের মতো দেহখানি, তেমনই আশ্চর্য তাহার শরীরের তেজ—কাজেই রাজ্যের লোক প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত। এমন জন্তুকে বাগাইবার জন্য তো হারকিউলিসের ডাক পড়িবেই। হারকিউলিসও অতি সহজেই তাকে শিঙ ধরিয়া মাটিতে আছড়াইয়া একেবারে পোঁটলা বাঁধিয়া রাজসভায় নিয়া হাজির করিলেন। রাজা ইউরিসথিউসের মেয়ে বাপের বড় আদুরে। সে একদিন আব্দার ধরিল তাকে হিপোলাইটের চন্দ্রহার আনিয়া দিতে হইবে। হিপো-লাইট এমেজনদের রানী। এমেজনদের দেশে কেবল মেয়েদেরই রাজত্ব। বড় সর্বনেশে মেয়ে তাহারা—সর্বদাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, পৃথিবীর কোন মানুষকে তাহারা ডরায় না। কিন্তু হারকিউলিসকে তাহারা খুব খাতির সম্মান করিয়া তাহাদের রানীর কাছে লইয়া গেল। হারকিউলিস তখন রানীর কাছে তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। রানী বলিলেন, "আজ তুমি খাও-দাও, বিশ্রাম কর, কাল অলংকার লইতে আসিও।"

হারকিউলিসের সৎমা জুনো দেবী দেখিলেন, নেহাৎ সহজেই বুঝি এবারের কাজটা উদ্ধার হইয়া যায়। তিনি নিজে এসেজন সাজিয়া এসেজন দলে ঢুকিয়া, সকলকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "এই যে লোকটি রানীর কাছে অলংকার ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে ইহাকে তোমরা বড় সহজ পাত্র মনে করিও না। আসলে কিন্তু, এ লোকটা আমাদের রানীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে চায়। অলংকার-টলংকার ও-সকল মিথ্যা কথা—কেবল তোমাদের ভুলাইবার জন্য।"

তখন সকলে রুখিয়া একেবারে মার মার শব্দে হারকিউলিসকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিস একাকী গদা হাতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর এসেজনরা বুঝিল, হারকিউলিসের সঙ্গে পারিয়া উঠা তাহাদের সাধ্য নয়। তখন তাহারা রানীর চন্দ্রহার হারকিউলিসকে দিয়া বলিল, "যে অলংকার তুমি চাহিয়াছিলে, এই লও। কিন্তু তুমি এদেশে আর থাকিতে পাইবে না।" হারকিউলিসের কাজ উদ্ধার হইয়াছে, তাঁহার আর থাকিবার দরকার কি? তিনি তখনই তাহাদের নমস্কার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইউরিসথিউস্ মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হারকিউলিস! আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি আমার জন্য আটটি বড় কাজ করিলে, এখন আর চারিটি কাজ করিলে তোমার ছুটি। প্রথম কাজ এই যে, স্টাইমফেলাসের সমুদ্রতীরে যে বড়-বড় লৌহমুখ পাখি আছে, সেগুলাকে মারিতে হইবে।" হারকিউলিস হাইড্রার রক্তমাখা বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়া সহজেই পাখিগুলাকে মারিয়া শেষ করিলেন।

ইহার পর তিনি রাজার হুকুমে গেরিয়ানিস নামে এক দৈত্যের গোয়াল হইতে তাহার গরুর দল কাড়িয়া আনিলেন। পথে ক্যাকাস্ নামে একটা কদাকার দৈত্য কয়েকটা গরু চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হারকিউলিস তাহাকে বাসা পর্যন্ত তাড়া কবিয়া, শেষে গদার বাড়িতে তাহার মাথা গুঁড়াইয়া দেন।

পশ্চিমের দেবতা সন্ধ্যাতারার মেয়েদের নাম হেস্পেরাইডিস্। লোকে বলিত, তাদের বাগানে আপেল গাছে সোনার ফল ফলে। একদিন রাজা সেই ফল হারকিউলিসের কাছে চাহিয়া বসিলেন। এমন কঠিন কাজ হারকিউলিস আর করেন নাই। ফলের কথা সকলেই জানে, কিন্তু কোথায় যে সে ফল, আর কোথায় যে সে আশ্চর্য বাগান, কেউ তাহা বলিতে পারে না। হারকিউলিস দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া কেবলই জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু কেউ তাহার জবাব দিতে পারে না। কত দেশের কতরকম লোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, সকলেই বলে, "হাঁ, সেই ফলের কথা আমরাও শুনিয়াছি, কিন্ত কোথায় সে বাগান তাহা জানি না।" এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন হারকিউলিস এক নদীর ধারে আসিয়া দেখিলেন, কয়েকটি মেয়ে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। হারকিউলিস বলিলেন, "ওগো, তোমরা হেস্পেরাইডিসের বাগানের কথা জান? সেই যেখানে আপেল গাছে সোনার ফল ফলে?" মেয়েরা বলিল, "আমরা নদীর মেয়ে, নদীর জলে থাকি—আমরা কি দুনিয়ার খবর রাখি? আসল খবর যদি চাও তবে বুড়োর কাছে যাও।" হারকিউলিস বলিলেন, "কে বুড়ো? সে কোথায় থাকে?" মেয়েরা বলিল, "সমুদ্রের থুড়্থুড়ে বুড়ো, যাহার সবুজ রঙের জটা, যাহার গায়ে মাছের মতো আঁশ, যাহার হাত-পাগুলো হাঁসের মতো চ্যাটাল—সেই বুড়ো যখন তীরে ওঠে তখন যদি তাহাকে ধরিতে পার, তবে সে তোমায় বলিতে পারিবে পৃথিবীর কোথায় কি আছে। কিন্তু খবরদার!

বুড়ো বড় সেয়ানা, তাকে ধরিতে পারিলে খবরটা আদায় না করিয়া ছাড়িও না।" হারকিউলিস তাহাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়া বুড়োর খবর লইতে চলিলেন। সমুদ্রের তীরে তীরে খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন হারকিউলিস দেখিলেন, শ্যাওলার মতো পোশাক পরা কে একজন সমুদ্রের ধারে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহার সবুজ চুল আর গায়ের আঁশেই তাহার পরিচয় পাইয়া হারকিউলিস এক লাফে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বুড়ো! হেস্‌পেরাইডিসের বাগানের সন্ধান বল, নহিলে তোমায় ছাড়িব না।" এই বলিতে না বলিতেই বুড়ো তাঁহার সামনেই কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহার জায়গায় একটা হরিণ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। হারকিউলিস বুঝিলেন এ-সব বুড়োর শয়তানী, তাই তিনি খুব মজবুত করিয়া হরিণের ঠ্যাঙ ধরিয়া থাকিলেন। হরিণটা তখন একটা পাখি হইয়া করুণস্বরে আর্তনাদ আর ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। হারকিউলিস তবু ছাড়িলেন না। তখন পাখিটা একটা তিন-মাথা-ওয়ালা কুকুরের রূপ ধরিয়া তাঁহাকে কামড়াইতে আসিল! হারকিউলিস তখন তাহার ঠ্যাঙটা আরো শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তাহাতে কুকুরটা চিৎকার করিয়া গেরিয়ানের মূর্তিতে দেখা দিল। গেরিয়ানের শরীরটা মানুষের মতো, কিন্তু তাহার ছয়টি পা। এক পা হারকিউলিসের মুঠার মধ্যে, সেইটা ছাড়াইবার জন্য সে পাঁচ পায়ে লাথি ছুঁড়িতে লাগিল।

তাহাতেও হাত ছাড়াইতে না পারিয়া সে প্রকাণ্ড অজগর সাজিয়া হারকিউলিসকে গিলিতে আসিল, হারকিউলিস ততক্ষণে ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, তিনি সাপটাকে এমন ভীষণভাবে টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন যে, প্রাণের ভয়ে বুড়ো তাহার নিজের মূর্তি ধরিয়া বাহির হইল। বুড়ো হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তুমি কোথাকার অভদ্র হে! বুড়ো মানুষের সঙ্গে এরকম বেয়াদবি কর।" হারকিউলিস বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।" বুড়ো তখন বেগতিক দেখিয়া বলিল, "যাহার কাছে গেলে তোমার কাজটি উদ্ধার হইবে, আমি তাহার সন্ধান বলিতে পারি। এইদিকে আফ্রিকার সমুদ্রতীর ধরিয়া বরাবর চলিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি এটলাস দৈত্যের দেখা পাইবে। এমন দৈত্য আর দ্বিতীয় নাই। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর সমস্ত আকাশটিকে ঘাড়ে করিয়া সে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। এক মুহূর্ত তাহার কোথাও যাইবার জো নাই, তাহা হইলেই আকাশ ভাঙিয়া পৃথিবীর উপর পড়িবে। মেঘের উপরে কোথায় আকাশ পর্যন্ত তাহার মাথা উঠিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে দুনিয়ার সবই সে দেখিতে পায়। সে যদি খুশি মেজাজে থাকে, তবে হয় তো তোমার সোনার ফলের কথা বলিতে পারে।" হারকিউলিস তাঁহার গদা ঘুরাইয়া বলিলেন, "যদি খুশি মেজাজে না থাকে, তবুও সোনার ফলের কথা তাহাকে বলাইয়া ছাড়িব।"

সমুদ্রের বুড়োর কাছে এটলাসের খবর আদায় করিয়া হারকিউলিস তাহার কথা মতো আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কত পাহাড় নদী, কত শহর গ্রাম পার হইয়া, তিনি এক অদ্ভুত দেশে আসিলেন। সেখানে মানুষগুলো অসম্ভবরকম বেঁটে। শত্রুর ভয় তাহাদের এতই বেশি যে তাহাদের দেশ রক্ষার জন্য তাহারা এক দৈত্যের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া, তাহারই উপর পাহারা দিবার ভার রাখিয়াছে। এই দৈত্যের নাম এণ্টিয়াস—পৃথিবী তাহার মা।

দূর হইতে হারকিউলিসকে গদা ঘুরাইয়া আসিতে দেখিয়া, বামনদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। তাহারা চিৎকার করিয়া এণ্টিয়াসকে সাবধান করিয়া দিল। এণ্টিয়াসও তাহাই চায়। তাহার ভয়ে বহুদিন পর্যন্ত লোকজন কেউ সে দিকে ঘেঁষে না, তাই হারকিউলিসকে দেখিয়াই সে একেবারে গদা উঠাইয়া 'মার্ মার্' করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিসও তৎক্ষণাৎ তাহার গদা এড়াইয়া, এক বাড়িতে তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাটিতে পড়িবামাত্র তাহার তেজ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে আবার উঠিয়া ভীষণ তেজে হারকিউলিসকে মারিতে উঠিল। হারকিউলিস আবার তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু মাটি ছোঁয়ামাত্র আবার তাহার অসম্ভব তেজ বাড়িয়া গেল, সে আবার হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিল। হারকিউলিস তো জানেন না যে পৃথিবীর বরে মাটি ছুঁইলেই আবার তাহার তেজ বাড়ে। তিনি বারবার তাহাকে নানারকম মারপ্যাঁচ দিয়া মাটিতে ফেলেন, বারবারই কোথা হইতে তাহার নূতন তেজ দেখা দেয়। তখন তিনি দৈত্যটাকে ঘাড়ে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া দুই হাতে তাহাকে এমন চাপিয়া ধরিলেন যে, সেই চাপের চোটে তাহার দম বাহির হইয়া প্রাণসুদ্ধ উড়িয়া গেল। তখন তাহার দেহটাকে তিনি পাহাড় পর্বত ডিঙ্গাইয়া কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

তখন বামনেরা সবাই মিলিয়া ভয়ানক কোলাহল আর কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। কেহ 'হায় হায়' করিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিল, কেহ প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কেহ আস্ফালন করিয়া বলিল, "এসো, আমরা সকলে ইহার প্রতিশোধ লই।" হারকিউলিস তাহাদের বলিলেন, "ভাইসকল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নাই। ওই হতভাগা খামখা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, তাই উহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাজা দিয়াছি। তোমাদের আমি কোন অনিষ্ট করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া, সেখান হইতে সেই সোনার আপেলের সন্ধানে এটলাস দৈত্যের খবর লইতে চলিলেন।

এইভাবে পথ চলিতে চলিতে শেষে হারকিউলিস সত্য-সত্যই এটলাসের দেখা পাইলেন। সেই সমুদ্রের বুড়ো যেমন বর্ণনা করিয়াছিল, ঠিক সেইরকমভাবে সেই বিরাট দৈত্য আকাশটাকে মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হারকিউলিসকে দেখিয়া সে মেঘের ডাকের মতো গম্ভীর গলায় বলিল, "আমি এটলাস—আমি আকাশকে মাথায় ধরিয়া রাখি—আমার মতো আর কেউ নাই।" হারকিউলিস তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনার সন্ধানে আমি দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছি—এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে, সেইটি জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" দৈত্য বলিল, "এই আকাশের নীচে মেঘের উপরে থাকিয়া আমার চোখ সব দেখে, সব জানে—যাহা জানিতে চাও আমাকে জিজ্ঞাসা কর।" হারকিউলিস বলিলেন, "তবে বলিয়া দিন, হেস্পেরাইডিসের বাগানে যে সোনার ফল ফলে, সেই ফল আমি কেমন করিয়া পাইতে পারি।" দৈত্য হইলেও এটলাসের মেজাজটি বড় ভালো। সে বলিল, "তাহাতে আর মুশকিল কি? এই আকাশটাকে তুমি একটুক্ষণ ধরিয়া রাখ, আমি এখনই তোমায় সে ফল আনিয়া দিতেছি।" হারকিউলিস ভাবিলেন, 'এ বড় চমৎকার কথা। কত কীর্তি তো সঞ্চয় করিয়াছি, কিন্তু আকাশটাকে ঠেকাইয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিবার এমন সুযোগ আর কোনদিন পাইব না।' তাই তিনি দৈত্যের কথায় তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন।

কত হাজার হাজার বছর এটলাসের ঘাড়ে আকাশের ভার চাপান রহিয়াছে, শীত গ্রীষ্ম, রোদ বৃষ্টি সব সহিয়া বেচারা সেই বোঝা মাথায় রাখিয়া আসিতেছে। এতদিন পরে হারকিউলিসের কৃপায় সে একটু জিরাইয়া লইবার সুযোগ পাইল। মনের আনন্দে সে খুব খানিকটা লাফাইয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, তারপর লম্বা পা ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে হেস্‌পেরাইডিসের বাগানে গিয়া হাজির। সেখানে 'ড্রেগন' মারিয়া বাগান খুঁজিয়া সোনার আপেল তুলিয়া আনিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। তখন তাহার মনে হঠাৎ এক কুবুদ্ধি জাগিল। সে ভাবিল, কেন আর মিছামিছি আকাশের বোঝা লইয়া থাকি। এই মানুষটার উপরেই এখন আকাশের ভার দিলেই হয়। এই ভাবিয়া সে হারকিউলিসকে বলিল, ''ওহে পৃথিবীর মানুষ, তোমার গায়ে তো বেশ শক্তি দেখিতেছি। এখন হইতে তুমিই আকাশটাকে ঠেকাইবার ভার লও না কেন? আমি বরং তোমার রাজার কাছে আপেলগুলা দিয়া আসি!''

হারকিউলিস দেখিলেন বেগতিক! এ হতভাগা একটুক্ষণ ছুটি পাইয়া আর কাজে ফিরিতে চায় না। তিনি একটু চালাকি করিয়া বলিলেন, ''তবে ভাই একটু আকাশটাকে ধর তো, আমার এই সিংহচর্মটিকে কাঁধের উপর ভালো করিয়া পাতিয়া লই।'' বোকা দৈত্য তাড়াতাড়ি ফলগুলি রাখিয়া, আবার নিজের কাঁধ দিয়া আকাশ-টাকে আগলাইয়া ধরিল। হারকিউলিসও তৎক্ষণাৎ ফলগুলা উঠাইয়া লইয়া, দৈত্যকে এক লম্বা নমস্কার দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। দৈত্য বেচারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

এত পরিশ্রম করিয়া সোনার ফল আনিয়াও হারকিউলিসের দাসত্ব ঘুচিল না। রাজা ইউরিসথিউস্‌ বলিলেন, ''আর-একটি কাজ তোমায় করিতে হইবে—তুমি পাতালে গিয়া যমের কুকুর সারবেরাস্‌কে বাঁধিয়া আন।'' হারকিউলিস পাতালে গিয়া, সেই ভীষণ মূর্তি কুকুরকে ধরিয়া রাজার সম্মুখে হাজির করিলেন। তাহার তিন মাথায় তিনটি মুখ, সেই মুখ দিয়া বিষ ঝরিয়া পড়িতেছে, নাকে চোখে আগুনের মতো ধোঁয়া—তাহার মূর্তি দেখিয়া ভয়ে রাজার প্রাণ উড়িবার উপক্রম হইল। তিনি একটা জালার মধ্যে ঢুকিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন, ''ওটাকে শীঘ্র সরাইয়া লও।'' হারকিউলিস তখন আবার যেখানকার কুকুর সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

এতদিনে হারকিউলিস তাঁহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলেন। তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত ত্রিভুবন ঘুরিয়া আরো অদ্ভুত কাজ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কত বড়-বড় যুদ্ধে সাহায্য করিয়া, কত বীরত্বের কীর্তিতে যোগ দিয়া তিনি আপনার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। পাহাড় উপড়াইয়া জিব্রাল্টার প্রণালীর পথ খুলিয়া তিনি সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া দিলেন। সুন্দরী আলসেষ্টিস্‌ নিজের প্রাণ দিয়া স্বামীকে অমর করিতে চাহিয়াছিল, হারকিউলিস যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই আলসেষ্টিস্‌কে মৃত্যুর গ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিলেন।

এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ইনিয়ুসের সুন্দরী কন্যা ডেয়ানিরাকে দেখিয়া হারকিউলিস তাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু কোথা হইতে এক জলদেবতা আসিয়া তাহাতে গোল বাধাইয়া বসিল। সে বলিল, "ইনিয়ুস আমাকে কন্যা দান করিবেন বলিয়াছেন, তুমি কোথাকার কে যে মাঝ হইতে দাবী বসাইতে আসিয়াছ?" তখন ডেয়ানিরার অনুমতি লইয়া হারকিউলিস জলদেবতার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। সে এক অদ্ভুত দেবতা, আপন ইচ্ছামত চেহারা বদলায়। প্রথমেই হারকিউ-

লিসের কাছে খুব খানিক চড়-চাপড় খাইয়া, সে ষাঁড়ের মূর্তি ধরিয়া তাঁহাকে গুঁতাইতে আসিল। হারকিউলিস তখন তাহার শিঙ ভাঙ্গিয়া দিতেই, সে পলাইয়া আবার আর এক মূর্তিতে ফিরিয়া আসিল। এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর হারকিউলিস তাহাকে এমন কাবু করিয়া ফেলিলেন যে, প্রাণের দায়ে সে দেশ ছাড়িয়া চম্পট দিল।

তারপর হারকিউলিস ডেয়ানিরাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। কত রাজ্য কত দেশ ঘুরিয়া, একদিন তাঁহারা এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতে ভয়ানক স্রোত দেখিয়া হারকিউলিস ডেয়ানিরাকে পার করিবার উপায় ভাবিতেছেন; এমন সময়ে নেসাস নামে এক বুড়ো সেণ্টর (মানুষ ঘোড়া) আসিয়া বলিল, "আমি এই মেয়েটিকে পিঠে করিয়া পার করিয়া দিব।" ডেয়ানিরা সেণ্টরের পিঠে চড়িয়া নদী পার হইলেন, হারকিউলিসও এক হাতে তাঁহার তীর ধনুক জল হইতে উঠাইয়া, আর এক হাতে ঢেউ ঠেলিয়া পার হইতে লাগিলেন। নদীর ওপারে গিয়া হতভাগা নেসাস ভাবিল, 'আহা! এমন সুন্দরী মেয়ে কেন এই মানুষটার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহার চাইতে ইহাকে লইয়া আমাদের দেশে পলাইয়া যাই না?' এই ভাবিয়া সে ডেয়ানিরাকে লইয়া এক ছুট্ দিল। ডেয়ানিরার চিৎকারে হারকিউলিস মাথা তুলিয়া চাহিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জলের ভিতর হইতেই তীর ছুঁড়িয়া নেসাসের মর্মভেদ করিয়া ফেলিলেন। মরিবার সময় দুষ্ট সেণ্টর অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো অনেক অনুতাপ করিয়া ডেয়ানিরাকে বলিয়া গেল, "আমার ঘাড়ের উপর হইতে এই জামাটি খুলিয়া তুমি রাখিয়া দাও। যদি তোমার স্বামীর ভালোবাসা কোনদিন কমিতে দেখ, তবে এই জামা তাহাকে পরাইলেই তাহার সমস্ত ভালোবাসা ফিরিয়া আসিবে।" ডেয়ানিরা তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া জামাটি পরম যত্নে লুকাইয়া রাখিলেন। ততক্ষণে হারকিউলিসও নদী পার হইয়া আসিয়াছেন, দুইজনে আবার চলিতে লাগিলেন।

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন কি একটা কাজের জন্য দূর দেশের এক রাজসভায় হারকিউলিসের যাওয়া দরকার হইল। তিনি ডেয়ানিরাকে রাখিয়া সেই যে বাহির হইলেন, তাহার পর কতদিন গেল, কত মাস গেল, হারকিউলিস আর ফিরেন না। ডেয়ানিরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, 'তবে কি হারকিউলিস আমায় ভুলিয়া গেলেন? আর কি তিনি আমায় ভালোবাসেন না?' তিনি দূত পাঠাইলেন, তাহারা আসিয়া বলিল, "হারকিউলিস বেশ ভালোই আছেন—রাজসভায় নানা আমোদ-প্রমোদে তাঁহার দিন কাটিতেছে।" শুনিয়া ডেয়ানিরা সেই সেণ্টরের দেওয়া জামাটি বাহির করিলেন। সোনার মতো ঝক্‌ঝকে জামা, সেণ্টরের মৃত্যু-সময়ে রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। সেই জামা তিনি লাইকাস নামে এক দূতকে দিয়া হারকিউলিসের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—ভাবিলেন, তাহা হইলে হারকিউলিসকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। জামার কাহিনী তো হারকিউলিস জানেন না, সেণ্টরের রক্তে যে তাহা বিষাক্ত হইয়া আছে, এরূপ সন্দেহও তাঁহার মনে জাগিল না, তিনি নিশ্চিন্ত মনে সেই জামা পরিলেন। জামা পরিবামাত্র তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, তাঁহার শিরায় শিরায় যেন আগুনের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি জামা ছাড়াইতে গিয়া দেখেন যে সর্বনাশ, জামা তাঁহার শরীরের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, গায়ের চামড়া উঠিয়া আসে, তবু জামা ছাড়িতে চায়

না। রাগে ও যন্ত্রণায় পাগল হইয়া তিনি দূতকে ধরিয়া সমুদ্রে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেণ্টরের বিষ এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়া তিনি তাঁহার অনুচরদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র কাঠ আন, আগুন জ্বাল, আমি এখন মরিতে ইচ্ছা করি।" শুনিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল, কেহ চিতা জ্বালাইতে প্রস্তুত হইল না। তখন তিনি আপন হাতে গাছ উপ্‌ড়াইয়া প্রকাণ্ড চিতা বানাইয়া তাহাতে শুইলেন এবং তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "তুমি যদি আমার বন্ধু হও, তবে আমার কথা শুনিয়া এই চিতায় আগুন দাও। বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ আমার বিষ-মাখানো অব্যর্থ তীরগুলি তোমায় দিলাম।"

তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হইল, দেবতারা জয়গান করিয়া তাঁহাকে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে ডাকিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে অমর করিয়া আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

সন্দেশ—১৩২৪

অর্ফিয়ুস

নয়টি বোন ছিলেন, তাঁহারা ছন্দের দেবী। গানের ছন্দ, কবিতার ছন্দ, নৃত্যের ছন্দ, সংগীতের ছন্দ—সকলরকম ছন্দকলায় তাঁহাদের সমান আর কেহই ছিল না। তাঁহাদেরই একজন, দেবরাজ জুপিটারের পুত্র আপোলোকে বিবাহ করেন।

আপোলো ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা, শিল্প ও সংগীতের দেবতা। তিনি যখন বীণা বাজাইয়া গান করিতেন তখন দেবতারা পর্যন্ত অবাক হইয়া শুনিতেন।

এমন বাপ-মায়ের ছেলে অর্ফিয়ুস যে গান-বাজনায় অসাধারণ ওস্তাদ হইবেন, সে আর আশ্চর্য কি? অর্ফিয়ুসের গুণের কথা দেশ-বিদেশে রটিয়া গেল—স্বয়ং আপোলো খুশি হইয়া তাঁহাকে নিজের বীণাটি দিয়া ফেলিলেন। পাহাড়ে পর্বতে বনে-জঙ্গলে অর্ফিয়ুস বীণা বাজাইয়া ফিরিতেন আর সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিত। অর্ফিয়ুসের বীণার সুরে আকাশ যখন ভরিয়া উঠিত, তখন সুরের আনন্দে গাছে গাছে ফুল ফুটিত, সমুদ্রের কোলাহল থামিয়া যাইত, বনের পশু হিংসা ভুলিয়া অবাক হইয়া পড়িয়া থাকিত।

এইরকমে দেশে দেশে বীণা বাজাইয়া অর্ফিয়ুস ফিরিতেছেন। এমন সময় একদিন ইউরিডিস নামে এক আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে তাঁহার বীণার সুরে মোহিত হইয়া দেখিতে আসিলেন, কে এমন সুন্দর বাজায়। ইউরিডিসকে দেখিবামাত্র অর্ফিয়ুসের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাঁহার আনন্দ বীণার ঝংকারে ঝংকারে আকাশকে মাতাইয়া তুলিল। তন্ময় হইয়া সেই সংগীত শুনিতে শুনিতে ইউরিডিসের মন একেবারে গলিয়া গেল। তারপর ইউরিডিসের সঙ্গে অর্ফিয়ুসের বিবাহ হইল; মনের আনন্দে দুইজনে দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতে চলিলেন।

কিন্তু এ আনন্দ তাঁহাদের বেশিদিন থাকিল না। একদিন মাঠের মধ্যে এক বিষাক্ত সাপ ইউরিডিসকে কামড়াইয়া দিল এবং সেই বিষেই ইউরিডিসের মৃত্যু হইল। অর্ফিয়ুস তখন শোকে পাগলের মতো হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বীণার তারে হাহাকার করিয়া করুণ সংগীত বাজিয়া উঠিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে অর্ফিয়ুস একেবারে অলিম্পাস পর্বতের উপর আসিয়া পড়িলেন। সেখানে দেবরাজ বজ্রধারী জুপিটার তাঁহার দুঃখের গানে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যাও, পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়া যমরাজ প্লুটোর নিকট তোমার স্ত্রীর জন্য নূতন জীবন ভিক্ষা করিয়া আন। কিন্তু জানিও, এ বড় দুঃসাধ্য কাজ; প্রাণের মায়া যদি থাকে, তবে এমন কাজে যাইবার আগে চিন্তা করিয়া দেখ।"

অর্ফিয়ুস নির্ভয়ে বীণা বাজাইতে বাজাইতে পাতালের দিকে চলিলেন। পাতালপুরীর সিংহদ্বারে যমরাজের ত্রিমুণ্ড কুকুর দিনরাত পাহারা দেয়। অর্ফিয়ুসকে আসিতে দেখিয়া রাগে তাহার ছয় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—তাহার মুখ দিয়া বিষাক্ত আগুন ফেনাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অর্ফিয়ুসের বীণার সুর যেমন তাহার কানে আসিয়া লাগিল, অমনি সে শান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। অর্ফিয়ুস অবাধে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

তখন পাতালপুরী কম্পিত করিয়া বীণার ঝংকার বাজিয়া উঠিল। নরকের অন্ধকার ভেদ করিয়া সে সংগীত পাতালের অতল গুহায় প্রবেশ করিল। সেই শব্দে যমদূতের হুংকার আর পাপীদের চিৎকার মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জলের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া অত্যাচারী ট্যাণ্টেলাস পিপাসায় পাগল—পান করিতে গেলেই জল সরিয়া যায়! বীণার সংগীতে সে তাহার তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। মহাপাপী ইক্সিয়ন নরকের ঘুরন্ত চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এতদিন পরে বিশ্রাম পাইল, ঘুরন্ত চক্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। ধূর্ত নিষ্ঠুর সিসিফাস চিরকাল ধরিয়া পাহাড়ের উপর পাথর গড়াইয়া তুলিতেছে, যতবার তোলে ততবার পাথর গড়াইয়া পড়ে: সেও দারুণ শ্রমের দুঃখ ভুলিয়া সেই সংগীত শুনিতে লাগিল।

অর্ফিয়ুস যমরাজের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। যমরাজ প্লুটো ও রানী প্রসেরপিনা গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাদের পায়ের কাছে নিয়তিরা তিন বোনে জীবনের সূতা লইয়া খেলিতেছে। একজন সূতা টানিয়া ছাড়াইতেছে, একজন সেই সূতা পাকাইয়া জড়াইতেছে, আর-একজন কাঁচি দিয়া পাকান সূতা ছাঁটিয়া ফেলিতেছে। অর্ফিয়ুসের সংগীতে যমরাজ সন্তুষ্ট হইলেন, নিয়তিরা প্রসন্ন হইলেন। তখন আদেশ হইল, 'ইউরিডিসকে ফিরাইয়া দাও, সে পৃথিবীতে ফিরিয়া যাক। কিন্তু সাবধান অর্ফিয়ুস! যমপুরীর সীমানা পার হইবার পূর্বে ইউরি-ডিসের দিকে ফিরিয়া চাহিও না—তবে কিন্তু সমস্তই পণ্ড হইবে।'

অর্ফিয়ুস মনের আনন্দে বীণা বাজাইয়া চলিলেন, তাঁহার পিছন পিছন ইউ-রিডিসও চলিলেন। যমপুরীর সীমানায় আসিয়া অর্ফিয়ুস মনের আনন্দে নিষেধের কথা ভুলিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। অমনি তাঁহার চোখের সম্মুখেই ইউরিডিসের অপূর্ব সুন্দর মূর্তি বিদায়ের ম্লান হাসি হাসিয়া শূন্যের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

তারপরে অর্ফিয়ুস আর কি করিবেন? তিনি বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পাগলের মতো সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বনের আড়ালে আড়ালে, পর্বতের গুহায় গুহায় ইউরিডিস লুকাইয়া আছেন। মনে হইল, গাছের পাতায় পাতায়

বাতাসের নিশ্বাস বলিতেছে, 'ইউরিডিস, ইউরিডিস—' পাখিরা শাখায় শাখায় করুণ সুরে গান করিতেছে 'ইউরিডিস, ইউরিডিস!'

এমনিভাবে অস্থির মনে যখন তিনি ঘুরিতেছেন, তখন একদিন মদের দেবতা ব্যাকাসের সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "তুমি ফূর্তি করিয়া বীণা বাজাও, আমরা নাচিব।" কিন্তু অর্ফিয়ুসের মনে সে স্ফূর্তি নাই, তাই বীণার তারেও কেবল দুঃখের সুরই বাজিতে লাগিল। তখন মাতালেরা রাগিয়া বলিল, "মার ইহাকে—এ আমাদের আমোদ মাটি করিতেছে।" তখন সকলে মিলিয়া অর্ফিয়ুসকে মারিয়া তাহার দেহ নদীতে ভাসাইয়া দিল। সেই দেহ ইউরিডিসের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল। শূন্যে অর্ফিয়ুসের আনন্দধ্বনি শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিল আবার তিনি ইউরিডিসকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।

জলে স্থলে নদীর কলস্রোতে ঝরনার ঝর্ঝর শব্দে আনন্দ-কোলাহল বাজিয়া উঠিল।

সন্দেশ—১৩২৫

খৃস্টবাহন

তার নাম অফেরো। অমন পাহাড়ের মতো শরীর, অমন সিংহের মতো বল, অমন আগুনের মতো তেজ, সে ছাড়া আর কারো ছিল না। বুকে তার যেমন সাহস, মুখে তার তেমনি মিষ্টি কথা। কিন্তু যখন তার বয়স অল্প, তখনই সে তার সঙ্গীদের ছেড়ে গেল; যাবার সময় বলে গেল, "যদি রাজার মতো রাজা পাই, তবে তার গোলাম হয়ে থাকব। আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে, তুমি আর কারো চাকরি কোরো না; যে রাজা সবার বড়, সংসারে যার ভয় নেই, তারই তুমি খোঁজ কর।" এই বলে অফেরো কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

পৃথিবীতে কত রাজা, তাদের কতজনের কত ভয়। প্রজার ভয়, শত্রুর ভয়, যুদ্ধের ভয়, বিদ্রোহের ভয়—ভয়ে কেউ আর নিশ্চিন্ত নেই। এরকম হাজার দেশ ছেড়ে ছেড়ে অফেরো এক রাজ্যে এল, সেখানে রাজার ভয়ে সবাই খাড়া! চোরে চুরি করতে সাহস পায় না, কেউ অন্যায় করলে ভয়ে কাঁপে। অস্ত্রশস্ত্রে সৈন্যসামন্তে রাজার প্রতাপ দশদিক দাপিয়ে আছে। সবাই বলে, 'রাজার মতো রাজা।' তাই শুনে অফেরো তার চাকর হয়ে রইল।

তারপর কতদিন গেল—এখন অফেরো না হলে রাজার আর চলে না। রাজা যখন সভায় বসেন অফেরো তাঁর পাশে খাড়া। রাজার মুখের প্রত্যেকটি কথা সে আগ্রহ করে শোনে, আর অবাক হয়ে ভাবে, 'যদি রাজার মতো রাজা কেউ থাকে, তবে সে এই!'

তারপর একদিন রাজার সভায় কথায় কথায় কে যেন শয়তানের নাম করছে।

শুনে রাজা গম্ভীর হয়ে গেলেন। অফেরো চেয়ে দেখলে রাজার চোখে হাসি নেই, মুখখানি তাঁর ভাবনাভরা। অফেরো তখন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে বলল, "মহারাজের ভাবনা কিসের? কি আছে তাঁর ভয়ের কথা?" রাজা হেসে বললেন, "এক আছে শয়তান আর আছে মৃত্যু—এ ছাড়া আর কাকে ডরাই?" অফেরো বলল, "হায় হায়, আমি এ কার চাকরি করতে এলাম? এ যে শয়তানের কাছে খাটো হয়ে গেল। তবে যাই শয়তানের রাজ্যে; দেখি সে কেমন রাজা!" এই বলে সে শয়তানের খোঁজে বেরোল।

পথে কত লোক আসে যায়—শয়তানের খবর জিজ্ঞাসা করলে তারা বুকে হাত দেয় আর দেবতার নাম করে, আর সবাই বলে, "তার কথা বলো না ভাই, সে যে কোথায় আছে, কোথায় নেই কেউ কি তা বলতে পারে?" এমনি করে খুঁজে খুঁজে কতগুলো নিষ্কর্মা কুঁড়ের দলে শয়তানকে পাওয়া গেল। অফেরোকে পেয়ে শয়তানের ফুর্তি দেখে কে! এমন চেলা সে আর কখনো পায় নি।

শয়তান বলল, "এসো এসো, আমি তোমায় তামাশা দেখাই। দেখবে আমার শক্তি কত?" শয়তান তাকে ধনীর প্রাসাদে নিয়ে গেল, সেখানে টাকার নেশায় মত্ত হয়ে লোকে শয়তানের কথায় ওঠে বসে; গরিবের ভাঙা কুঁড়ের ভেতরে গেল, সেখানে এক মুঠো খাবার লোভে পেটের দায়ে বেচারিরা পশুর মতো শয়তানের দাসত্ব করে। লোকেরা সব চলছে-ফিরছে, কে যে কখন ধরা পড়ছে, কেউ হয় তো জানতে পারে না; সবাই মিলে মারছে কাটছে কোলাহল করছে 'শয়তানের জয়'।

সব দেখে-শুনে অফেরোর মনটা যেন দমে গেল। সে ভাবল, 'রাজার সেরা রাজা বটে, কিন্তু আমার তো কই এর কাজেতে মন লাগছে না।' শয়তান তখন মুচকি মুচকি হেসে বলল, "চল তো ভাই, একবারটি এই শহর ছেড়ে পাহাড়ে যাই। সেখানে এক ফকির আছেন, তিনি নাকি বেজায় সাধু। আমার তেজের সামনে তাঁর সাধুতার দৌড় কতখানি তা একবার দেখতে চাই।"

পাহাড়ের নীচে রাস্তার চৌমাথায় যখন তারা এসেছে, শয়তান তখন হঠাৎ কেমন ব্যস্ত হয়ে থমকে গেল—তারপর বাঁকা রাস্তা ঘুরে তড়বড় করে চলতে লাগল। অফেরো বললে, "আরে মশাই, ব্যস্ত হন কেন?" শয়তান বললে, "দেখছ না ওটা কি?" অফেরো দেখল, একটা ক্রুশের মতো কাঠের গায়ে মানুষের মূর্তি আঁকা! মাথায় তার কাঁটার মুকুট শরীরে তার রক্তধারা! সে কিছু বুঝতে পারল না। শয়তান আবার বলল, "দেখছ না ঐ মানুষকে—ও যে আমায় মানে না, মরতে ডরায় না—বাবারে! ওর কাছে কি ঘেঁষতে আছে? ওকে দেখলেই তফাৎ হটি।" বলতে বলতে শয়তানের মুখখানা চামড়ার মতো শুকিয়ে এল।

তখন অফেরো হাঁফ ছেড়ে বললে, "বাঁচালে ভাই! তোমার চাকরি আর আমায় করতে হল না। তোমায় মানে না, মরতেও ডরায় না, সেই জনকে যদি পাই তবে তারই গোলাম হয়ে থাকি।" এই বলে আবার সে খোঁজে বেরোল।

তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, "সেই ক্রুশের মানুষকে কোথায় পাব?"—সবাই বলে, খুঁজতে থাক, একদিন তবে পাবেই পাবে। তারপর একদিন চলতে চলতে সে এক যাত্রীদলের দেখা পেল। গায়ে তাদের পথের ধুলো, হাঁটতে হাঁটতে সবাই শ্রান্ত, কিন্তু তবু তাদের দুঃখ নেই—হাসতে হাসতে গান গেয়ে সবাই মিলে পথ চলছে। তাদের দেখে অফেরোর বড় ভালো লাগল—সে বলল,

"তোমরা কে ভাই? কোথায় যাচ্ছ?" তারা বলল, "ক্রুশের মানুষ যীশুখৃস্ট—আমরা সবাই তাঁরই দাস। যে পথে তিনি গেছেন, সেই পথের খোঁজ নিয়েছি।" শুনে অফেরো তাদের সঙ্গ নিল।

সে পথ গেছে অনেক দূর। কত রাত গেল দিন গেল, পথ তবু ফুরোয় না—চলতে চলতে সবাই ভাবছে, বুঝি পথের শেষ নাই। এমন সময় সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় পথের শেষ দেখা দিল। ওপারে স্বর্গ, এপারে পথ, মাঝে অন্ধকার নদী। নৌকা নাই কূল নাই, মাঝে মাঝে ডাক আসে, 'পার হয়ে এসো।' অফেরো ভাবল, 'কি করে এরা সব পার হবে? কত অন্ধ, খঞ্জ, কত অক্ষম বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু—এরা সব পার হবে কি করে?' যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা বললেন, "দূত আসবে। ডাক পড়বার সময় হলে, তখন তাঁর দূত আসবে।"

বলতে বলতে দূত এসে ডাক দিল। একটি ছোট মেয়ে ভুগে ভুগে রোগা হয়ে গেছে, সে নড়তে পারে না, চাইতে পারে না, দূত তাকে বলে গেল, "তুমি এসো. তোমার ডাক পড়েছে।" শুনে তার মুখ ফুটে হাসি বেরোল, সে উৎসাহে চোখ মেলে উঠে বসল। কিন্তু হায়! অন্ধকার নদী, অকূল তার কালো জল, স্রোতের টানে ফেনিয়ে উঠছে—সে নদী পার হবে কেমন করে? জলের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভিতর দুরু দুরু করে উঠল। ভয়ে দুচোখ ঢেকে নদীর তীরে একলা দাঁড়িয়ে মেয়েটি তখন কাঁদতে লাগল। তাই দেখে সকলের চোখে জল এল, কিন্তু যেতেই যখন হবে তখন আর উপায় কি? মেয়েটির দুঃখে অফেরোর মন একেবারে গলে গেল। সে হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, "ভয় নাই—আমি আছি।" কোথা হতে তার মনে ভরসা এল, শরীরে তার দশগুণ শক্তি এল—সে মেয়েটিকে মাথায় করে, স্রোত ঠেলে, আঁধার ঠেলে, বরফের মতো ঠান্ডা নদী মনের আনন্দে পার হয়ে গেল। মেয়েটিকে ওপারে নামিয়ে সে বলল, "যদি সেই ক্রুশের মানুষের দেখা পাও, তাঁকে বলো, এ কাজ আমার বড় ভালো লেগেছে—যতদিন আমার ডাক না পড়ে, আমি তাঁর গোলাম হয়ে এই কাজেই লেগে থাকব।"

সেই থেকে তার কাজ হল নদী পারাপার করা। সে বড় কঠিন কাজ! কত ঝড়ের দিনে কত আঁধার রাতে যাত্রীরা সব পার হয়—সে অবিশ্রাম কেবলই তাদের পৌঁছে দেয় আর ফিরে আসে। তার নিজের ডাক যে কবে আসবে, তা ভাববার আর সময় নেই।

একদিন গভীর রাত্রে তুফান উঠল। আকাশ ভেঙে পৃথিবী ধুয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে এল। ঝড়ের মুখে স্রোতের বেগে পথ-ঘাট সব ভাসিয়ে দিল—হাওয়ার পাকে পাগল হয়ে নদীর জল খেপে উঠল। অফেরো সেদিন শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—সে ভেবেছে, এমন রাতে কেউ কি আর পার হতে চায়? এমন সময় ডাক শোনা গেল। অতি মিষ্টি কচি গলায় কে যেন বলছে, "আমি এখন পার হব।" অফেরো তাড়াতাড়ি উঠে দেখল, ছোট্ট একটি শিশু ঝড়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, আর বলছে, "আমার ডাক এসেছে, আমি এখন পার হব।" অফেরো বললে, "আচ্ছা! এমন দিনে তোমায় পার হতে হবে! ভাগ্যিস আমি শুনতে পেয়েছিলাম।" তারপর ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলতে বলতে সে দুরন্ত নদী পার হয়ে গেল।

কিন্তু এবারেই শেষ পার। ওপারে যেমনি যাওয়া অমনি তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে পড়ল, চোখ যেন ঝাপসা হয়ে গেল গলার স্বর জড়িয়ে এল। তারপর

যখন সে তাকাল তখন দেখল, ঝড় নেই আঁধার নেই, সেই ছোট শিশুটিও নেই—আছেন শুধু এক মহাপুরুষ, মাথায় তাঁর আলোর মুকুট। তিনি বললেন, "আমি ক্রুশের মানুষ—আমিই আজ তোমায় ডাক দিয়েছি। এতদিন এত লোক পার করেছ, আজ আমায় পার করতে গিয়ে নিজেও পার হলে, আর তার সঙ্গে শয়তানের পাপের বোঝা কত যে পার করেছ তা তুমিও জান না। আজ হতে তোমার অফেরো নাম ঘুচল; এখন তুমি সেণ্ট ক্রিস্টোপার—সাধু খৃস্ট বাহন! যাও, স্বর্গের যারা শ্রেষ্ঠ সাধু তাঁদের মনে তুমি আনন্দে বাস কর।"

সন্দেশ ১৩২৩

নাপিত পণ্ডিত

বাগদাদ শহরে এক ধনীর ছেলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল সে কাজির মেয়েকে বিবাহ করিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ কাজটা তত সহজ নয়। সুতরাং কিছু-দিন চেষ্টা করিয়াই সে বেচারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। দিনে আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই—তার কেবলই ঐ এক চিন্তা। কি করিলে কাজির মেয়েকে বিবাহ করা যায়।

বিবাহের সব চাইতে বড় বাধা কাজিসাহেব স্বয়ং। সকলেই বলে, "বাপ্ রে! কাজিসাহেব এ স্পর্ধার কথা জানতে পারলে তোমার একটি হাড় আস্ত রাখবেন না।" বেচারা কি করে? ক্রমাগত ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে রীতিমত জ্বর আনিয়া ফেলিল বন্ধু-বান্ধব বলিতে লাগিল, "ছোকরা বাঁচলে হয়।" ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন এক বুড়ি আসিয়া খবর দিল, বিবাহের সমস্তই ঠিক। কাজিসাহেবকে না জানাইয়াই এখন চুপচাপ বিবাহটা হইয়া যাক—তারপর সুবিধামত তাঁহাকে খবর দেওয়া যাইবে; তখন তিনি গোল করিয়া করিবেন কি? সে আরো বলিল, "শুক্রবার সন্ধ্যার সময় কাজিসাহেব বাড়ি থাকবেন না—সেই সময় বিয়েটা সেরে ফেল কিন্তু খবরদার! কাজিসাহেব যেন এ-সব কথার বিন্দুমাত্র জানতে না পারেন।"

শুক্রবার দিন ভোর না হইতে বর বেচারা হাত-মুখ ধুইয়া প্রস্তুত, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার আর সবুর সয় না। দুপুরে না হইতেই সে চাকরকে বলিল, "একটা নাপিত ডেকে আন্। এখন থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকি।" চাকর তাড়াতাড়ি কোথা হইতে এক নাপিত আনিয়া হাজির করিল।

নাপিত আসিয়াই বরকে বলিল, "আপনাকে বড় কাহিল দেখছি। যদি অনুমতি করেন তো ছুরি দিয়ে বাঁ হাতের একটুখানি রক্ত ছাড়িয়ে দেই—তা হলেই সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ করবেন।" বর বলিল, "না হে, তোমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকি নাই—আমার দাড়িটা একটু চট্‌পট্ কামিয়ে দাও দেখি।" নাপিত তখন তাহার সরঞ্জামের থলি খুলিয়া অনেকগুলি ক্ষুর বাহির করিল, তারপর প্রত্যেকটা ক্ষুর হাতে লইয়া বার বার করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট

করিয়া সে একটা বাটির মতো কি একটা বাহির করিল। বর ভাবিল, এইবার বাটিতে জল দিয়া কামানো শুরু করিবে। কিন্তু নাপিত তাহার কিছুই করিল না; সে অদ্ভুত একটা কাঁটাকম্পাসের মানযন্ত্র লইয়া ঘরের বাহিরে উঠানের মাঝখানে গিয়া, সূর্যের গতিবিধির কি-সব হিসাব করিতে লাগিল। তাহার পর আবার গম্ভীরভাবে ঘরে আসিয়া বলিল, "মহাশয়, হিসাব করে দেখলাম, এই বৎসর এই মাসে এই শুক্রবারের ঠিক এই সময়টি অতি চমৎকার শুভক্ষণ—দাড়ি কামাবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আজ মঙ্গল-বুধ গ্রহসংযোগ হওয়াতে আপনার কিছু বিপদের সম্ভাবনা দেখছি।"

কাজের সময় এরকম বকবক করিলে কাহার না রাগ হয়? বিবাহার্থী ছোকরাটি রাগিয়া বলিল, "বাপু হে, তোমাকে কি বক্তৃতা শোনাবার জন্য অথবা জ্যোতিষ গণনার জন্য ডাকা হয়েছে? কামাতে এসেছ, কামিয়ে যাও।" কিন্তু নাপিত ছাড়িবার পাত্রই নয়, সে অভিমান করিয়া বলিল, "মশাই, এরকম অন্যায় রাগ আপনার শোভা পায় না। আপনি জানেন আমি কে? আপনি কি জানেন যে বাগদাদ শহরে আমার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নাই? আমার গুণের কথা শুনবেন? আমি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক, রসায়ন শাস্ত্রে আমার অসাধারণ দখল, আমার জ্যোতিষ গণনা একেবারে নির্ভুল, নীতিশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র এ-সমস্তই আমার কণ্ঠস্থ, জ্যামিতি থেকে শুরু ক'রে বীজগণিত পাটিগণিত পর্যন্ত গণিতশাস্ত্রের কোন তত্ত্বই জানতে বাকি রাখি নি। তার উপর আবার আমি একজন পাকা দার্শনিক পণ্ডিত, আর আমি যে-সকল কবিতা রচনা করি, সমঝদার লোকের মুখে তার সুখ্যাতি আর ধরে না।"—নাপিতের এই বক্তৃতার দৌড় দেখিয়া ছোকরাটি ভীষণ রাগের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল, "তোমার বক্তৃতা শুনবার ফুরসৎ আমার নাই—তুমি কামানো শেষ করবে কিনা বল, না কর চলে যাও।" নাপিত বলিল, "এই কি আপনার উপযুক্ত কথা হল? আমি কি আপনাকে ডাকতে এসেছিলাম, না আপনি নিজেই লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়েছিলেন? এখন আমি আপনাকে না কামিয়ে গেলে, আমার মান-সম্ভ্রম থাকে কি ক'রে? আপনি সেদিনকার ছেলে, আপনি এ-সবের কদর বুঝবেন কি? আপনার বাবা যদি আজ থাকতেন, তবে আমাকে ধন্য ধন্য বলতেন—কারণ তাঁর কাছে কোন-দিনই আমার সম্মানের ত্রুটি হয় নি। আমার এ-সকল অমূল্য উপদেশ শুনবার সৌভাগ্য সকলে পায় না—তিনি তা বেশ বুঝতেন। আহা, তিনি কি চমৎকার লোকই ছিলেন! আমার কথাগুলি কত আগ্রহ করে তিনি শুনতেন! আর কত খাতির, কত তোয়াজ করে কত অজস্র বকশিশ দিয়ে তিনি আমায় খুশি রাখতেন। আপনি তো সে-সব খবর রাখেন না।" এইরকম বক্তৃতায় সে আধ ঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিল। এদিকে বেলাও বাড়িতেছে, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; কাজেই বর একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিল, "যাও! যাও! তোমার কামাতে হবে না।"

নাপিত অগত্যা তখন তাড়াতাড়ি ক্ষুর লইয়া কামাইতে শুরু করিল। কিন্তু ক্ষুরের দুই চার টান দিয়াই সে আবার থামিয়া বলিল, "মশাই! ওরকম রাগ করা ভালো নয়। ভেবে দেখুন, জ্ঞানে গুণে বয়সে সব বিষয়েই আপনি ছেলেমানুষ। তবে অবিশ্যি, আপনার যেরকম তাড়া দেখছি, তাতে বোধ হয় আপনি আজকে একটু বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এরকম ব্যস্ততার কারণটা কি জানতে পারলে, আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ঠিক ভালোমত ব্যবস্থা করতে পারি।" এই বলিয়াই সে আবার তাহার মানযন্ত্র লইয়া হিসাব করিতে লাগিল। যতই তাড়া দেওয়া যায়, ততই সে বলে, "এই,

হিসাবটা হল বলে।" তখন বেগতিক দেখিয়া বর বলিল, "আরে, ব্যাপারটা কিছু নয়—আজ রাত্রে আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে—তাই, বড় তাড়াতাড়ি।"

এই কথা শুনিবামাত্র নাপিত একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল, "ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলেন! আমার বাড়িতেও যে আজ ছয়জন লোককে নেমন্তন্ন করে এসেছি! তাদের জন্য তো কোনরকম বন্দোবস্ত করে আসি নি। এখন, মনে করুন, মাংস কিনতে হবে, রাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে, মিঠাই আনতে হবে; কখন-বা এ-সব করি, আর কখনই-বা আপনাকে কামাই।" বর দেখিল আবার বেগতিক, সে নিরুপায় হইয়া বলিল, "দোহাই তোমার। আর আমায় ঘাঁটিও না—আমার চাকরকে বলে দিচ্ছি--তোমার যা কিছু চাই, আমার ভাঁড়ার থেকে সমস্তই সে বা'র করে দেবে—তার জন্য তুমি মিথ্যে ভেব না।" নাপিত বলিল, "এ অতি চমৎকার কথা। দেখুন, হমামের মালিশওয়ালা জান্তোৎ—আর ঐ যে কড়াইশুঁটি বিক্রি করে, সালি—আর ঐ শিম বেচে, সালোৎ—আর আখের শা তরকারিওয়ালা আর আবু মেকারেজ ভিস্তি আর পাহারাদার কাশেম—এরা সবাই ঠিক আমার মতো আমুদে– এরা কখনো মুখ হাঁড়ি করে থাকে না; তাই এদের আমি নেমন্তন্ন করেছি। আর এদের একটা বিশেষ গুণ যে, এরা ঠিক আমারই মতো চুপচাপ থাকে—বেশি বকবক করতে ভালোবাসে না। এক-একজন লোক থাকে তারা সব সময়েই বকর বকর করছে—আমি তাদের দুচক্ষে দেখতে পারি নে। এরা কেউ সেরকম নয়; তবে নাচতে আর গাইতে এরা সবাই ওস্তাদ। জান্তোৎ কিরকম করে নাচে দেখবেন? ঠিক এইরকম"—এই বলিয়া সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য ও বিকট সুরে গান করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নয়, ঐ ছয়জন বন্ধুর মধ্যে প্রত্যেকে কিরকম করিয়া নাচে ও গায়, তাহার নকল দেখাইয়া তবে সে ছাড়িল। তারপর হঠাৎ সে ক্ষুরটুর ফেলিয়া ভাঁড়ার ঘরে চাকরের কাছে তাহার নিমন্ত্রণের ফর্দ দিতে ছুটিল। বর ততক্ষণে আধ কামানো অবস্থায় ক্ষেপিয়া পাগলের মতো হইয়াছে, কিন্তু নাপিত তাহার কথায় কানও দেয় না। সে গম্ভীরভাবে ঘরের হাঁস মুরগি তরি-তরকারি হালুয়া মিঠাই সব বাছিয়া বাছিয়া পছন্দ করিতে লাগিল। তারপর আরো অনেক গল্প আর অনেক উপদেশ শুনাইয়া অতি ধীর মেজাজে সাড়ে চার ঘণ্টায় সে তাহার কামানো শেষ করিল। আবার যাইবার সময় বলিয়া গেল, "দেখুন, আমার মতো এমন বিজ্ঞ, এমন শান্ত, এমন অল্প-ভাষী হিতৈষী বন্ধু আপনি পেয়েছেন, সেটা কেবল আপনার বাবার পুণ্যে। আজ হতে আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম।"

নাপিতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া বর দেখিল, আর সময় নাই। সে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতে বাহির হইল। লোকজন সঙ্গে লইল না, এবং কাহাকেও খবর দিল না; পাছে কথাটা কোন গতিকে কাজিসাহেবের কাছে ফাঁস হইয়া যায়।

এদিকে নাপিতও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকে নাই। সে কেবল ভাবিতেছে, 'না-জানি সে কিরকম নেমন্তন্ন, যার জন্য সে এমন ব্যস্ত, যে আমার ভালো ভালো কথাগুলো পর্যন্ত শুনতে চায় না। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।' সুতরাং বর যখন সন্ধ্যার সময় বাহির হইল, নাপিতও তাহার পিছন পিছন লুকাইয়া চলিল।

বর সাবধানে কাজির বাড়ি হাজির হইয়া খবর লইল যে কাজিসাহেব বাড়িতে নাই; এদিকে সব আয়োজন প্রস্তুত—তাড়াতাড়ি বিবাহ সারিতে হইবে। দৈবাৎ যদি কাজিসাহেব আসিয়া পড়েন, তাহার জন্য ছাতের উপর পাহারা বসান হইল, তাঁহাকে

আসিতে দেখিলেই সে চিৎকার করিয়া সংকেত করিবে এবং বরকে খিড়কি দরজা দিয়া পলাইতে হইবে। এদিকে কিন্তু হতভাগা নাপিতটা বাড়ির বাহিরে থাকিয়া যে আসে তাহাকেই বলে, "তোমরা সাবধানে থেকো—আমাদের মনিবটি কেন জানি এই কাজির বাড়িতে ঢুকেছেন—তাঁর জন্য আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।"

বিবাহ আরম্ভ না হইতেই মুখে মুখে এই খবর রটিয়া বাড়ির চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল—তাহা দেখিয়া ছাতের উপরে সেই পাহারাদার ব্যস্তভাবে ডাক দিয়া উঠিল। আর কোথায় যায়! তাহার গলার আওয়াজ পাওয়ামাত্র "কে আছিস রে, আমার মনিবকে মেরে ফেললে রে" বলিয়া নাপিত "হায় হায়" শব্দে আপনার চুল দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার বিকট আর্তনাদে চারিদিকে এমন হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, স্বয়ং কাজিসাহেব পর্যন্ত গোলমাল শুনিয়া বাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই বলে ব্যাপার কি? নাপিত বলিল, "আর ব্যাপার কি! এই লক্ষ্মীছাড়া কাজি নিশ্চয় আমার মনিবকে মেরে ফেলেছে।" তখন মার মার করিয়া সকলে কাজির বাড়িতে ঢুকিল। বর বেচারা পলাইবার পথ না পাইয়া, ভয়ে ও লজ্জায় একটা সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া ছিল, নাপিত সেই হাজার লোকের মাঝখানে সিন্দুকের ভিতর হইতে "এই যে আমাদের মনিব" বলিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। সে বেচারা এই অপমানে লজ্জিত হইয়া যতই সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে যায়, নাপিত ততই তাহার পিছন পিছন ছুটিতে থাকে আর বলে, "আরে মশাই, পালান কেন? কাজিসাহেবকে ভয় কিসের? আরে মশাই, থামুন না।" ব্যাপার দেখিয়া চারিদিকে লোকজন হাসাহাসি ঠাট্টা তামাশা করিতে লাগিল। কাজির মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়া, বিবাহ তো হইলই না, মাঝে হইতে প্রাণপণে দৌড়াইতে গিয়া, হোঁচট খাইয়া বরের একটা ঠ্যাং খোঁড়া হইয়া গেল। এখানেও তাহার দুর্দশার শেষ নয়। নাপিতটা শহরের হাটে বাজারে সর্বত্র বাহাদুরি করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখেছ? ওকে কিরকম বাঁচিয়ে দিলাম। সেদিন আমি না থাকলে কি কাণ্ডই না হ'ত। কাজি-সাহেব যেরকম খ্যাপা মেজাজের লোক, কখন কি ক'রে বসত কে জানে। যা হোক খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি।" যে আসে তাহার কাছেই সে এই গল্প জুড়িয়া দেয়।

ক্রমে ছোকরাটির অবস্থা এমন হইল যে, সে কাহাকেও আর মুখ দেখাইতে পারে না—যাহার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে, "ভাই, কাজির বাড়িতে তোমার কি হয়েছিল? শুনলাম ঐ নাপিত না থাকলে তুমি নাকি ভারি বিপদে পড়তে?" শেষটায় একদিন অন্ধকার রাত্রে বেচারা বাড়িঘর ছাড়িয়া বাগদাদ শহর হইতে পলাইল, এবং যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, "এমন দূর দেশে পলাইব, যেখানে ঐ হতভাগা নাপিতের মুখ দেখিবার আর কোন সম্ভাবনা না থাকে।"

সন্দেশ—১৩২৪

বুদ্ধিমানের সাজা

আলি শাকালের মতো ওস্তাদ আর ধূর্ত নাপিত সে সময়ে মেলাই ভার ছিল। বাগদাদের যত বড়লোক তাকে দিয়ে খেউরি করাতেন, গরিবকে সে গ্রাহ্যই করত না।

একদিন এক গরিব কাঠুরে ঐ নাপিতের কাছে গাধা বোঝাই করে কাঠ বিক্রী করতে এল। আলি শাকাল কাঠুরেকে বলল, "তোমার গাধার পিঠে যত কাঠ আছে সব আমাকে দাও; তোমাকে এক টাকা দেব।" কাঠুরে তাতেই রাজি হয়ে গাধার পিঠের কাঠ নামিয়ে দিল। তখন নাপিত বলল, "সব কাঠ তো দাও নি; গাধার পিঠের 'গদি'টা কাঠের তৈরি; ওটাও দিতে হবে।" কাঠুরে তো কিছুতেই রাজি হলো না; কিন্তু নাপিত তার আপত্তি গ্রাহ্য না করে গদিটা জবরদস্তি করে কেড়ে নিয়ে, কাঠুরেকে এক টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল।

কাঠুরে বেচারা আর কি করে? সে গিয়ে খালিফের কাছে তার নালিশ জানাল। খালিফ বললেন, "তুমি তো 'গাধার পিঠের সমস্ত কাঠ' দিতে রাজি ছিলে; তবে আর এখন আপত্তি করছ কেন? কথামতই তো কাজ হয়েছে।" তারপর কাঠুরের কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি জানি বললেন; কাঠুরে মুচকি হেসে, "যো হুকুম" বলে সেলাম ঠুকে চলে গেল।

কিছুদিন বাদে কাঠুরে আবার নাপিতের কাছে এসে বলল, "নাপিতসাহেব, আমি আর আমার সঙ্গীকে খেউরি করার জন্য দশ টাকা দেব, তোমার মতো ওস্তাদের হাতে অনেক বেশি টাকা দিয়ে খেউরি হতে পারলে জন্ম সার্থক হয়। তুমি কি রাজি আছ?" নাপিত তো খোসামোদে ভুলে, কাঠুরেকে চটপট কামিয়ে দিল; তারপর তাকে বলল, "কই হে তোমার সঙ্গী?" কাঠুরে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তার গাধাটি এনে হাজির করল। নাপিত তো বেজায় চটে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ঘুঁষি বাগিয়ে বলল, "এত বড় বেআদবি আমার সঙ্গে! সুলতান, খালিফ, আগা, বেগ যার হাতে খেউরি হবার জন্য সর্বদাই খোসামোদ করে, সে কিনা গাধাকে কামাবে! বেরোও এখনি এখান থেকে!"

কাঠুরে নাপিতের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সটান গিয়ে খালিফের কাছে হাজির। খালিফ তার নালিশ শুনে আলি শাকালকে ডেকে পাঠালেন। নাপিত এসেই হাত জোড় করে বলল, "দোহাই ধর্মাবতার! গাধাকে কি কখনো মানুষের সঙ্গী ব'লে ধরা যেতে পারে?" খালিফ বললেন, "তা না হতেও পারে, কিন্তু গাধার পিঠের গদিও কি কখনো কাঠের বোঝার মধ্যে ধরা যেতে পারে? তুমি এ কথার জবাব দাও।" নাপিত তো একেবারে চুপ! কিছুক্ষণ বাদে খালিফ বললেন, "আর দেরি কেন? গাধাকে কামিয়ে ফেল, কথামত কাজ না করতে পারলে তার উচিত সাজার ব্যবস্থা হবে জানই তো।"

নাপিত বেচারা আর করে কি? গাধাকে বেশ করে ক্ষুর বুলিয়ে কামাতে লাগল। সেই তামাশা দেখবার জন্য চারিদিকে ভিড় জমে গেল। কামানো শেষ হতেই নাপিত অপমানে মাথা হেঁট ক'রে বাড়ি পালাল। কাঠুরেও নেড়া গাধায় চড়ে নাচতে নাচতে বাড়ি পালাল।

সন্দেশ—১৩২৪

দুষ্টু দরজি

এক দরজি ছিল, তার মতো ভালো সেলাই আর কেউ জানত না। একদিন তাদের রাজপুত্রের বড় সখের পোশাক ছিঁড়ে গেল, তাই তিনি সেটা দরজির বাড়ি রিফু করতে পাঠিয়ে দিলেন।

দরজি বসে বসে পোশাক সেলাই করছে আর ভাবছে—'আহা, এমন একটি পোশাক যদি আমি পরতে পেতাম, তবে না জানি আমাকে কেমন দেখাত!' ভাবতে ভাবতে তার ভারি লোভ হল—আস্তে আস্তে পোশাকটা তুলে গায়ে দিল। তারপরে আয়নাটি সামনে ধরে বলল—"বাঃ, এ যে ঠিক রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছে! এখন আমাকে দেখে কে দরজির ছেলে বলে বুঝবে?" এই না বলে, বাক্স থেকে তার পুঁজি-পাটা বের করে নিয়ে রাতারাতি চুপচাপ সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সে যেখানে যায় তার সুন্দর চেহারা আর দামি পোশাক দেখে লোকে মনে করে যে নিশ্চয়ই কোনো রাজা-রাজড়ার ছেলে হবে।

চলতে চলতে একদিন তারই বয়সী একটি লোকের সঙ্গে তার আলাপ হল। সে লোকটি বলল, "আমি সুলতানের ছেলে, আমার নাম ওমার। আমার জন্মের সময় গণক বলেছিল যে বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজের রাজ্যে থাকলে আমার ভয়ানক বিপদ হবে। সেইজন্য বাবা আমাকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি। এখন বিশ বছর হয়ে গিয়েছে তাই দেশে ফিরে যাচ্ছি।" দরজি জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা, তুমি তো বড় হয়ে সেখানে কখনো যাও নি; কি করে সব চিনবে?" ওমার বলল, "এই রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলে একটা মসজিদ দেখা যাবে, সেখানে বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। এই যে তলোয়ার দেখছ, এটা মামা দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বাবার এই কথা আছে যে এই তলোয়ার দেখিয়ে আমি বলব 'যার আশায় বসে আছেন, আমিই সেই' আর বাবা উত্তর করবেন, 'আল্লা তোমার মঙ্গল করুন'—তা হলেই চেনা যাবে।" এইরকম গল্প করতে করতে দুজনে একটা সরাইখানায় ঢুকলো। সেখানে খেয়ে দেয়ে দুজনে শুয়ে রইল। দরজিটার কিন্তু সারারাত ঘুম হল না—সে ভোর না হতেই উঠে ওমারের তলোয়ারটি নিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে পালাল।

খানিকদূর গিয়ে দরজি দেখতে পেল যে একটা মস্ত মসজিদের সামনে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে একজন বুড়ো লোক বসে আছেন, তাঁর চেহারা আর পোশাক দেখেই সে বুঝলো, ইনিই নিশ্চয় সুলতান। সে সোজা গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে তলোয়ারটি রেখে, সেলাম করে বলল, "যার আশায় বসে আছেন আমিই সেই"—অমনি সুলতান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আল্লা তোমার মঙ্গল করুন।" সঙ্গের লোকেরা তখন আনন্দে কোলাহল করতে করতে বাড়ি যাবার আয়োজন করতে লাগল।

এমন সময় ওমার হাঁপাতে হাঁপাতে সেইখানে এসে হাজির। সে চিৎকার করে বলল, "ওর কথা শুনো না—ও একটা জোচ্চোর—আমিই আসল সুলতানের ছেলে।" দরজি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আরে, ওটা একটা দরজির ছেলে—পাগল কিনা তাই

অমন যা তা বলে।" সুলতান বললেন—"পাকড়াও দেখি—ওটাকে পাগলা গারদে রেখে দেওয়া যাবে।" বলতেই সুলতানের লোকেরা তাকে ধরে বন্দী করে ফেলল।

সকলে বাড়ি পেঁছাতেই তো সুলতানা ছুটে এলেন, কিন্তু দরজিকে দেখেই তিনি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, "এ তো আমার ছেলে নয়! তার তো এরকম চেহারা ছিল না!" সুলতান বললেন, "আরে! কচিছেলের মুখ কি আর তেমনিই থাকে? বড় হয়ে চেহারা বদলিয়ে গেছে।" সুলতানা বললেন, "না, না, আমি কতবার আমার ছেলের মুখ স্বপ্নে দেখেছি, সে মুখ মোটেই এরকম নয়।" এমন সময় ওমার হঠাৎ প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে এসে একেবারে সুলতানার পায়ে পড়ে বলল, "আমিই আপনার ছেলে, ও লোকটা জোচ্চোর।" তাকে দেখেই সুলতানা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওগো, এই তো আমার ছেলে—একেই আমি স্বপ্নে দেখেছি।" তখন সুলতানের ভারি রাগ হল—তিনি ওমারকে ধরে তখনই পাগলা গারদে রাখতে হুকুম দিলেন।

সুলতানা আর কি করেন? তিনি ঘরে বসে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে রাতদিন কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি জোগাল। তিনি সুলতানকে গিয়ে বললেন, "আমার একটা সখ হয়েছে যে তোমার ছেলেকে আর ঐ পাগলা দরজিকে দুটো ওড়না বুনতে দেব—যারটা ভালো হবে, সেইটা আমার জন্মদিনে গায়ে দেব।" সুলতান বললেন, "সে তো বেশ কথা।" তারপর দরজি আর ওমার দুজনকেই ছুঁচ, সুতো, জরি, রেশম, এই-সব দিয়ে সুলতানা বললেন, "আমাকে সুন্দর একখানা ওড়না বানিয়ে দিতে হবে।"

দরজির ছেলে ভাবল, 'সুলতানা আমার ওপর চটে আছেন—এইবার তাঁকে খুশি করে দিতে হবে।' তাই সে খুব যত্ন করে, সোনালি, রুপোলি ফুল, পাতা এঁকে চমৎকার একটি ওড়না বানাল। তাই দেখে সুলতানা বললেন, "বাছা, তোমার হাতের সেলাই তো বড় চমৎকার! একেবারে ওস্তাদ দরজির মতো! এমন সেলাই কোত্থেকে শিখলে বল দেখি?" তখন দরজি ভারি থতমত খেয়ে গেল।

তারপর দুজনে ওমারের ঘরে গিয়ে দেখলেন যে সে বেচারা চুপ করে বসে আছে। সুলতানা বললেন, "আমার ওড়না কই?" ওমার মুখ ফুলিয়ে বলল, "আমি তলোয়ার চালাতেই শিখেছি, ছুঁচ চালাতে তো জানি না।" সুলতানের মনে তখন ভারি খটকা লাগল।

সে দেশে এক আদ্যিকালের বুড়ি ছিল, লোকে বলত যে সে জাদু জানে। সুলতান অনেক ভেবে কিছু ঠিক করতে না পেরে, সেই বুড়ি জাদুকরীকে গিয়ে সব বললেন। বুড়ি তাঁকে দুটো কৌটো দিয়ে বলল, "আপনি বাড়ি গিয়ে ওদের দুজনকে বলুন এর মধ্যে একটা কৌটো পছন্দ করে নিতে। যে যা পছন্দ করবে, তাতেই বোঝা যাবে কে আপনার ছেলে।"

কৌটো দুটি ভারি সুন্দর—দেখতে দুটোই একরকম; কিন্তু একটার ওপর লেখা আছে "টাকার সুখ" আরেকটাতে লেখা আছে "বীরত্বের সম্মান"! সুলতান আর সুলতানা দরজির ছেলেকে ডেকে বললেন, "এর মধ্যে তোমার কোন্‌টি পছন্দ হয় বলতো?" দরজি অমনি খপ করে "টাকার সুখ" লেখা কৌটোটি ধরল। কিন্তু ওমার এসে "বীরত্বের সম্মান" লেখা কৌটোটি পছন্দ করল। সুলতান বললেন, "আচ্ছা নিজের নিজের কৌটো নিয়ে যাও।" যেই কৌটো দুটো হাতে নেওয়া অমনি ফট করে তার ঢাকনা খুলে গেল। ওমারের কৌটোর মধ্যে ছোট্ট সুন্দর একটি মুকুট আর

রাজদণ্ড, আর দরজির কৌটোয় একটা ছুঁচ আর সুতো!

তখন আর কারো বুঝতে বাকি রইল না যে কে দরজির ছেলে আর কে সত্যি সুলতানের ছেলে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সেই গোলমালের মধ্যে দরজির ছেলে এক দৌড়ে যে কোথায় পালাল, আর কেউ তাকে খুঁজে পেলো না।

সন্দেশ—১৩২৩

আশ্চর্য ছবি

জাপান দেশে সেকালের এক চাষা ছিল, তার নাম কিকিৎসুম। ভারি গরিব চাষা, আর যেমন গরিব তেমনি মূর্খ। দুনিয়ার সে কোন খবরই জানত না; জানত কেবল চাষবাসের কথা, গ্রামের লোকদের কথা, আর গ্রামের যে বুড়ো 'বঞ্জে' (পুরোহিত), তার ভালো ভালো উপদেশের কথা। চাষার যে স্ত্রী, তার নাম লিলিৎসি। লিলিৎসি চমৎকার ঘরকন্না করে, বাড়ির ভিতর সব তকতকে ঝরঝরে করে গুছিয়ে রাখে, আর রান্না করে এমন সুন্দর যে চাষার মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। কিকিৎসুম কেবলই বলে, "এত আমার বয়স হল, এত আমি দেখলাম শুনলাম, কিন্তু রূপে গুণে এর মতো আর-একটি কোথাও দেখতে পাই নি।" লিলিৎসি সে কথা যত শোনে ততই খুশি হয়।

একদিন হয়েছে কি, কোথাকার এক শহুরে বড় মানুষ এসেছেন সেই গ্রাম দেখতে; তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটি, আর মেয়েটির ছিল একটি ছোট্ট আয়না। রাস্তায় চলতে চলতে আয়নাটা সেই মেয়ের হাত থেকে কখন পড়ে গেছে, কেউ তা দেখতে পায় নি। কিকিৎসুম যখন চাষ করে বাড়ি ফিরছে তখন সে দেখতে পেল, রাস্তার ধারে ঘাসের মধ্যে কি একটা চকচক করছে। সে তুলে দেখল, একটা অদ্ভুত চ্যাপ্টা চৌকোনা জিনিস! সে কিনা কখনো আয়না দেখে নি, তাই সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, এটা আবার কিরে? নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ সেই আরসির ভিতরে নিজের ছায়ার দিকে তার নজর পড়ল। সে দেখল কে একজন অচেনা লোক তার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে। দেখে সে এমন চমকে উঠল, যে আর-একটু হলেই আয়নাটা তার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল, এটা নিশ্চয়ই আমার বাবার ছবি—দেবতারা আমার উপর খুশি হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার বাবা মারা গিয়েছেন সে অনেক দিনকার কথা, কিন্তু তবু তার মনে হল, হ্যাঁ এইরকমই তো তাঁর চেহারা ছিল। তারপর—কি আশ্চর্য! সে চেয়ে দেখল তার নিজের গলায় যেমন একটা রূপার মাদুলি, ছবির গলায়ও ঠিক তেমনি! এ মাদুলি তো তার বাবারই ছিল, তিনি তো সর্বদাই এটা গলায় দিতেন—তবে তো এটা তার বাবারই ছবি।

তখন কিকিৎসুম করল কি, আয়নাটাকে যত্ন করে কাগজ দিয়ে মুড়ে বাড়ি নিয়ে

এল। বাড়ি এসে তার ভাবনা হল, ছবিটাকে রাখে কোথায়? তার স্ত্রীর কাছে যদি রেখে দেয়, তবে সে হয়তো পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করবে, আর গ্রামসুদ্ধ সবাই এসে ছবি দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়বে। গ্রামের মূর্খগুলো তো সে ছবির মর্যাদা বুঝবে না, তারা আসবে কেবল 'তামাশা' দেখবার জন্য! তা হবে না—তার বাবার ছবি নিয়ে ছেলেবুড়ো সবাই এসে নোংরা হাতে নাড়বে-চাড়বে তা কিছুতেই হতে পারবে না। এ ছবি কাউকে দেখান হবে না, লিলিংসিকেও তার কথা বলা হবে না।

কিকিৎসুম বাড়িতে এসে একটা বহুকালের পুরানো ফুলদানির মধ্যে আরসিটাকে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু তার মনটা আর কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। খানিকক্ষণ পরে পরেই সে একবার করে দেখে যায় ছবিটা আছে কিনা। তার পরের দিন সে মাঠে কাজ করছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল, 'ছবিটা আছে তো?' অমনি সে কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে দেখতে এল। দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে যাবে, এমন সময় লিলিংসি সেই ঘরে এসে পড়েছে। লিলিংসি বলল, "এ কি! তুমি দুপুরবেলায় ফিরে এলে যে? অসুখ করে নি তো?" কিকিৎসুম থতমত খেয়ে বলল, "না না, হঠাৎ তোমায় দেখতে ইচ্ছা করল তাই বাড়ি এলাম।" শুনে লিলিংসি ভারি খুশি হয়ে গেল। তারপর আর-একদিন এইরকম লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি দেখতে এসে কিকিৎসুম আবার তার স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ল। সেদিনও সে বলল, "তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা বার বার মনে হচ্ছিল, তাই একবার ছুটে দেখতে এলাম।" সেদিন কিন্তু লিলিংসির মনে একটু কেমন খটকা লাগল। সে ভাবল, 'কই, এতদিন তো কাজ করতে করতে একবারও আমায় দেখতে আসে নি, আজকাল এরকম হচ্ছে কেন?'

তারপর আর-একদিন কিকিৎসুম এসেছে ছবি দেখতে। সেদিন লিলিংসি টের পেয়েও দেখা দিল না—চুপিচুপি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল—কিকিৎসুম সেই ফুলদানির ভেতর থেকে কি একটা জিনিস বার করে দেখল, তারপর খুব খুশি হয়ে যত্ন করে আবার রেখে দিল। কিকিৎসুম চলে যেতেই লিলিংসি দৌড়ে এসে ফুলদানির ভিতর থেকে কাগজে মোড়া আরসিটাকে টেনে বার করল। তারপর তার মধ্যে তাকিয়ে দেখে অতি সুন্দর এক মেয়ের ছবি!

তখন যে তার রাগটা হল—সে রাগে গজ গজ করে বলতে লাগল, "এই জন্যে রোজ বাড়িতে আসা—আবার আমায় বলেন 'তোমার মুখখানা দেখতে এলাম', 'তোমার মতো সুন্দর আর হয়ই না।' মাগো! কি বিশ্রী মেয়েটা! হোৎকা মুখ, থ্যাবড়া নাক, ট্যারচা চোখ—আবার আমার মতো করে চুল বাঁধা হয়েছে! দেখ না কিরকম হিংসুটে চেহারা! এই ছবি আবার আদর করে তুলে রেখেছেন—আর রোজ রোজ আহ্লাদ করে দেখতে আসেন।" লিলিংসির চোখ ফেটে জল আসল, সে মাটিতে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর চোখ মুছে আর-একবার আরসির দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েটার কি ছিঁচকাদুনে চেহারা—এমন চেহারাও কেউ পছন্দ করে!" সে তখন আয়নাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখল।

সন্ধ্যার সময় কিকিৎসুম বাড়ি এসে দেখল, লিলিংসি মুখ ভার করে মেঝের উপর বসে রয়েছে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "কি হয়েছে?" লিলিংসি বলল, "থাক থাক, আদর দেখাতে হবে না—নাও তোমার সাধের ছবিখানা নাও। ওকে নিয়েই আদর কর, যত্ন কর, মাথায় করে তুলে রাখো।" তখন কিকিৎসুম গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি যে

আমার ছবিকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছ—জান ওটা আমার বাবার ছবি?" লিলিংসি আরো রেগে বলল, "হ্যাঁ, তোমার বাবার ছবি! আমি কচি খুকি কিনা, একটা বলে দিলেই হল! তোমার বাবার কি অমনি আহ্লাদী মেয়ের মতো চেহারা ছিল? তিনি কি আমাদের মতো করে খোঁপা বাঁধতেন?" কথাটা শেষ না হতেই কিকিৎসুম বলল, "তুমি না দেখেই রাগ করছ কেন? একবার ভালো করে দেখই না।" এই বলে কিকিৎসুম নিজে আবার দেখল, আরসির মধ্যে সেই মুখ।

তখন দুজনের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেল। কিকিৎসুম বলে ওটা তার বাবার ছবি, লিলিংসি বলে ওটা একটা হিংসুটি মেয়ের ছবি। এইরকম তর্ক চলছে, এমন সময়ে গ্রামের যে বুড়ো 'বজ্ঞে', সে তাদের গলার আওয়াজ শুনে দেখতে এল ব্যাপারখানা কি! পুরুতঠাকুরকে দেখে দুজনেই নমস্কার করে তার কাছে নালিশ লাগিয়ে দিল। কিকিৎসুম বলল, "দেখুন, আমার বাবার ছবি, সেদিন আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম, আর ও কিনা বলে যে ওটা কোন্-এক মেয়ের ছবি।" লিলিংসি বলল, "দেখলেন কি অন্যায়! এনেছেন একটা গোমড়ামুখি মেয়ের ছবি, আর আমায় বোঝাচ্ছেন, ঐ নাকি তাঁর বাবা!"

তখন 'বজ্ঞে' ঠাকুর বললেন, "দাও তো দেখি ছবিখানা।" তিনি আরসি নিয়ে মিনিট পাঁচেক খুব গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আয়নাটাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, "তোমরা ভুল বুঝেছ। এ হচ্ছে অতি প্রাচীন এক মহাপুরুষের ছবি। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইনি একজন যে-সে লোক নন। দেখছ না, মুখে কি গম্ভীর তেজ, কিরকম বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য, আর কি সুন্দর প্রশান্ত অমায়িক ভাব। এ ছবিটা তো এমন করে রাখলে চলবে না; বড় মন্দির গড়ে তার মধ্যে পাথরের বেদি বানিয়ে, তার মধ্যে ছবিখানাকে রাখতে হবে—আর ফুলচন্দন ধূপধুনো দিয়ে তার সম্মান করতে হবে।"

এই বলে 'বজ্ঞে' ঠাকুর আরসি নিয়ে চলে গেলেন। আর কিকিৎসুম আর লিলিংসি ঝগড়া-টগড়া ভুলে খুশি হয়ে খেতে বসল।

সন্দেশ—১৩২৫

ভাঙা তারা

মাতারিকি আকাশের পরী। আকাশের পরী যারা, তাদের একটি করে তারা থাকে। মাতারিকি তার তারাটিকে রোজ সকালে শিশির দিয়ে ধুয়ে মেজে এমনি চকচক করে সাজিয়ে রাখত যে, রাত্রিবেলা সবার আগে তার ওপরেই লোকের চোখ পড়ত—আর সবাই বলত—"কি সুন্দর!" তাই শুনে শুনে আর-সব আকাশ-পরীদের ভারি হিংসা হত।

তানে হচ্ছেন গাছের দেবতা। তিনি গাছে গাছে রস জোগাতেন, ডালে ডালে

ফুল ফোটাতেন আর গাছের সবুজ তাজা পাতার দিকে অবাক হ'য়ে ভাবতেন—'এ জিনিস দেখলে পরে আর কিছুর পানে লোকে ফিরেও চাইবে না।' কিন্তু লোকেরা গাছের উপর দিয়ে বার বার কেবল মাতারিকির তারা দেখত, আর কেবল তার কথাই বলত। তানের বড় রাগ হ'ল। সে বলল, "আচ্ছা, তারার আলো আর কত দিন? দুদিন বাদেই ঝাপসা হয়ে আসবে।" কিন্তু যত দিন যায় তারা ততই উজ্জ্বল আর ততই সুন্দর হয়, আর সবাই তার দিকে ততই বেশি করে তাকায়। একদিন অন্ধকার রাত্রে যখন সবাই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, তখন তানে চুপি-চুপি দুজন আকাশ-পরীর কানে কানে বলল, "এস ভাই, আমরা সবাই মিলে মাতারিকিকে মেরে তারাটাকে পেড়ে আনি।" পরীরা বলল, "চুপ, চুপ, মাতারিকি জেগে আছেন। পূর্ণিমার জোছনা রাতে আলোয় শুয়ে মাতারিকির চোখ যখন আপনা হতে ঢুলে আসবে, সেই সময়ে আবার এস।"

এ-সব কথা কেউ শুনল না, শুনল খালি জলের রাজার ছোট্ট একটি মেয়ে। রাজার মেয়ে রাত্রি হলেই, সেই তারাটির ছায়া নিয়ে খেলতে খেলতে জলের নীচে ঘুমিয়ে পড়ত আর মাতারিকির স্বপ্ন দেখত। দুষ্ট পরীর কথা শুনে তার দুচোখ ভরে জল আসল।

এমন সময় দখিন হাওয়া আপন মনে গুনগুনিয়ে জলের ধারে এসে পড়ল। রাজার মেয়ে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল, "দখিন হাওয়া শুনেছ? ওরা মাতা-রিকিকে মারতে চায়।" শুনে দখিন হাওয়া 'হায়' 'হায়' করে কেঁদে উঠল। রাজার মেয়ে বলল, "চুপ চুপ, এখন উপায় কি বল তো?" তখন তারা দুজন পরামর্শ করল যে মাতারিকিকে জানাতে হবে--সে যেন পূর্ণিমার রাতে জেগে থাকে।

ভোর না হতে দখিন হাওয়া রাজার মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, "এখন যেতে হবে।" সূর্য তখন স্নানটি সেরে সিঁদুর মেখে সোনার সাজে পুবের দিকে দেখা দিচ্ছেন। রাজার মেয়ে তাঁর কাছে আবদার করল, "আমি আকাশের দেশে বেড়াতে যাব।" সূর্য তাঁর একখানি সোনালি কিরণ ছড়িয়ে দিলেন। সেই কিরণ বেয়ে বেয়ে রাজার মেয়ে উঠতে লাগলেন। সকাল বেলার কুয়াশা দিয়ে দখিন হাওয়া তাকে ঘিরে ঘিরে চারদিকেতে ঢেকে রাখল। এমনি করে রাজার মেয়ে মাতারিকির বাড়িতে গিয়ে, সব খবর বলে আসল। মাতারিকি কি করবে? সে বলল, "আমি আর কোথায় যাব? পূর্ণিমার রাতে এই খানেই পাহারা দিব—তারপর যা হয় হবে।"

রাজার মেয়ে ঝাপসা মেঘের আড়াল দিয়ে বৃষ্টি বেয়ে নেমে আসলেন।

তারপর পূর্ণিমার রাতে তানে আর দুষ্টু পরীরা ছুটে বেরুল মাতারিকির তারা ধরতে। মাতারিকি দুহাত দিয়ে তারাটিকে আঁকড়ে ধ'রে, প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। ছুট, ছুট, ছুট! আকাশের আলোর নীচে, ছায়াপথের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে ছুটোছুটি আর লুকোচুরি। দখিন হাওয়া স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল, রাজার মেয়ে রাত্রি জেগে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারায় তারায় আকাশ-পরী কিন্তু মাতারিকি যার কাছেই যায়, সেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

ছুটতে ছুটতে মাতারিকি হাঁপিয়ে পড়ল—আর সে ছুটতে পারে না। তখন তার মনে হল, 'জলের দেশে রাজার মেয়ে আমায় বড় ভালোবাসে—তার কাছে লুকিয়ে থাকি।' মাতারিকি ঝুপ করে জলে পড়েই ডুব, ডুব, ডুব—একেবারে জলের তলায় ঠান্ডা কালো ছায়ার নীচে লুকিয়ে রইল। রাজার মেয়ে অমনি তাকে শেওলায় ঢেকে

আড়াল করল।

সবাই তখন খুঁজে সারা—'কোথায় গেল, কোথায় গেল?' একজন পরী বলে উঠল, "ঐ ওখানে—জলের নীচে।" তানে বলল, "বটে! মাতারিকিকে লুকিয়ে রেখেছে কে?" রাজার মেয়ের বুকের মধ্যে দুর দুর করে কেঁপে উঠল—কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না। তখন তানে বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও, আমি এর উপায় করছি।" তখন সে জলের ধারে নেমে এসে, হাজার গাছের শিকড় মেলে শোঁ শোঁ করে জল টানতে লাগল।

তখন মাতারিকি জল ঝেড়ে উঠে আসল। জলের নীচে আরামে শুয়ে তার পরিশ্রম দূর হয়েছে, এখন তাকে ধরবে কে? আকাশময় ছুটে ছুটে কাহিল হয়ে সবাই বলছে, "আর হলো না।" তানে তখন রেগে বলল, "হতেই হবে।" এই বলে হঠাৎ সে পথের পাশের একটা মস্ত তারা কুড়িয়ে নিয়ে, মাতারিকির হাতের দিকে ছুঁড়ে মারল।

ঝন ঝন করে শব্দ হল, মাতারিকি হায় হায় করে কেঁদে উঠল, তার এতদিনের সাধের তারা সাত টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। তানে তখন দৌড়ে এসে সেগুলোকে দুহাতে করে ছিটিয়ে দিলেন আর বললেন, "এখন থেকে দেখুক সবাই—আমার গাছের কত বাহার।" দুষ্টু পরীরা হো হো করে হাসতে লাগল।

এখনো যদি দখিন হাওয়ার দেশে যাও, দেখবে সেই ভাঙা তারার সাতটি টুকরো আকাশের একই জায়গায় ঝিকমিক করে জ্বলছে। ঘুমের আগে রাজার মেয়ে এখনো তার ছায়ার সঙ্গে খেলা করে। আর জোছনা রাতে দখিন হাওয়ায় মাতারিকির দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়।

সন্দেশ—১৩২৩

লোলির পাহারা

শহর থেকে অনেক দূরে 'লোলি'দের বাড়ি। সে বাড়িতে খালি লোলি থাকে, আর তার বাবা থাকেন, আর থাকে একটা বুড়ো শুওর। বাড়ির চারদিকে ছোট ছোট খেত, তার চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। খেতে যে সামান্য ফসল হয়, তাই বেচবার জন্য লোলির বাবা শহরে যান, আর লোলিকে বলে যান, "তুই বাড়িতে থেকে ভালো করে পাহারা দিস্।" লোলি বাড়িতেই থাকে, কিন্তু পাহারা দেয় বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে, নাক ডাকিয়ে!

একদিন লোলির বাবা শহরে যাবার সময়ে লোলিকে বললেন, "ওরে! আমার তো আজকেও ফিরতে সন্ধে হবে, একটু ভালো করে মন দিয়ে পাহারা দিস্। কশাইবুড়ো বলেছিল শুওরটাকে কিনবে—তা হলেই শীতকালটা আমাদের কোন-রকমে চলে যাবে। দেখ বাপু, ফটকটি খোলা রেখো না যেন! শুওরটা যদি পালায়,

তা হলে কিন্তু উপোস করে মরতে হবে।" লোলি খুব খানিক ঘাড় নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি খুব করে পাহারা দেব—আর কখনো ফটক খুলে রাখব না।"

লোলির বাবা চললেন শহরের দিকে, আর লোলি একটা খড়ের গাদার উপর বসে পাহারা দিতে লাগল। বুড়ো শুওরটা শুয়ে শুয়ে ঘঁৎ ঘঁৎ করে নাক ডাকছে, তাই শুনতে শুনতে লোলিও কখন যে চোখ বুজে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে নিজেও টের পায় নি। হঠাৎ সে কেমন যেন চমকে উঠল, বাবার কথাগুলো তার মনে পড়ল। সর্বনাশ! শুওর যদি পালায়, তবে এবার দুজনকেই উপোস থাকতে হবে। সে কান পেতে শুনল, শুওরের ঘঁৎ ঘঁৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে না! সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল—ফটকের দরজা খোলা! ভয়ে অমন শীতের মধ্যেও লোলির গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ছুটতে লাগল।

লোলি ভাবল, হয়তো শুওরটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু সমস্ত ঘরদোর খুঁজে কোথাও সেটাকে পাওয়া গেল না, তখন লোলি পাগলের মতো রাস্তার দিকে ছুটে চলল। কিন্তু রাস্তায় গিয়ে দেখল, শুওর-টুওর কোথাও কিছু নেই—খালি একটা বুড়ো ভিখারি লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। তখন লোলি আবার বাড়ির মধ্যে দৌড়ে গেল। সে বিছানার তলায় ঢুকে দেখল, মাচার ওপরে চড়ে দেখল, প্রকাণ্ড জালাটার ভেতরে হাত দিয়ে দেখল, সমস্ত টেবিল চেয়ার ঝেড়েঝুড়ে দেখল, মই দিয়ে বাড়ির চালায় উঠে দেখল—শুওর কোথাও নেই! লোলি কাঁদ কাঁদ হয়ে আবার রাস্তার দিকে ছুটল।

রাস্তায় গিয়ে সে এদিকে-ওদিকে, মাঠের দিকে, গাছের দিকে, নর্দমার দিকে, সব দিকে তাকিয়ে দেখল, শুওর কোথাও নেই। তখন লোলি সত্যিসত্যিই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। সে কেঁদে উঠতেই তার মনে হল, কোথায় যেন শুওরটা "ঘঁ—চ" করে চেঁচিয়ে উঠল। লোলি তখন কি করবে বুঝতে না পেরে, সেই বুড়োর পিছন পিছন ছুটতে লাগল আর কাঁদতে লাগল, "মশাই গো! মশাই গো! আমাদের শুওরটা কোথায় গেল বলে দিন না মশাই!"

লোলির কান্না দেখে বুড়োর হাসি পেয়ে গেল। সে বলল, "কি, বলছ কি? কার শুওর? কি হয়েছে?" লোলি বলল, "আমাদের সেই শুওরটা—আমি শুওর পাহারা দিতে দিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছি, আর—" বুড়ো অমনি ভেংচে উঠল, "একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছ—আর শুওর অমনি পালিয়েছে। খুব পাহারাদার যা হোক!" লোলি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল, "দোহাই মশায়, আমার শুওর কোথায় গেল বলে দিন।" বুড়ো তখন রেগে বলল, "ভারি তো একটা শুওর, তাই নিয়ে আবার এত ঘ্যান্ঘ্যান্—এ কিন্তু বাপু নেহাৎ বাড়াবাড়ি!" লোলি বলল, "শুওর গেলে আমাদের উপায় হবে কি? আমরা শীতকালে খাবার পয়সা পাব কোথায়?" বুড়ো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "যখন পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন সে কথার খেয়াল ছিল না?" এই বলে বুড়ো আবার কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে লাগল।

লোলি এবার তার পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কান্না শুরু করল, "মশাই গো, দোহাই আপনার!—ও মশাই গো! আমাদের কি হবে গো!" বুড়ো বলল, "কি আপদ! এমন বিচ্ছিরি প্যান্পেনে ছিঁচকাঁদুনে ছেলেও তো দেখি নি কোথায়! চুপ কর শিগ্গির। এখনি পাড়ার লোক সব ছুটে আসবে, ডাকাত পড়েছে মনে করে!" কিন্তু লোলি কি সে কথা শোনে? সে প্রাণপণে কেবলই চেঁচাচ্ছে, "ওরে আমার

শুওর কোথায় গেল রে? ওরে আমার শুওর কে নিল রে?”

বুড়ো তখন বিরক্ত হয়ে পা দুটো ছাড়িয়ে আবার ঠক্‌ঠক্‌ করে হেঁটে চলল—আর ঠিক সেই সময়ে বুড়োর গায়ের ছেঁড়া কম্বলের ভেতর থেকে ঘঁৎ ঘঁৎ করে কিসের একটা শব্দ শোনা গেল। লোলি শব্দ শুনেই চিৎকার করে উঠল, “তবে রে হতভাগা চোর! আমাদের শুওর নিয়ে পালাচ্ছিস! এই বলেই সে বুড়োর লাঠি-খানা টেনে ধরল। যেমন লাঠিতে হাত দেওয়া, অমনি লোলির মনে হল যেন তার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে; তার হাত-পাগুলো সুড়্‌ সুড়্‌ করে বেঁকেচুরে কিরকম ছোট্ট হ'য়ে যাচ্ছে; ঘাড় গলা পেট সব অসম্ভব মোটা হয়ে ফুলে উঠছে; মুখটা অদ্ভুতরকম বদলে গিয়ে নাকটাকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে! তারপর দেখতে দেখতে সে চারপায়ে হাঁটতে লাগল।

বুড়ো তখন একগাল হেসে বলল, “হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। কেমন? আগে ছিলি একটা অপদার্থ নিষ্কর্মা ঘুমকাতুরে কুঁড়ে, আর এখন হয়েছিস কেমন থপ্‌থপে নাদুস্‌নুদুস্‌ হ্যাংলামুখো শুওর। বেশ বেশ! আর কোনদিন দুষ্টুমি করবি? আর কখনো বুড়ো মানুষকে ‘চোর’ বলে ধরতে যাবি? যা, এইবার তোর খড়ের গাদায় গিয়ে শুয়ে থাক্‌। তোর বাবা যখন ফিরে আসবে কশাইবুড়োকে নিয়ে, তখন দেখবে শুওরটা আছে, কিন্তু হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া লোলিটা কোথায় পালিয়েছে! হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ।” বুড়ো খুব একচোট হেসে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল, আর লোলি রাস্তার ধুলোয় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে ধুলো ভিজিয়ে কাদা করে ফেলল।

লোলি রাস্তায় পড়ে কাঁদছে, এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা খেঁকি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসল। লোলি বেচারা কি করে? সে এখন শুওর হয়ে গেছে, তাই সে তার ভুঁড়ো পেট নিয়ে ছোট-ছোট চারটি পায়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে সে নিজেদের বাড়ির ফটকের সামনে এসেই এক দৌড়ে সেই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে বলল, “ঘঁৎ”—অর্থাৎ “বড্ড বেঁচে গিয়েছি!”

লোলি খড়ের মধ্যে শুয়ে হাঁপাচ্ছে আর ভাবছে, এখন কি করা যায়। এমন সময়ে হঠাৎ ভয়ে তার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল—তার মনে পড়ল, তার বাবা তো সন্ধে হলেই কশাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন, আর তাকেই তো শুয়োর ভেবে কশাইয়ের কাছে বিক্রি করবেন! আর কশাই তাকে একবার পেলেই তো গলায় ছুরি বসিয়ে—! লোলি আর ভাবতে পারে না। সে শুওরের ভাষায় একেবারে “বাপরে মারে! গেছি গেছি!” ব'লে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। সে ভাবল, এইবেলা সময় থাকতে ছুটে পালাই। কিন্তু পালাবে কোথায়? ঠিক সেই সময়ে তার বাবা সেই কশাইকে নিয়ে ফটক দিয়ে ঢুকছেন। লোলির বাবা ঢুকেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, “দেখছ! হতভাগা ছেলেটা ফটক খোলা রেখেই কোথায় সরে পড়েছে! শুওরটা যে পালায় নি এই ভাগ্যি!” এই বলে তিনি লোলির কান দুটো ধরে কশাইয়ের কাছে টেনে আনলেন। কশাই লোলিকে হাঁ করিয়ে তার মুখ দেখল, তার পাঁজরে খোঁচা মেরে, পিঠের ওপর আচ্ছা করে চাপড়ে তাকে পরীক্ষা করল. তারপর খুশি হয়ে বলল, “হুঁ, বেশ।” লোলি তার মাথা নেড়ে হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল, ক্যাঁচ কোঁচ ঘঁৎ ঘঁৎ কতরকম শব্দ করল, কিন্ত কিছুতেই তার বাবাকে বোঝাতে পারল না যে, সে সত্যি করে শুওর নয়, সে লোলি।

কশাই তার দাম চুকিয়ে দিয়ে, তার পর মুগুরের মতো একটা ডাণ্ডা দিয়ে লোলিকে গুঁতো মেরে বলল, "চল্, দেখি। বড় তেজ দেখাচ্ছিস—না? আচ্ছা, কালকে আর বাছাধনকে তেজ দেখাতে হবে না। কাল রাজার জন্মতিথির ভোজ—কেল্লা থেকে হুকুম এসেছে চোদ্দটা শুওর পাঠাতে হবে। এইটাকেই সবার আগে চালান দিচ্ছি। তা হলে ভোজটিও হবে ভালো।"

লোলি ঘ্যঁৎ ঘ্যঁৎ করে অনেক আপত্তি জানাতে লাগল, আর মনে মনে ভাবল, 'যেই ফটক খুলবে অমনি দৌড়ে পালাব।' যেমন ভাবা তেমনি কাজ; লোলির বাবা কশাইয়ের সঙ্গে এগিয়ে এসে যেমন ফটকটা খুলে ফাঁক করে ধরেছেন, অমনি লোলিও হন্‌হন্ করে দৌড় দিয়েছে। কিন্তু দৌড়ে যাবে কোথায়? বেরিয়েই দেখে কশাইয়ের দুটো ষণ্ডা কুকুর দাঁত বের করে বসে আছে। কাজেই তার আর পালান হল না। যাবার সময় লোলি শুনল, তার বাবা বকাবকি করছেন, "মনে করেছিলাম, ছোঁড়াটাকে আজ একটু তামাশা দেখাতে নিয়ে যাব, কিন্তু হতভাগা কোথায় যে গেল!"

কশাই লোলিকে ঠেলে ঠেলে তার বাসায় নিয়ে ছোট্ট নোংরা একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে নিজের কাজে চলে গেল, আর লোলি কাদার মধ্যে পড়ে কাঁদতে লাগল। খানিক বাদে যমের মতো চেহারা দুটো লোক এল তাদের একজনের হাতে দড়ি, আর একজনের হাতে মস্ত একটা ছুরি। তারা এসেই লোলিকে দেখে বলল, "হাঁ হাঁ, এইটা তো বেশ মোটা আছে—বাঃ ধর্ দেখি!" এই বলে তারা লোলিকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরল। লোলি তখন "মেরো না, মেরো না—আমি সত্যিকারের শুওর নই"—বলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে লোলির কানের কাছে কে যেন "হো-হো" করে হেসে উঠল, আর লোলি ধড়ফড়্ করে লাফিয়ে উঠে দেখল, সে তখনও সেই খড়ের গাদার ওপরেই রয়েছে—আর তার বাবা তার সামনে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসছেন, আর বলছেন, "স্বপ্নে বুঝি শুওর হবার সখ হয়েছিল? আচ্ছা হতভাগা ছেলে যা হোক!" লোলি কতক্ষণ বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ রগড়ে আবার চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর বলল, "আমাদের শুওরটা?" তার বাবা বললেন, "ঐ তো! শুনছিস নে? ঐ শোন্।" লোলি শুনল শুওরটা দিব্যি আরামে ঘ্যঁৎ ঘ্যঁৎ করে ডাকছে।

তখন লোলি বলল, "ভাগ্যিস্ পালায় নি!" তার বাবা বললেন, "তোমার মতো গুণধর ছেলেকে পাহারার ভার দিয়েছি, শুওর যে পালায় নি এ তো আমার আশ্চর্য ভাগ্য বলতে হবে।" লোলি বলল, "এখন থেকে খুব ভালো করে পাহারা দেব, আর কক্ষনো ফাঁকি দিয়ে ঘুমোব না।"

সন্দেশ—১৩২৭

তিন বন্ধু

এক ছিলেন রাজা—তাঁর ছিল এক ছেলে। রাজামশাই বড্ড বুড়ো হয়েছেন; তাই তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, "দেখ বাবা, আমি তো বুড়ো হয়েছি, কাজকর্ম আর ভালো ক'রে দেখতে পারি না। এখন তুমি আমার কাজকর্ম বুঝে নেও, আর একটি সুন্দর লক্ষ্মী বৌ নিয়ে এসো।" এই বলে তিনি একটা সোনার চাবি রাজপুত্রের হাতে দিলেন, আর বললেন, "রাজবাড়ির ছাতের দক্ষিণ কোনার ঘরটিকে এই চাবি দিয়ে খুলে, তার ভেতরে গিয়ে যে সুন্দরী রাজকন্যাদের ছবি দেখবে, তাদের মধ্যে থেকে একটিকে পছন্দ করে আমায় এসে বলবে।" রাজপুত্র তখনই সেই ঘরটিতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি একেবারে হাঁ করে রইলেন! ঘরটি গোল আর তার ছাত ঠিক আকাশের মতো নীল; তার ওপর সোনারুপোর তারা ঝলমল করছে। ঘরের চারিদিকে সোনা দিয়ে বাঁধানো বারোটি জানালা; তার প্রত্যেকটির ওপর চমৎকার পোশাকপরা একটি সুন্দরী রাজকন্যার ছবি আঁকা। তার মধ্যে কে যে বেশি সুন্দরী তাই সে আর ঠিক করতে পারছে না। এমন সময় সে দেখলো যে একটি জানালা পর্দা দিয়ে ঢাকা। তাড়াতাড়ি সে পর্দা উঠিয়ে দেখে কি—একটি অতি সুন্দরী রাজকন্যার ছবি। তার পোশাক কিন্তু একেবারে সাদাসিধে আর মাথায় মুক্তার মুকুট। বেচারার কিন্তু বড় বিষণ্ণ চেহারা; যেন তার কত দুঃখ।

সেই রাজকন্যাকেই সে পছন্দ করলো, আর দেখতে দেখতে অন্য সব ছবি কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজপুত্র বড়ই আশ্চর্য হয়ে, তখনই তার বাবাকে সব কথা জানাল। রাজামশাই তো সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—"সর্বনাশ! এই রাজকন্যাকে যে দুষ্ট জাদুকরে লোহার বাড়িতে আটক করে রেখেছে; যে একে ছাড়াতে যায় সেই যে আর ফেরে না! তোমার কপালে যে কত দুঃখ আছে তা আর কি বলব। এখন তো আর কোন উপায় নেই। পছন্দ যখন করেছ তখন তার খোঁজে যাও।"

তখনই রাজপুত্র একটা খুব তেজি ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়লো। অনেক দূর গিয়েছে সে, এমন সময় শুনতে পেল, কে যেন বলছে—"আরে, থামো না! থামো না!" রাজপুত্র অমনি পেছন ফিরে দেখলো যে, এয়া লম্বা একটা লোক তাকে বলছে, "ওহে আমাকে তোমার সঙ্গে নেও, দেখবে তোমার কত কাজ করে দিতে পারি আমি।" রাজপুত্র বলল, "তোমার নাম কি? আর তুমি করতেই-বা পার কি?" সে বলল, "আমার নাম ঢ্যাঙারাম। আমি যত ইচ্ছা লম্বা হতে পারি। ঐ যে তাল-গাছের আগায় বাবুইয়ের বাসা দেখছ, ওটিকে আমি এখনই পেড়ে দিতে পারি; তাতে আমার গাছে চড়বারও দরকার হবে না।" এই বলে সে দেখতে দেখতে তালগাছের মতো লম্বা হয়ে গেল আর পাখির বাসাটি পেড়ে নিয়েই চট করে আবার বেঁটে হয়ে গেল। রাজপুত্র বলল, "তা তো দেখলাম, কিন্তু ওতে আমার কি সাহায্য হবে? এই বনটা পার হবার রাস্তা যদি বলতে পার তবে বুঝবো আমার সাহায্য করলে।" ঢ্যাঙারাম আবার লম্বা হতে লাগলো আর দেখতে দেখতে তালগাছ ছাড়িয়ে কোথায় তার মাথা উঠলো। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখে বলল, "ঐ যে রাস্তা দেখা

যাচ্ছে।" তারপর সে আবার বেঁটে হয়ে, ঘোড়ার লাগাম ধরে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলো। খানিকদূর গিয়ে বলল, "ঐ যে আমার বন্ধু যাচ্ছে। ওকে ধরে নিয়ে আসি।" বলেই সে চট করে আকাশের মতো লম্বা হয়ে গেল আর এয়া লম্বা দুই পা ফেলে তার বন্ধুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারপর আর কোন কথাবার্তা না বলে তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নিয়ে রাজপুত্রের কাছে চলে এলো। বন্ধুটির বেশ ষণ্ডামার্কা চেহারা। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি? আর কিই-বা করতে পারো তুমি?" লোকটি বলল, "আমি ভোঁদারাম। আমি নিজেকে ফুলিয়ে প্রকাণ্ড বড় হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে পালাও, নইলে আমি এত তাড়াতাড়ি ফুলে উঠবো যে ভারি বিপদে পড়বে। এই বলেই সে ফুটবলের মতো ফুলতে আরম্ভ করলো। ঢ্যাঙারাম তো আগেই দৌড় দিয়েছে। রাজপুত্রও দেখাদেখি ঘোড়া ছুটিয়ে সরে পড়তে লাগলেন। ফুলে ফুলে পাহাড়ের মতো বড় হয়ে ভোঁদারাম হঠাৎ আবার ছোট হতে আরম্ভ করলো। পেটে যত বাতাস ভরেছিল সব ছেড়ে দিতে তার মুখ থেকে এমনি জোরে বাতাস ছুটতে লাগলো যে ঝড়ের বাতাস কোথায় লাগে! তা দেখে রাজপুত্র বলল, "বেশ, এমন লোক সচরাচর মেলে না। তুমি আমাদের সঙ্গে চল।" এই বলে তারা তিনজনে এগুতে লাগল।

খানিকদূর গিয়ে রাজপুত্র দেখল একটি লোক চোখে পট্টি বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে। ঢ্যাঙারাম বলল, "ঐ আমাদের আরেক বন্ধু।" রাজপুত্র সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে হে? অমন করে যে চোখ বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছ, পথ দেখবে কেমন করে?"

লোকটি বলল, "আমার নাম আগুনচোখ। তোমরা খোলা চোখে যা দেখ, আমি চোখ বেঁধে রাখলেই তা দেখতে পাই। খোলা চোখে দেখলে যত মোটা জিনিসই হোক না কেন, তার এপার-ওপার স্পষ্ট দেখতে পাই । ভালো করে কোন জিনিসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে সেটা হয় হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, নাহয় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" এই বলেই সে চোখের বাঁধন খুলে সামনের একটা পাহাড়ের দিকে কটমট করে চেয়ে রইলো। দেখতে দেখতে পাহাড়টা ফেটে, ভেঙে চুরমার হয়ে একটা বালির ঢিপি হয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে একতাল সোনা বের হলো। আগুনচোখ সেই সোনার তালটা রাজপুত্রকে দিল।

রাজপুত্র খুব খুশি হয়ে বলল, "দেখ তো সেই রাজকন্যা কি করছেন, কোথায় তিনি আছেন, আর এখান থেকে কত দূর?"

আগুনচোখ বলল, "ঐ যে তিনি একলা সেই লোহার বাড়িতে বন্ধ হয়ে বসে বসে কাঁদছেন। ওঃ সে যে অনেক লম্বা রাস্তা। এমনি করে ঘোড়ায় চড়ে গেলে যে এক বছরেও সেখানে পৌঁছতে পারবে না। অবশ্য ঢ্যাঙারাম যদি নিয়ে যায় তবে সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছে যাব।" অমনি ঢ্যাঙারাম আর তিনজনকে কাঁধে নিয়ে রওনা হলো। সন্ধ্যার সময় সেই লোহার বাড়ির দরজায় তারা পৌঁছে দেখল দরজা খোলা রয়েছে। তাই দেখে যেই তারা ভিতরে ঢুকেছে, অমনি দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল আর তারা সেই বাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে গেল। তখন আর কি করে—তারা এদিকে-ওদিকে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। চারদিকে অনেক লোকজন, তাদের খুব জমকালো পোশাক, কিন্তু কেউ নড়ে চড়ে না—সব যেন পাথর হয়ে রয়েছে।

বাড়ির চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে তারা খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। সেখানে

চারজনের জন্য নানারকম সুন্দর খাবার সাজানো রয়েছে দেখে তারা পেট ভরে খেয়ে নিলো। তারপর তারা শোবার জোগাড় দেখবে বলে উঠতে যাচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর একটা বুড়ো, কুঁজো, বিদঘুটে, এয়া লম্বা, পাকা দাড়িওয়ালা লোক একটি অতি সুন্দর রাজকন্যার হাত ধরে ঘরে ঢুকলো। রাজপুত্রকে দেখেই বুড়ো লোকটা বলল, "বাপুহে, সব জানি আমি! রাজকন্যাকে তো নিতে চাচ্ছ, কিন্তু তিনটি রাত যদি তাকে রক্ষা করতে পারো—তার আগে যদি সে হারিয়ে না যায়—তবেই তাকে পাবে; নইলে এই এতগুলি লোকের মতো তুমিও পাথর হয়ে যাবে।" এই বলে সে রাজকন্যাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাজপুত্র তো মেয়েটিকে দেখে বড় খুশি। সে তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু মেয়েটি কিছুই বলে না—হাসেও না। তারপর যখন রাত বেশি হয়ে এলো তখন ঢ্যাঙারাম লম্বা হয়ে ঘরের চারদিকে ঘিরে রইল; ভোঁদারাম এয়া মোটা হয়ে ফুলে তার পেট দিয়ে দরজার ছেঁদা বন্ধ করে রইল, যাতে একটি ইঁদুরও না ঢুকতে বা পালাতে পারে; আর আগুনচোখ চারদিকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে তদ্বির করতে লাগল।

কিন্তু সকলেই বড় ক্লান্ত হয়েছিল; তাই কিছুক্ষণ পরে সকলেই খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। ভোরের বেলা রাজপুত্রেরই আগে ঘুম ভেঙে গেল, আর সে দেখল যে রাজকন্যা ঘরে নাই। তখন যে তার দুঃখটা হলো! সে তাড়াতাড়ি আর তিনজনকে জাগিয়ে দিল, আর তখন কি করতে হবে জিজ্ঞাসা করল।

আগুনচোখ বলল, "ভয় কিসের? ঐ যে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে একশো মাইল দূরে একটা বন আছে। সেই বনে একটা আমগাছ আছে; তাতে একটি আম ফলেছে; তারই আঁঠিটি হচ্ছে সেই রাজকন্যা। ঢ্যাঙারাম আমাকে কাঁধে নিয়ে চলুক, আমরা এখনই তাকে আনছি।"

অমনি ঢ্যাঙারাম আর কথাবার্তা না বলে আগুনচোখকে কাঁধে তুলে নিল, আর দশ মাইল লম্বা একেক পা ফেলে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হল। তারপর আমের আঁঠি আনতে আর কতক্ষণ লাগে!

সেই আঁঠিটি রাজপুত্রের হাতে দিয়ে আগুনচোখ বলল, "এটাকে মাটিতে ছুঁড়ে মারো।" আর রাজপুত্রও কথামত কাজ করামাত্র রাজকন্যা এসে হাজির!

সূর্য উঠবার একটু পরেই সেই বুড়ো হাসতে হাসতে এসে, দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো; কিন্তু সেখানে রাজকন্যাকে দেখে বেচারা এমন চমকে গেল যে আরেকটু হলেই সে পড়ে যেত। তারপর রাগে গজগজ করতে করতে সে রাজকন্যাকে নিয়ে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার বুড়ো এসে রাজকন্যাকে রেখে গেল। রাজপুত্র আর তিন বন্ধু সে রাত্রে জেগে থাকবার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দুপুর রাত্রের আগেই সকলে ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করল। ভোরের বেলা রাজপুত্র আগে জেগে যেই দেখলো রাজকন্যা নেই, অমনি অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি তিনবন্ধুকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, "আগুনচোখ! শিগ্গির দেখ রাজকন্যা কোথায় গেল। সকাল যে হয়ে এল!"

আগুনচোখ জেগে উঠে চোখ রগড়ে বলল, "এই যে আমি তাকে দেখছি। এখান থেকে দুইশো মাইল দূরে একটা পাহাড় আছে; সেই পাহাড়ের মধ্যিখানে একটা পাথর

আছে; সেইটিই হলো রাজকন্যা। ঢ্যাঙারাম যদি আমায় নিয়ে যায় তবে এখনি আমি রাজকন্যাকে আনব।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। ঢ্যাঙারাম তখনই আগুনচোখকে কাঁধে নিয়ে কুড়ি মাইল লম্বা একেক পা ফেলে মুহূর্তের মধ্যে সেখানে হাজির হলো। আগুনচোখ সেই পাহাড়ের দিকে কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেই পাহাড়টাকে ফাটিয়ে গুঁড়িয়ে দিল, আর তার ভেতর থেকে সেই পাথরটা বেরিয়ে পড়ল। সেটাকে নিয়ে রাজপুত্রের কাছে দিতেই রাজপুত্র পাথরটা মাটিতে ফেলে দিল, আর রাজকন্যা এসে হাজির হলো!

সেদিন বুড়ো এসে রাজকন্যাকে দেখে যা চটে গেল, কি আর বলব! দুইহাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বলল, "আজ রাত্রে দেখব তোর বেশি ক্ষমতা না আমার বেশি ক্ষমতা! হয় তুই মরবি নাহয় আমি মরব।"

সে রাত্রেও রাজপুত্র আর তিন বন্ধু রাজকন্যাকে পাহারা দিতে লাগল, কিন্তু সেদিনও দুপুর রাতের আগেই সকলে ঘুমিয়ে পড়ল, আর রাজকন্যাও কোথায় জানি হারিয়ে গেল। ভোরের বেলা রাজপুত্র জেগে যেই দেখলো রাজকন্যা নেই, অমনি সে আগুনচোখকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বলল, "শিগ্গির দেখ, রাজকন্যা কোথায় গেল!"

আগুনচোখ কিছুক্ষণ চারদিকে তাকিয়ে তারপর বলল, "এবার তাকে দেখেছি! ঐ যে তিনশো মাইল দূরে কালো জলের সাগর আছে, তার মাঝখানে, জলের তলায় একটা শামুক আছে, সেই শামুকের মধ্যে একটা আংটি আছে, সেটিই রাজকন্যা। এখনও চেষ্টা করলে আমি আর ভোঁদারাম ঢ্যাঙারামের ঘাড়ে চড়ে সেখানে গিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে পারি।"

এ কথা বলামাত্র ঢ্যাঙারাম, আগুনচোখ আর ভোঁদারামকে কাঁধে নিয়ে, ত্রিশ মাইল লম্বা একেক পা ফেলে, মুহূর্তের মধ্যে গিয়ে সেখানে হাজির হল। তারপর ভোঁদা-রাম নিজের শরীরটি ফুলিয়ে পাহাড়ের চেয়ে বড় করে, চোঁ চোঁ শব্দে সাগরের জল খেতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে জল এত কম হয়ে গেল যে ঢ্যাঙারাম অনায়াসে শামুকটা তুলে এনে তার ভেতর থেকে আংটিটি বার করে নিল।

এদিকে রাজপুত্র তো বড়ই অস্থির হয়ে পড়ল। সকাল হয়ে গেল, তবু তিন বন্ধু ফেরেই না। এমন সময় সেই বুড়ো হাসতে হাসতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো, কিন্তু কোনো কথা বলার আগেই ঠন করে জানলার কাঁচ ভেঙে সেই আংটিটা এসে ঘরে পড়ল, আর রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালো। আগুনচোখ সেই তিনশো মাইল দূর থেকে সব দেখতে পেয়েছিল আর তাই সে ঢ্যাঙারামকে আংটিটা ছুঁড়ে দেবার কথা বলেছিল। ঢ্যাঙারামও প্রকাণ্ড লম্বা হাত বার করে আংটিটাকে সাঁই করে ছুঁড়ে ঠিক ঘরের ভেতরেই ফেলে দিল, আর রাজপুত্রও বেঁচে গেল।

বুড়ো বেচারার যা তখন দুরবস্থা! তার চোখ কপালে উঠে গেছে, দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে। আর থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ পরে সে ধোঁয়া হয়ে গেল, আর একটা দাঁড়কাক সেই ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে 'কা-কা' করতে করতে উড়ে চলে গেল। সে বাড়ির যত লোকজন পাথর হয়ে ছিল তারাও তখন বেঁচে উঠে রাজপুত্রের কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

তারপর সকলকে নিয়ে রাজপুত্র খুব ধুমধাম করে বাড়ি ফিরে এলো। সেখানে

বুড়ো রাজার আর দেশসুদ্ধ লোকের যা আনন্দ!

তিন বন্ধু কিন্তু রাজপুত্রের দেশে ফিরলো না, তারা সেই জঙ্গলেই ফিরে গেল, রাজপুত্র তো কত সাধাসাধি করলো, কিন্তু তারা কিছুতেই যেতে রাজি হলো না।

সন্দেশ—১৩২৩

দ্রিঘাংচু

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্র-মিত্র আমির ওমরা সিপাই শান্ত্রী গিজ গিজ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের ওপর বসে ঘাড় নিচু ক'রে চারিদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।
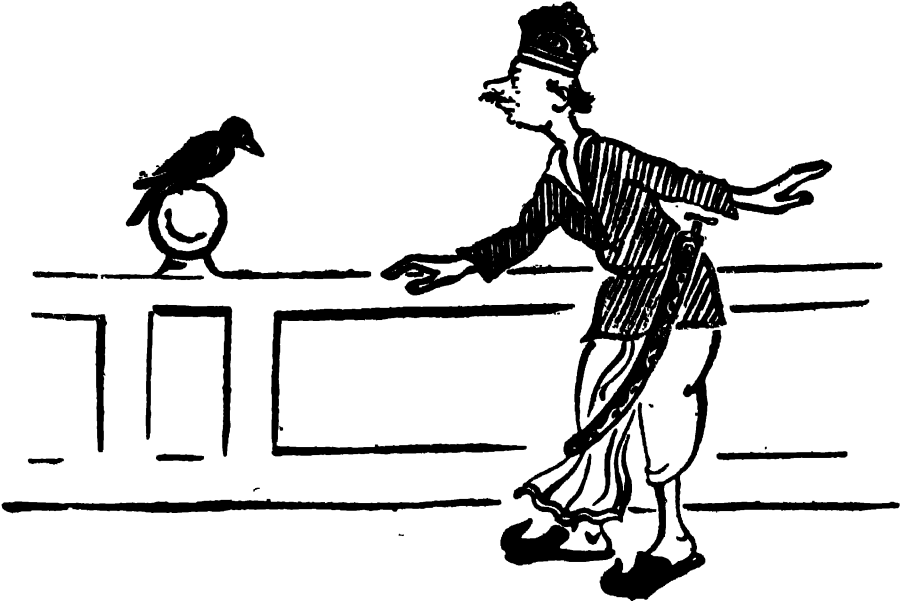
কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এরকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে এক সঙ্গে হাঁ করে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার

মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই করে রাজার মাথার ওপর পড়ে গেল। রাজামশায়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজামশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে; সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজামশায় খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথা কিরে! যে ঐরকম বিটকেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এমন ভয়ানক নিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল! তখন রাজামশাই বললেন, "ডাকো পণ্ডিত সভার যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির। তখন রাজামশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে এমন গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার?"

কাকে আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি? পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরা মতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল, "আজ্ঞে, বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।" রাজামশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি-মুড়কি বিক্রি হয়! মন্ত্রী ওকে বিদেয় করে দাও—" সকলে মহা তম্বি ক'রে বললে, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদেয় করুন।"

আর-একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠ নির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এইরকম আবোল তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এরকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজামশাই দস্তুরমত খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকে চুলকে কারো কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজামশাইয়ের খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের 'মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা' বলে গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা শুঁটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট

চিৎকার করে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র-মিত্র উজির-নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি হলো, কি হলো?" তখন অনেক জলের ছিটে পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, "মহারাজ সেটা কি দাঁড়কাক ছিল?" সকলে বলল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি?" লোকটা আবার বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসেছিল—আর মাথা নিচু করেছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' করে শব্দ করেছিল?" সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঐরকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাও নি কেন?" লোকটাকে কেউই চেনে না ,তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না, সবাই বললে, "হ্যাঁ, ওকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কি খবর দেবে, এ কথা কেউ বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত করে বলল, "দ্রিঘাংচু!" সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দিঘাঞ্চু কি হে?" লোকটা বলল, "দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও!" তখন রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কিরকম হে," লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর বসে মাথা নিচু করে দক্ষিণ দিকে মুখ করে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' বলে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয় নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কি?" লোকটা বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে বলে ফেল।" সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি, দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র তাকে যদি বলতে পারতাম তা হলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোন বইয়ে লেখে নি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বল তো।" লোকটা বলল, "সর্বনাশ! সে মন্ত্র দ্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দুদিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি দ্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে, তা হলেই সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ

ছেড়ে বাঁচল; সকলে দ্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলা-বলি করতে করতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর রাজামশাই দু'দিন উপোস করে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজামশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনরকম আশ্চর্য কিছু হয় কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি দ্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পান নি।

সন্দেশ—১৩২৩

অসিলক্ষণ পণ্ডিত

রাজার সভায় মোটা মোটা মাইনেওয়ালা অনেকগুলি কর্মচারী। তাদের মধ্যে সকলেই যে খুব কাজের লোক, তা নয়। দু-চারজন খেটেখুটে কাজ করে আর বাকি সবাই বসে বসে মাইনে খায়।

যারা ফাঁকি দিয়ে রোজগার করে, তাদের মধ্যে একজন আছেন, তিনি অসিলক্ষণ পণ্ডিত। তিনি রাজার কাছে এসে বললেন, তিনি অসিলক্ষণ (অর্থাৎ তলোয়ারের দোষ-গুণ) বিচার করতে জানেন। অমনি রাজা বললেন, "উত্তম কথা, আপনি আমার সভায় থাকুন, আমার রাজ্যের যত তলোয়ার আছে আপনি তার লক্ষণ বিচার করবেন।"

সেই অবধি ব্রাহ্মণ রাজার সভায় ভর্তি হয়েছেন, মোটারকম মাইনে পাচ্ছেন, আর প্রতিদিন তলোয়ার পরীক্ষা করছেন, আর বলছেন. "এই তলোয়ারটা ভালো, এই তলোয়ারটা খারাপ।" ভারি কঠিন কাজ! কত তলোয়ার ঘেঁটে-ঘুঁটে, দেখে আর শুঁকে, চটপট তার বিচার করছেন।

তাঁর বিচারের নিয়মটি কিন্তু ভারি সহজ! তলোয়ার এনে যখন তাঁর হাতে দেওয়া হয়, তখন তিনি সেটাকে শুঁকে দেখেন। তলোয়ার যারা বানায়, তারা তলোয়ারের গায়ে তাদের মার্কা এঁকে দেয়। তাই দেখে বোঝা যায় কোনটা কার তলোয়ার। পণ্ডিতমহাশয় শুঁকবার সময় সেই মার্কাটুকু দেখে নেন। যাদের উপর তিনি খুব খুশি থাকেন, যারা তাঁকে পয়সা-টয়সা দেয়, আর খাইয়ে-দাইয়ে তোয়াজ করে, তাদের তলোয়ার দেখলেই তিনি নেড়েচেড়ে টিপেটুপে বলেন, "খাসা তলোয়ার! দিব্যি তলোয়ার! হাজার টাকা দামের তলোয়ার!" আর যাদের উপর তিনি চটা, যারা তাঁকে ঘুষও দেয় না, খাতিরও করে না, তাদের তলোয়ার যত ভালোই হোক না

কেন, তাঁর কাছে পার পাবার জো নেই। সেগুলি হাতে পড়লেই তিনি অমনি একটু শুঁকেই নাক সিঁটকিয়ে বলে ওঠেন, "অতি বিচ্ছিরি! অতি বিচ্ছিরি! তলোয়ার তো নয়, যেন কাস্তে গড়েছে!"

এমনি ক'রে কত ভালো-ভালো কারিকর, কত চমৎকার চমৎকার তলোয়ার বানিয়ে আনে, কিন্তু বিচারের গুণে তার দু' টাকাও দাম হয় না। এর মধ্যে একজন ওস্তাদ কারিকর আছে, সে বেচারা মন প্রাণ দিয়ে এক-একখানি তলোয়ার গড়ে, আর বিচারক মশাই "দূর! দূর!" করে সব বাতিল করে দেন। এইরকম হতে হতে শেষটা কারিকর গেল খেপে।

একদিন সে করল কি, একখানি তলোয়ার বানিয়ে, তার গায়ে বেশ করে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে অসিলক্ষণ পণ্ডিতের কাছে এনে হাজির করল। পণ্ডিত নিতান্ত তাচ্ছিল্য করে, "আবার কি গড়ে আনলি? দেখি?" বলে, যেমনি তাতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে গেছেন, অমনি লঙ্কার গুঁড়ো নাকে ঢুকতেই হ্যাঁ-চ্—চো করে এক বিকট হাঁচি, আর সেই সঙ্গে তলোয়ারের আগায় ঘ্যাঁচ করে নাক কেটে দুখান!

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল, "জল আন্‌রে," "কবিরাজ ডাক্‌রে,"—ততক্ষণে তলোয়ারওয়ালা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার বাড়ি পর্যন্ত পিঠ্‌টান দিয়েছে।

অসিলক্ষণ পণ্ডিতের মহা মুশকিল। একে তো কাটা নাকের যন্ত্রণা, তার ওপর সভায় বেরুলে সবাই খ্যাপায় "নাক-কাটা পণ্ডিত" বলে।

বেচারার এখন মুখ দেখানই দায়, সে সভায়ও যেতে পারে না, চাকরিও করতে পারে না। তাকে দেখলেই লোকে জিজ্ঞাসা করে, "ত লোঁ য়াঁর টা কে'মন ছি'ল'!"

সন্দেশ—১৩২৬

রাজার অসুখ

এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ। ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবিরাজ সব দলে দলে আসে আর দলে দলে ফিরে যায়। অসুখটা যে কি তা কেউ বলতে পারে না, অসুখ সারাতেও পারে না।

সারাবে কি করে? অসুখ তো আর সত্যিকারের নয়। রাজামশাই কেবলই বলেন 'ভারি অসুখ', কিন্তু কোথায় যে অসুখ তা আর কেউ খুঁজে পায় না! কত-রকমের কত ওষুধ রাজামশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় বরফ দেওয়া হল, পেটে সেঁক দেওয়া হল, পায়ে জোঁক লাগান হল, হাতে মাদুলি বাঁধা হল, কিন্তু অসুখের কোন কিনারাই হল না।

তখন রাজামশাই গেলেন খেপে। তিনি বললেন—"দূর করে দাও এই অপদার্থগুলোকে, আর ওদের পুঁথিপত্র যা আছে সব কিছু কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।"

এমনি করে চিকিৎসকেরা বিদায় হলেন। ভয়ে আর কেউ রাজার বাড়ির দিকেও যায় না। তখন সকলের ভাবনা হল, তাই তো, শেষটায় রাজামশাই কি বিনা চিকিৎসায় মারা পড়বেন?

এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে বলল—"অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, কিন্তু সে ভারি শক্ত। তোমরা কি সে-সব করতে পারবে?"

মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্র-মিত্র সবাই বলল—"কেন পারব না? খুব পারব। জান দিতে হয় জান দেব!"

তখন সন্ন্যাসী বলল—"প্রথমে এমন একটি লোক খুঁজে আন যার মনে কোন ভাবনা নেই, যার মুখে হাসি লেগেই আছে, যে সব সময়ে, সব অবস্থাতেই খুশি থাকে।"

সবাই বলল—"তারপর?"

সন্ন্যাসী বলল—"তারপর সেই লোকের গায়ের জামা রাজামশাই যদি একটি দিন পরে থাকেন, আর সেই লোকের তোষকে যদি এক রাত্রি ঘুমিয়ে থাকেন, তা হলেই সব অসুখ সেরে উঠবে।"

সবাই শুনে বলল—"এ তো চমৎকার কথা।"

তাড়াতাড়ি রাজামশাইয়ের কাছে খবর গেল। তিনি শুনে বললেন—"আরে এই সহজ উপায়টা থাকতে এতদিন সবাই মিলে করছিল কি? এইটা কারো মাথায় আসে নি? যাও, এখনি খোঁজ করে সেই হাসি-ওয়ালা লোকটার জামা আর তোষক নিয়ে এস।"

চারিদিকে লোক ছুটল, রাজ্যময় "খোঁজ-খোঁজ" রব পড়ে গেল, কিন্তু সে লোকের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে যায় সেই ফিরে আসে আর বলে, "যার দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, সর্বদাই হাসিমুখ, সর্বদাই খুশি মেজাজ, কই, তেমন লোকের তো দেখা পাওয়া গেল না।" সবার মুখে একই কথা।

তখন মন্ত্রীমশাই রেগে বললেন—"এদের দিয়ে কি কোন কাজ হয়? এ মূর্খেরা খুঁজতেই জানে না।" এই বলে তিনি নিজেই বেরোলেন সেই অজানা লোকের খোঁজ করতে।

বাজারের কাছে মস্ত এক দালানের সামনে তিনি দেখলেন, মেলা লোক জমে গিয়েছে আর এক বুড়ো শেঠজি হাসিমুখে তাদের চাল, ডাল, পয়সা আর কাপড় দান করছে।

মন্ত্রী ভাবলেন, 'বাঃ এই লোকটাকে তো বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছে, ওর তো অনেক টাকা পয়সাও আছে দেখছি। তা হলে আর ওর দুঃখই-বা কিসের, ভাবনাই-বা কিসের? ওরই একটা জামা আর তোষক চেয়ে নেওয়া যাক।'

মন্ত্রীমশাই এইরকম ভাবছেন, ঠিক এই সময়ে একটা ভিখারি করেছে কি, ভিক্ষা নিয়ে শেঠজিকে সেলাম না করেই চলে যাচ্ছে। আর শেঠজির রাগ দেখে কে! তিনি ভিখারিকে গাল দিয়ে, জুতো মেরে, তার ভিক্ষা কেড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। ব্যাপার দেখে মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

তারপর নদীর ধারে এক জায়গায় তিনি দেখলেন একটা লোক ভারি মজার ভঙ্গি করে নানারকম হাসির গান করছে আর তাই শুনে চারিদিকের লোকেরা হো হো করে হাসছে। মানুষ যে এতরকম হাসির ভঙ্গি করতে পারে তা মন্ত্রীমশায়ের জানা

ছিল না। তিনি লোকটার গান শুনে আর তামাশা দেখে একেবারে হেসে অস্থির হয়ে উঠলেন আর ভাবলেন, এমন আমুদে লোকটা থাকতে কিনা আমার লোকগুলো সব হতাশ হয়ে ফিরে যায়! তিনি পাশের একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই লোকটা কে হে?"

সে বলল—"ও হচ্ছে গোবরা মাতাল। এখন দেখছেন কেমন খোস মেজাজে আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ওর মাতলামি, চেঁচামেচি আর উৎপাত শুরু হয়। ওর ভয়ে পাড়ার লোক তিষ্ঠোতে পাবে না।"

শুনে মন্ত্রীমশাই গম্ভীব হযে আবাব চললেন সেই লোকটির সন্ধানে। সাবাদিন খুঁজে খুঁজে মন্ত্রীমশাই সন্ধ্যাব সময় বাড়ি ফিরলেন, কিন্তু সে লোকের সন্ধান মিলল না। এমনি করে দিনের পব দিন তিনি খোঁজ কবেন আর দিনেব পর দিন হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

তাঁর উৎসাহ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক গাছতলায় তিনি একটা পাগলা গোছের বুড়ো লোকের দেখা পেলেন। লোকটার মাথাভরা চুল, মুখ-

ভরা দাড়ি, সমস্ত শরীর যেন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়েছে। সে এক, ৷কা বসে বসে আপন মনে কেবলই হাসছে, কেবলই হাসছে।

মন্ত্রী বললেন—"তুমি এত হাসছ কেন?"

সে বলল—"হাসব না? পৃথিবী বন বন কবে ঘুরছে, গাছের ছায়া সরে সরে

যাচ্ছে, মাঠে মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, পাখিরা গাছে এসে বসছে, আবার সব উড়ে যাচ্ছে। এ-সব চোখের সামনে দেখছি আর হাসি পাচ্ছে!"

মন্ত্রী বললেন—"তা নাহয় বুঝলাম, কিন্তু শুধু বসে বসে হাসলে তো আর মানুষের দিন চলে না। তোমার কি আর কোন কাজকর্ম নেই?"

ফকির বলল—"তা কেন থাকবে না? সকাল বেলায় নদীতে যাই, সেখানে স্নান-টান সেরে, লোকজনের যাওয়া-আসা কথাবার্তা এই সব তামাশা দেখে আবার গাছতলায় এসে বসি। তারপর, যেদিন খাওয়া জোটে খাই, যেদিন জোটে না সেদিন খাই না। যখন বেড়াতে ইচ্ছা হয় বেড়াই, যখন ঘুম পায় তখন ঘুমোই। কোন ভাবনা চিন্তা, হট্টগোল কিছুই নেই। ভারি মজা!"

মন্ত্রী খানিক মাথা চুলকিয়ে বললেন—"যেদিন খাওয়া পাও না সেদিন কি কর?"

ফকির বলল—"সেদিন তো কোন ল্যাঠাই নেই! চুপচাপ পড়ে থাকি আর এই-সব তামাশা দেখি। বরং যেদিন খাওয়া হয়, সেদিনই হাঙ্গামা বেশি। ভাত মাখরে, গ্রাস তোলরে, মুখের মধ্যে ঢোকাওরে, চিবোওরে, গেলোরে—তারপর জল খাওরে, আঁচাওরে, হাত মুখ মোছরে! কতরকম কান্ড!"

মন্ত্রী দেখলেন, এতদিনে ঠিকমত লোক পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন—"তোমার গায়ের এক-আধখানা জামা দিতে পার? তার জন্য তুমি যত ইচ্ছা দাম নাও, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।"

শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল, বলল—"আমার আবার জামা। এই সেদিন একটি লোক একটি শাল দিয়েছিল, তাও তো ছাই ভিখারিকে দিয়ে ফেললাম। জামা-টামার ধারই ধারি না কোনদিন।"

মন্ত্রী বললেন—"তা হলে তো মহা মুশকিল! যদি-বা একটা লোক পাওয়া গেল, তারও আবার জামা নেই। আচ্ছা, তোমার বিছানার তোষকখানা দিতে পার? কত দাম চাও বল, আমরা টাকা ঢেলে দিচ্ছি।"

এবারে ফকির হাসতে হাসতে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার হাসি আর থামেই না। অনেকক্ষণ হেসে তারপর সে বলল—"চল্লিশ বছর বিছানাই চোখে দেখলাম না, তা আবার তোষক আর গদি!"

মন্ত্রীমশাই বড়-বড় চোখ করে বললেন—"জামাও গায়ে দাও না, লেপ-কম্বল-বিছানাও সঙ্গে রাখ না, তোমার কি অসুখও করে না ছাই?"

ফকির বলল—"অসুখ আবার কি? অসুখ-টসুখ ও-সব আমি বিশ্বাস করি না। যারা কেবল অসুখ-অসুখ ভাবে, তাদেরই খালি অসুখ করে।"

এই বলে ফকির আবার গাছে হেলান দিয়ে ঠ্যাং মেলে খুব হাসতে লাগল।

মন্ত্রীমশাই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাজার কাছে খবর গেল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, তার কাছে সব কথা শুনলেন, শুনে মন্ত্রীমশাইকে বিদায় দিলেন।

আবার সবাই ভাবতে বসল, এখন উপায় কি হবে? চিকিৎসাও হল না, অনেক কষ্টে যা একটা উপায় পাওয়া গেল, সেটাও গেল ফসকে!

সবাই বসে বসে এ ওর মুখ চায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর বলে—"নাঃ, আর তো বাঁচাবার উপায় দেখছি না।"

ওদিকে রাজামশাই ভাবতে বসেছেন—'আমি থাকি রাজার হালে, ভালো ভালো খাই, কোন কিছুর অভাব নেই, লোকেরা সর্বদা তোয়াজ করছেই—আমার হল অসুখ! আর ঐ হতভাগা ফকির যার চাল-চুলো কিছু নেই, জামা নেই, কম্বল নেই, গাছতলায় পড়ে থাকে, যা পায় তাই খায়—সে কিনা বলে অসুখ-টসুখ কিছু মানেই না! সে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আর আমি রাজা হয়ে পারব না?'

তার পর দিনই রাজা ঘুম থেকে উঠে পাত্র-মিত্র সবাইকে ডেকে বললেন—"যা হতভাগা মুখ্যুগুলো সব, সভায় বস্‌গে যা! তোরা কেউ কিচ্ছু করতে পারলি না, এখন এই দেখ আমার অসুখ আমি নিজেই সারিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে আবার সভায় গিয়ে বসব। আর যে টুঁ শব্দটি করবে তার মাথা উড়িয়ে দেব!"

সন্দেশ—১৩২৮

দানের হিসাব

এক ছিল রাজা। রাজা জাঁকজমকে পোশাক পরিচ্ছদে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু দানের বেলায় তাঁর হাত খোলে না।

রাজার সভায় হোমরা-চোমরা পাত্র-মিত্র সবাই আসে, কিন্তু গরিব-দুঃখী পণ্ডিত সজ্জন এরা কেউ আসে না। কারণ সেখানে গুণীর আদর নাই, একটি পয়সা ভিক্ষা পাবার আশা নাই।

রাজার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ লাগল, পূর্ব সীমানার লোকেরা অনাহারে মরতে বসল। রাজার কাছে খবর এল, রাজা বললেন, "এ-সমস্ত দৈবে ঘটায়, এর উপর আমার কোন হাত নাই।"

লোকেরা বলল, রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য করতে হুকুম হোক, আমরা দূরে থেকে চাল কিনে এনে এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাই।"

রাজা বললেন, "আজ তোমাদের দুর্ভিক্ষ, কাল শুনব আর-এক জায়গায় ভূমিকম্প, পরশু শুনব অমুক লোকেরা ভারি গরিব, দুবেলা খেতে পায় না। সবাইকে সাহায্য করতে হলে রাজভাণ্ডার উজাড় করে রাজাকে ফতুর হতে হয়!"

শুনে সবাই নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

ওদিকে দুর্ভিক্ষ বেড়েই চলেছে। দলে দলে লোক অনাহারে মরতে লেগেছে। আবার দূত এসে রাজার কাছে হাজির। সে রাজসভায় হত্যা দিয়ে পড়ে বলল, "দোহাই মহারাজ, আর বেশি কিছু চাই না, দশটি হাজার টাকা দিলে লোকগুলো একবেলা আধপেটা খেয়ে বাঁচে।"

রাজা বললেন, "অত কষ্ট করে বেঁচেই লাভ কি? আর দশটি হাজার টাকা বুঝি বড় সহজ মনে করেছ?"

দূত বলল, "দেবতার কৃপায় কত কোটি টাকা রাজভাণ্ডারে মজুত রয়েছে, যেন টাকার সমুদ্র! তার থেকে এক-আধ ঘটি তুললেই-বা মহারাজের ক্ষতি কি?"

রাজা বললেন, "দেদার থাকলেই কি দেদার খরচ করতে হবে?"

দূত বলল, "প্রতিদিন আতরে, সুগন্ধে, পোশাকে, আমোদে, আর প্রাসাদের সাজ-সজ্জায় টাকা বেরিয়ে যায়, তারই খানিকটা পেলে লোকগুলো প্রাণে বাঁচে।"

শুনে রাজা রেগে বললেন, "ভিখারি হয়ে আবার উপদেশ শোনাতে এসেছ? আমার টাকা আমি সিদ্ধ করেই খাই আর ভাজা করেই খাই, সে আমার খুশি! তুমি বাপু আর বেশি জ্যাঠামি করলে শেষে বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং এই বেলা মানে মানে সরে পড়।"

দূত বেগতিক দেখে সরে পড়ল।

রাজা হেসে বললেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দুশো পাঁচশো হত, তবু নাহয় বুঝতাম; দারোয়ানগুলোর খোরাক থেকে দু-চারদিন কিছু কেটে রাখলেই টাকাটা উঠে যেত। কিন্তু তাতে তো ওদের পেট ভরবে না, একেবারে দশ হাজার টাকা হেঁকে বসল! ছোটলোকের একশেষ!"

শুনে পাত্র-মিত্র সবাই মিলে 'হুঁ-হুঁ' করল, কিন্তু মনে মনে সবাই বলল—"ছি ছি, কাজটা অতি খারাপ হল!"

দিন দুই বাদে কোথা থেকে এক বুড়ো সন্ন্যাসী এসে রাজসভায় হাজির; সন্ন্যাসী এসেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "দাতাকর্ণ মহারাজ! ফকিরের ভিক্ষা পূর্ণ করতে হবে।"

রাজা বললেন, "ভিক্ষার বহরটা আগে শুনি। কিছু কমসম করে বললে হয়তো-বা পেতেও পারেন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আমি ফকির মানুষ, আমার বেশি দিয়ে দরকার কি? আমি অতি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য ভিক্ষা একটি মাস ধরে প্রতিদিন রাজভাণ্ডারে পেতে চাই। আমার ভিক্ষা নেবার নিয়ম এই—প্রথম দিন যা নিই, দ্বিতীয় দিন নিই তার দ্বিগুণ, তৃতীয় দিনে তারও দ্বিগুণ, আবার চতুর্থ দিনে তৃতীয় দিনের দ্বিগুণ। এমনি করে প্রতিদিন দ্বিগুণ করে নিই, এই আমার ভিক্ষার রীতি।"

রাজা বললেন, "তা তো বেশ বুঝলাম। কিন্তু প্রথম দিন কত চান সেইটাই হল আসল কথা। দু-চার টাকায় পেট ভরে তো ভালো কথা, নইলে একেবারে বিশ-পঞ্চাশ হেঁকে বসলে সে যে অনেক টাকার মামলায় গিয়ে পড়তে হবে।"

সন্ন্যাসী একগাল হেসে বললেন, "মহারাজ, ফকিরের কি লোভ থাকে? আমি বিশ পঞ্চাশও চাই নে, দু-চার টাকাও চাই নে। আজ আমায় একটি পয়সা দিন, তারপর উনত্রিশ দিন দ্বিগুণ করে দেবার হুকুম দিন।"

শুনে রাজা মন্ত্রী পাত্র-মিত্র সবাই প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তখনি চটপট হুকুম হয়ে গেল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের হিসাবমত রাজভাণ্ডার থেকে এক মাস তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া হোক। সন্ন্যাসী ঠাকুর মহারাজের জয়-জয়কার করে বাড়ি ফিরলেন।

রাজার হুকুমমত রাজ-ভাণ্ডারী প্রতিদিন হিসাব করে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেয়। এমনি করে দুদিন যায় দশদিন যায়। দু সপ্তাহ ভিক্ষা দেবার পর ভাণ্ডারী হিসাব করে দেখল ভিক্ষাতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখে তার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে

লাগল। রাজামশাই তো কখনো এত টাকা দান করেন না!. সে গিয়ে মন্ত্রীকে খবর দিল।

মন্ত্রী বললেন, "তাই তো হে, এটা তো আগে খেয়াল হয় নি। তা এখন তো আর উপায় নাই, মহারাজের হুকুম নড়চড় হতে পারে না!"

তারপর আবার কয়েকদিন গেল। ভাণ্ডারী আবার মহাব্যস্ত হয়ে মন্ত্রীর কাছে হিসাব শোনাতে চলল। হিসাব শুনে মন্ত্রীমশায়ের মুখের তালু শুকিয়ে গেল।

তিনি ঘাম মুছে, মাথা চুলকিয়ে, দাড়ি হাতড়িয়ে বললেন, "বল কি হে। এখনি এত? তা হলে মাসের শেষে কত দাঁড়াবে?"

ভাণ্ডারী বলল, "আজ্ঞে তা তো হিসাব করা হয় নি!"

মন্ত্রী বললেন, "দৌড়ে যাও, এখনি খাজাঞ্চিকে দিয়ে একটা পুরো হিসাব করিয়ে আন।"

ভা ডারী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলল; মন্ত্রীমশাই মাথায় বরফ জলের পট্টি দিয়ে ঘন ঘন হাওয়া খেতে লাগলেন।

আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ভাণ্ডারী কাঁপতে কাঁপতে হিসাব নিয়ে এসে হাজির।

মন্ত্রী বললেন, "সবসুদ্ধ কত হয়?"

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে, এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো পনের টাকা পনের আনা তিন পয়সা।" মন্ত্রী চটে গিয়ে বললেন, "তামাশা করছ নাকি?" ভাণ্ডারী বলল, "আজ্ঞে তামাশা করব কেন? আপনিই হিসাবটা দেখে নিন!"

১ম দিন—	‹৫	১৬শ দিন—	৫১২৲
২য় দিন—	‹১০	১৭শ দিন—	১,০২৪৲
৩য় দিন—	/০	১৮শ দিন—	২,০৪৮৲
৪র্থ দিন—	৵০	১৯শ দিন—	৪,০৯৬৲
৫ম দিন—	।০	২০শ দিন—	৮,১৯২৲
৬ষ্ঠ দিন—	॥০	২১শ দিন—	১৬,৩৮৪৲
৭ম দিন—	১৲	২২শ দিন—	৩২,৭৬৮৲
৮ম দিন—	২৲	২৩শ দিন—	৬৫,৫৩৬৲
৯ম দিন—	৪৲	২৪শ দিন—	১,৩১,০৭২৲
১০ম দিন—	৮৲	২৫শ দিন—	২,৬২,১৪৪৲
১১শ দিন—	১৬৲	২৬শ দিন—	৫,২৪,২৮৮৲
১২শ দিন—	৩২৲	২৭শ দিন—	১০,৪৮,৫৭৬৲
১৩শ দিন—	৬৪৲	২৮শ দিন—	২০,৯৭,১৫২৲
১৪শ দিন—	১২৮৲	২৯শ দিন—	৪১,৯৪,৩০৪৲
১৫শ দিন—	২৫৬৲	৩০শ দিন—	৮৩,৮৮,৬০৮৲
		মোট	১,৬৭,৭৭,২১৫৸৶১৫

এই বলে সে হিসাবের কাগজখানা মন্ত্রীর হাতে দিল। মন্ত্রীমশাই হিসাব

পড়ে, চোখ উলটিয়ে মূর্ছা যান আর কি! সবাই ধরাধরি করে অনেক কষ্টে তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে হাজির করল।

রাজা বললেন, "ব্যাপার কি?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, রাজকোষের প্রায় দু কোটি টাকা লোকসান হতে যাচ্ছে!" রাজা বললেন, "সে কিরকম?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে যে ভিক্ষা দেবার হুকুম দিয়েছেন, এখন দেখছি তাতে ঠাকুর রাজভাণ্ডারের প্রায় দু কোটি টাকা বের করে নেবার ফিকির করেছে।"

রাজা বললেন, "এত টাকা দেবার তো হুকুম হয় নি! তবে এরকম বে-হুকুম কাজ করছে কেন? বোলাও ভাণ্ডারীকো!"

মন্ত্রী বললেন, "আজ্ঞে, সমস্তই হুকুমমত হয়েছে! এই দেখুন না দানের হিসাব।"

রাজামশাই একবার দেখলেন, দুবার দেখলেন, তারপর ধড়্ফড়্ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর অনেক কষ্টে তাঁর জ্ঞান হলে পর লোকজন ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডেকে আনল।

ঠাকুর আসতেই রাজামশাই কেঁদে তাঁর পায়ে পড়লেন। বললেন, "দোহাই ঠাকুর, আমায় ধনে-প্রাণে মারবেন না। যা হয় একটা রফা করে আমার কথা আমায় ফিরিয়ে নিতে দিন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাজ্যের লোক দুর্ভিক্ষে মরে, তাদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। সেই টাকা নগদ হাতে হাতে পেলে আমার ভিক্ষা পূর্ণ হল মনে করব।"

রাজা বললেন, "সেদিন একজন এসেছিল, সে বলছিল দশ হাজার হলেই চলবে!"

সন্ন্যাসী বললেন, "আজ আমি বলছি পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম হলেও চলবে না!"

রাজা কাঁদলেন, মন্ত্রী কাঁদলেন, উজির-নাজির সবাই কাঁদল। চোখের জলে ঘর ভেসে গেল, কিন্তু ঠাকুরের কথা যেমন ছিল তেমনি রইল। শেষে অগত্যা রাজ-ভাণ্ডার থেকে পঞ্চাশটি হাজার টাকা গুণে ঠাকুরের সঙ্গে দিয়ে রাজামশায় নিষ্কৃতি পেলেন।

দেশময় রটে গেল, দুর্ভিক্ষে রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করা হয়েছে। সবাই বললে, "দাতাকর্ণ মহারাজ!"

সন্দেশ—১৩২৯

এক বছরের রাজা

এক ছিলেন সওদাগর—তাঁর একটি সামান্য ক্রীতদাস তাঁর একমাত্র ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়। সওদাগর খুশি হয়ে তাকে মুক্তি তো দিলেনই, তা ছাড়া জাহাজ বোঝাই করে নানারকম বাণিজ্যের জিনিস তাকে বকশিশ দিয়ে বললেন, "সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাও—এই-সব জিনিস বেচে যা টাকা পাবে, সবই তোমার।" ক্রীতদাস মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে রওনা হল বাণিজ্য করতে।

কিন্তু বাণিজ্য করা আর হল না। সমুদ্রের মাঝখানে তুফান উঠে জাহাজটিকে ভেঙেচুরে জিনিসপত্র লোকজন কোথায় যে ভাসিয়ে নিল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ক্রীতদাসটি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেয়ে, একটা দ্বীপের চড়ায় এসে ঠেকল। সেখানে ডাঙায় উঠে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই, তার সঙ্গের লোকজন কেউ নেই। তখন সে হতাশ হয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়ল। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন সে উঠে দ্বীপের ভিতর দিকে যেতে লাগল। সেখানে বড়-বড় গাছের বন—তারপর প্রকাণ্ড মাঠ, আর তারই ঠিক মাঝখানে চমৎকার শহর। শহরের ফটক দিয়ে মশাল হাতে মেলাই লোক বার হচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই সেই লোকেরা চিৎকার ক'রে বলল, "মহারাজের শুভাগমন হোক। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।" তারপর সবাই তাকে খাতির ক'রে জমকালো গাড়িতে চড়িয়ে, প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানের চাকরগুলো তাড়াতাড়ি রাজ-পোশাক এনে তাকে সাজিয়ে দিল।

সবাই বলছে, 'মহারাজ', 'মহারাজ', হুকুমমাত্র সবাই চটপট কাজ করছে, এ-সব দেখেশুনে সে বেচারা একেবারে অবাক। সে ভাবল সবই বুঝি স্বপ্ন—বুঝি তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে তাই এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারল সে জেগেই আছে আর দিব্যি জ্ঞানও রয়েছে আর যা যা ঘটছে সব সত্যিই। তখন সে লোকদের বলল, "এ কিরকম হচ্ছে বল তো? আমি তো এর কিছুই বুঝছি না। তোমরা কেনই-বা আমায় 'মহারাজ' বলছ আর কেনই-বা এমন সম্মান দেখাচ্ছ?" তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো উঠে বলল, "মহারাজ, আমরা কেউ মানুষ নই—আমরা সকলেই প্রেতগন্ধর্ব—যদিও আমাদের চেহারা ঠিক মানুষের মতো। অনেক দিন আগে আমরা 'মানুষ রাজা' পাবার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করেছিলাম; কারণ, মানুষের মতো বুদ্ধিমান আর কে আছে? সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মানুষ রাজার অভাব হয় নি। প্রতি বৎসরে একটি করে মানুষ এইখানে আসে, আর আমরা তাকে এক বৎসরের জন্য রাজা করি। তার রাজত্ব শুধু ঐ এক বৎসরের জন্যই। বৎসর শেষ হলেই তাকে সব ছাড়তে হয়। তাকে জাহাজে করে সেই মরুভূমির দেশে রেখে আসা হয়, যেখানে সামান্য ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না—আর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বালি না খুঁড়লে এক ঘটি জলও মেলে না। তারপর আবার নূতন রাজা আসে—এইরকমে বৎসরের পর বৎসর আমাদের চলে আসছে।"

তখন দাসরাজা বললেন, "আচ্ছা বল তো—এর আগে তোমাদের রাজারা

কিরকম স্বভাবের লোক ছিলেন?" বুড়ো বলল, "তাঁরা সবাই ছিলেন অসাবধান আর খামখেয়ালি। সারাটি বছর সবাই শুধু জাঁকজমকে আমোদে-আহ্লাদে দিন কাটাতেন—বছর শেষে কি হবে কেউ সে কথা ভাবতেন না।"

নতুন রাজা মন দিয়ে সব শুনলেন, বছরের শেষে তাঁর কি হবে এই কথা ভেবে ক'দিন তাঁর ঘুম হল না!

তারপর সে দেশের সকলের চেয়ে জ্ঞানী আর পণ্ডিত যারা, তাদের ডেকে আনা হল, আর রাজা তাদের কাছে মিনতি করে বললেন, "আপনারা আমাকে উপদেশ দিন—যাতে বছর শেষে সেই সর্বনেশে দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।"

তখন সবচেয়ে প্রবীণ বৃদ্ধ যে, সে বলল, "মহারাজ, শূন্য হাতে আপনি এসেছিলেন, শূন্য হাতেই আবার সেই দেশে যেতে হবে—কিন্তু এই এক বছর আপনি আমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই করাতে পারেন। আমি বলি—এই বেলা রাজ্যের ওস্তাদ লোকদের সেই দেশে পাঠিয়ে সেখানে বাড়ি ক'রে, বাগান ক'রে, চাষবাসের ব্যবস্থা ক'রে চারিদিক সুন্দর করে রাখুন। ততদিনে ফলে ফুলে দেশ ভরে উঠবে, সেখানে লোকের যাতায়াত হবে। আপনার এখানকার রাজত্ব শেষ হতেই সেখানে আপনি সুখে রাজত্ব করবেন। বৎসর তো দেখতে দেখতে চলে যাবে, অথচ কাজ আপনার ঢের; কাজেই বলি, এইবেলা খেটে-খুটে সব ঠিক ক'রে নিন।" রাজা তখনই হুকুম দিয়ে লোক-লস্কর, জিনিসপত্র, গাছের চারা, ফলের বীজ, আর বড়-বড় কলকব্জা পাঠিয়ে, আগে থেকে সেই মরুভূমিকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন।

তারপর বছর যখন ফুরিয়ে এল, তখন প্রজারা তাঁর ছত্র মুকুট রাজদণ্ড সব ফিরিয়ে নিল, তাঁর রাজার পোশাক ছাড়িয়ে এক বছর আগেকার সেই সামান্য কাপড় পরিয়ে, তাঁকে জাহাজে তুলে সেই মরুভূমির দেশে রেখে এল। কিন্তু সে দেশ আর এখন মরুভূমি নেই—চারদিকে ঘর বাড়ি, পথ ঘাট, পুকুর বাগান। সে দেশ এখন লোকে লোকারণ্য। তারা সবাই এসে ফুর্তি ক'রে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এক বছরের রাজা সেখানে জন্ম ভরে রাজত্ব করতে লাগলেন।

সন্দেশ—১৩২৪

কার দোষ

এক রাজা তাঁর বাড়ির পাশে একটা প্রকাণ্ড উঁচু দেয়াল তুলবার হুকুম দিলেন। দেয়ালটি কিন্তু শেষ হওয়ামাত্র হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। রাজা তো রেগেই অস্থির! তখনই হুকুম দিলেন, "বেঁধে আনো রাজমিস্ত্রিকে! এখনই তাকে আচ্ছা করে ঠ্যাঙা দেওয়া হোক আর কয়েদ করা হোক।

রাজমিস্ত্রিকে ধরে আনা হতেই সে বলল, "মহারাজ! আমার কি দোষ? সুরকির মসলা খারাপ ছিল, আমি কি করব?"

তখনই লোক গিয়ে সুরকিওয়ালাকে ধরে নিয়ে এল। সে বলল, "দোহাই

হুজুর! আমার কোন দোষ নেই। আমি তো মসলা ঠিক করে মেশাতে কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু মেশাবার পাত্রটা এমন বিশ্রী করে বানিয়েছে কুমোরে, যে, সেটা দিয়ে কিছুতেই ভালো করে মেশানো যায় না।"

অমনি আবার লোক ছুটলো কুমোরকে ধরে আনতে। কুমোর এসে কেঁদে বলল, "মহারাজ, আমার কি দোষ? একে তো তাড়াতাড়ি মসলার গামলা গড়তে দেওয়া হয়েছিল, তার ওপর আবার গড়বার সময়ে একটি মেয়ে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে যেতে-যেতে আমাকে এমনি চমকে দিল, যে পাত্রটার গড়নই খারাপ হয়ে গেল।"

মেয়েটিকে তখনই রাজার লোকেরা গিয়ে ধরে নিয়ে এলো। সে বলল, "মহারাজ! আমার কোনই দোষ নেই! ও বাড়ির সামনে দিয়ে যাবারও আমার কোন দরকার ছিল না। একজন স্যাকরাকে আমার কানের দুল গড়তে দিয়েছিলাম। বাড়িতে এসে দুলজোড়া দিয়ে যাবার কথা ছিল তার। কিন্তু সেদিন আমার চলে যাবার কথা; তবুও কিছুতে সে দুল দিল না দেখে আমাকে তার বাড়িতে ছুটে যেতে হয়েছিল। কুমোরকে চমকে দেবার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না আমার।"

রাজার হুকুমে স্যাকরাকে ধরে আনা হল। সে বলল, "মহারাজ, আমার কি দোষ বলুন? মুক্তোওয়ালা মুক্তো দিয়ে যায় নি সময় মতো—সেজন্যই তো আমার দুল গড়তে দেরি হল।"

মুক্তোওয়ালাকে ধরে আনা হল; সে বলল, "মহারাজ! আমি তো মুক্তো পাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ডুবুরিতে ভালো মুক্তো তোলে নি, তার আর আমি কি করতে পারি বলুন?"

তখন ডুবুরিকে ডাকা হল। সে এসে বলল, "মহারাজ! আমার দোষ এর মধ্যে কি হল বলুন? শুক্তিতে যদি ভালো মুক্তো না জন্মায় তো আমি আর কোত্থেকে আনি?"

তখন সকলে মাথা চুলকোতে আরম্ভ করল। শুক্তি তো সমুদ্রের তলায়! কাজেই শেষ পর্যন্ত আর কাউকে শাস্তি দেওয়াই হল না!

সন্দেশ—১৩২৮

দুই বন্ধু

এক ছিল মহাজন, আর এক ছিল সওদাগর। দুজনে ভারি ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বলল, "ভাই, ক'দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি; আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখতে পারবে?" সওদাগর বলল, "পারব না কেন? তবে কি জান, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে আর বলবার কি আছে, আমার ঐ সিন্ধুকটি খুলে তুমি নিজেই তার মধ্যে তোমার টাকাটা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না।" তখন মহাজন তার

থলে ভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্ধুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে গেল।

এদিকে হয়েছে কি, বন্ধু যাবার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন উসখুস করছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাবছে আর মনে হচ্ছে যে বন্ধু না জানি কত কি রেখে গেছে! একবার খুলে দেখতে দোষ কি? এই ভেবে সে সিন্ধুকের ভেতর উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখল—থলি ভরা চকচকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হল—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতগুলো পয়সা ভরে থলিটাকে বন্ধ ক'রে রাখল।

দশদিন পরে তার বন্ধু যখন ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্পসল্প করল, কিন্তু তার মনটা কেবলই বলতে লাগল, 'কাজটা ভালো হয় নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস করে টাকাটা রাখল, তাকে ঠকানো উচিত হয় নি।' এ কথা সে কথার পর মহাজন বলল, "তাহলে বন্ধু, আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে?" সওদাগর বললে, "হ্যাঁ বন্ধু, সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে—আমি থলিটা আর সরাই নি।" বন্ধু তখন সিন্ধুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল। কিন্তু কি সর্বনাশ! থলি ভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায়? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বলল, "ওকি বন্ধু! মাটিতে বসলে কেন?" বন্ধু বলল, "ভাই, সর্বনাশ হয়েছে! আমার থলিভরা মোহর ছিল—এখন দেখছি একটাও মোহর নাই, কেবল কতগুলো পয়সা!" সওদাগর বলল, "তাও কি হয়? মোহর কখনো পয়সা হয়ে যায়?" সওদাগর চেষ্টা করছে এরকম ভাব দেখাতে যেন সে কতই আশ্চর্য হয়েছে; কিন্তু তার বন্ধু দেখল তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকি রইল না—তবু সে কোনরকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বলল, "আমি তো মোহর মনে করেই রেখেছিলাম—এখন দেখছি কোথাও কোন গোল হয়ে থাকবে। যাক যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই।" এই বলে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি বাড়িতে নিয়ে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'মাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়ি এসে বলল, "বন্ধু আজ আমার বাড়িতে পিঠে হচ্ছে—বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও!" বিকাল-বেলা সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল, আর বলল, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব।" মহাজন করল কি, ছেলেটার পোশাক বদলিয়ে তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখল—আর একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মতো করে বলল, "ভাই! একটা বড় মুশকিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস-নুদুস ফুটফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখছি কিরকম হয়ে গেছে—ঠিক যেন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! কি করা যায় বল তো বন্ধু!" ব্যাপার দেখে সওদাগরের তো চক্ষুস্থির! সে বলল, "কি পাগলের মতো বকছ? মানুষ কখনো বাঁদর হয়ে যায়?" মহাজন অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো বলল, "কি

জানি ভাই! আজকাল কি-সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, কিছু বুঝবার জো নেই। এই দেখ না সেদিন আমার সোনার মোহরগুলো খামখা বদলে সব তামার পয়সা হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ করতে। কাজির হুকুমে চার-চার প্যায়দা এসে মহাজনকে পাকড়াও করে কাজির সামনে হাজির করল। কাজি বললেন, "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কি করেছ?" শুনে চোখ দুটো গোল করে মস্ত বড় হাঁ করে মহাজন বলল, "আমি? আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ আমি কি অত সব বুঝতে পারি? হুজুর! ওর বাড়িতে মোহর রাখলাম, দশদিনে সব পয়সা হয়ে গেল। আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ি আসতে না আসতেই ল্যাজ-ট্যাজ গজিয়ে দস্তুরমত বাঁদর হয়ে উঠেছে। কিরকম যে হচ্ছে—আমার বোধ হয় সব ভূতুড়ে কাণ্ড।" এই ব'লে সে কাজিকে লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকির ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ঝাড়িয়ে সব সায়েস্তা করছি। তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও—আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর কাছেই রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয় তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি আছে। সাবধান! তা হলে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলে তো মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সবসুদ্ধ মেরে সাবাড় করব।"

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। ভোর না হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভরে মহাজনের বাড়ি গিয়ে বলছে, "বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য দেখে যাও! তোমার পয়সাগুলো আবার সব মোহর হয়েছে।" মহাজন বলল, "তাই নাকি? কি আশ্চর্য এদিকে সেই বাঁদরটাও তোমার খোকা হয়ে গেছে।"

তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বলল, "দেখ্ জোচ্চোর! ফের আমায় 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলবি তো মেরে তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেব।"

সন্দেশ—১৩২৫

বুদ্ধিমান শিষ্য

এক মুনি, তাঁর অনেক শিষ্য। মুনিঠাকুর তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে এক মস্ত যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সে যজ্ঞ এর আগে মুনির আশ্রমে আর হয় নি। তাই তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, "আমি এক যজ্ঞের আয়োজন করেছি, সে যজ্ঞ তোমরা হয়তো আর কোথাও দেখবার সুযোগ পাবে না, কাজেই যজ্ঞের সব কাজ-কর্ম বিধি-ব্যবস্থা বেশ মন দিয়ে দেখো। নিজের চোখে সব ভালো করে না দেখলে শুধু পুঁথি পড়ে এ যজ্ঞ করা সম্ভব হবে না।"

মুনিঠাকুরের আশ্রমে বেড়ালের ভারি উৎপাত; যজ্ঞের আয়োজন সব ঠিক হচ্ছে, এর মধ্যে বেড়ালগুলো এসে জ্বালাতন আরম্ভ করেছে—এটাতে মুখ দেয়, ওটা উলটে ফেলে, কিছুতেই তাদের সামলান যায় না। তখন মুনিঠাকুর রেগে বললেন, "বেড়াল-গুলোকে ধরে ঐ কোনায় বেঁধে রেখে দাও তো।" অমনি নয়টা বেড়ালকে ধরে সভার এক পাশে খোঁটায় বেঁধে রাখা হল। তারপর ঠিক সময় বুঝে যজ্ঞ আরম্ভ হল। শিষ্যেরা সব সভার সাজসজ্জা, আয়োজন, যজ্ঞের সব ক্রিয়া-কান্ড, মন্ত্রোচ্চারণের নিয়ম ইত্যাদি মন দিয়ে দেখতে আর শুনতে লাগল। নির্বিঘ্নে অতি সুন্দররূপে মুনিঠাকুরের যজ্ঞ সম্পন্ন হল।

কিছুকাল পরে শিষ্যদের মধ্যে একজনের বাবা মারা গেলেন। শিষ্যের ভারি ইচ্ছা হল তার পিতৃশ্রাদ্ধে সেও ঐরকম সুন্দর যজ্ঞের আয়োজন করে। সে গিয়ে তার গুরুকে ধরল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, সব আয়োজন করতে থাক, আমি এসে যজ্ঞের পুরোহিত হব।" শিষ্য মহা সন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞের সব ঠিকঠাক করতে লাগল।

ক্রমে যজ্ঞের দিন উপস্থিত। মুনিঠাকুর সশিষ্য শ্রাদ্ধের সভায় উপস্থিত; ঠিক নিয়ম মতো যজ্ঞের সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু শিষ্যটি তখনো সভাস্থলে এসে বসছে না, কেবল ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এদিকে যজ্ঞের সময় প্রায় উপস্থিত দেখে মুনিঠাকুরও ক্রমে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি শিষ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর বিলম্ব কেন? সবই তো প্রস্তুত, যজ্ঞের সময়ও উপস্থিত, এই বেলা সভায় এস।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে একটা আয়োজন বাকি রয়ে গেছে, সেইটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছি।" মুনি বললেন, "কই, কিছুরই তো অভাব দেখছি না।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে চারটে বেড়াল কম পড়েছে।" মুনি বললেন, "সে কিরকম?" শিষ্য মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ঐ যে আপনার যজ্ঞে দেখলাম ঈশান কোণে নয়টা বেড়াল বাঁধা রয়েছে। আমাদের এ গ্রামে অনেক খুঁজে পাঁচটার বেশি পাওয়াই গেল না, কাজেই আর বাকি চারটার জন্য পাশের গ্রামে লোক গিয়েছে; তারা এই এসে পড়ল বলে।" শুনে গুরুর তো চক্ষুস্থির! তিনি বললেন, "আরে বুদ্ধিমান! কোন্‌টা যজ্ঞের অঙ্গ আর কোন্‌টা নয় তাও বিচার করতে শেখ নি? আশ্রমের বেড়াল-গুলি উৎপাত করছিল তাই বেঁধে রেখেছিলাম। তোমার এখানে কোন উৎপাত ছিল না, তুমি আবার গায়ে পড়ে উৎপাত সংগ্রহ করতে গিয়েছ? বসে পড়, বসে পড়, আর বেড়াল ধরে কাজ নেই। এখন যজ্ঞটা নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে যাক্‌।"

শিষ্য নিজের আহম্মকিতে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুতভাবে সভার মধ্যে বসে পড়ল।

সন্দেশ—১৩২৯

বুদ্ধিমান শিষ্য

টোলের যিনি গুরু তাঁর অনেক শিষ্য। সবাই লেখে, সবাই পড়ে কেবল এক-জনের আর কিছুতেই কিছু হয় না। বছরের পর বছর গেল, তার বিদ্যাও হল না, বুদ্ধিও খুলল না। সকলেই বলে—"ওটা মূর্খ, ওটা নির্বোধ, ওটার আর হবে কি? ওটা যেমন বোকা তেমনিই থাকবে।" শেষটায় গুরু পর্যন্ত তার আশা ছেড়ে দিলেন। বেচারার কিন্তু একটি গুণ সকলেই স্বীকার করে—সে প্রাণপণে গুরুর সেবা করতে ত্রুটি করে না।

একদিন গুরু শুয়ে আছেন, মূর্খ শিষ্য বসে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছে, গুরু বললেন, "তুমি ঘুমতে যাবার আগে খাটিয়াটা ঠিক করে দিও। পায়াগুলো অসমান আছে।" শিষ্য উঠবার সময় দেখল, একদিকের পায়াটা একেবারে ভাঙা। এখন উপায়? বেচারা খাটের সেই দিকটা নিজের হাঁটুর উপর রেখে সারারাত জেগে কাটাল। সকালে গুরু ঘুম থেকে উঠে ব্যাপার দেখে অবাক!

গুরুর মনে ভারি দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, 'আহা বেচারা এমন করে আমার সেবা করে, এর কি কোনরকম বিদ্যাবুদ্ধি হবার উপায় নাই? পুঁথি পড়ে বিদ্যালাভ সকলের হয় না, কিন্তু দেখে শুনে তো কত লোকে কত কি শেখে? দেখা যাক, সেই ভাবে একে কিছু শেখান যায় কি না।' তিনি শিষ্যকে ডেকে বললেন, "বৎস, এখন থেকে তুমি যেখানেই যাও, ভালো করে সব দেখবে—আর কি দেখলে, কি শুনলে, কি করলে, সব আমাকে এসে বলবে।" শিষ্য বলল, "আজ্ঞে, তা বলব।"

তারপর কিছুদিন যায়, শিষ্য একদিন জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে একটা সাপ দেখতে পেল। সে টোলে ফিরে এসে গুরুকে বলল, "আজ একটা সাপ দেখেছি।" গুরু উৎসাহ ক'রে বললেন, "বেশ বেশ। বল তো সাপটা কিরকম?" শিষ্য বললে, "আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" শুনে গুরু বেজায় খুশি হয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। অনেকটা লাঙ্গলের ডান্ডার মতোই তো। সরু, লম্বা, বাঁকা আর কালো মতন। তুমি এমনি করে সব জিনিস মন দিয়ে দেখতে শেখ, আর ভালো করে বর্ণনা করতে শেখ, তাহলেই তোমার বুদ্ধি খুলবে।"

শিষ্য তো আহ্লাদে আটখানা। সে ভাবলে, 'তবে যে লোকে বলে আমার বুদ্ধি নেই।' আর-একদিন সে বনের মধ্যে গিয়ে ফিরে এসে গুরুকে বলল, "আজ একটা হাতি দেখলাম।" গুরু বললেন, "হাতিটা কিরকম?" শিষ্য বললে, "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" গুরু ভাবলেন, 'হাতিটাকে লাঙ্গলদণ্ডের মতো বলছে কেন? ও বোধহয় শুঁড়টাকেই ভালো করে দেখেছে। তা তো হবেই—শুঁড়টাই হল হাতির আসল বিশেষত্ব কিনা। ও শুধু হাতি দেখেছে তা নয়, হাতির মধ্যে সবচাইতে যেটা দেখবার জিনিস, সেইটাই আরো বিশেষ করে দেখেছে।' সুতরাং তিনি শিষ্যকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, "ঠিক, ঠিক, হাতির শুঁড়টা দেখতে অনেকটা লাঙ্গলের ঈষের মতোই তো।" শিষ্য ভাবলে, 'গুরুর তাক লেগে গেছে—না জানি আমি কি পণ্ডিত হলাম রে!'

তারপর শিষ্যরা একদিন গেছে নিমন্ত্রণ খেতে। মূর্খও সঙ্গে গিয়েছে। খেয়ে-

দেয়ে ফিরে আসতেই গুরু বললেন, "কি করে এলে?" শিষ্য বললে, "দুধ দিয়ে, দৈ দিয়ে গুড় মেখে খেলাম।" গুরু বললেন, "বেশ করেছ। বলতো, দৈ দুধ কিরকম?" শিষ্য এক গাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।"

গুরুর তো চক্ষুস্থির! তিনি বললেন, "ও মূর্খ! এই বুঝি তোর বিদ্যে! আমি ভাবছি যে তুই বুঝি বুদ্ধি খাটিয়ে সব জবাব দিচ্ছিস। তুই লাঙ্গলও দেখেছিস, দুধ দৈও খেয়েছিস, তবে কোন্ আক্কেলে বললি যে লাঙ্গলের ঈষের মতো? দূর্ দূর্ দূর্! কোনদিন তোর কিচ্ছু হবে না।"

শিষ্য বেচারা হঠাৎ এমন তাড়া খেয়ে একেবারেই দমে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগল, 'এদের কিছুই বোঝা গেল না। ঐ কথাটাই তো কদিন ধরে বলে আসছি, শুনে গুরু রোজই তো খুশি হয়। তাহলে আজকে কেন বলছে 'দূর দূর'। দুত্তারি। এদের কথার কিছু ঠিক নেই।'

সন্দেশ · ১৩২৬

ঠুকে মারি আর মুখে মারি

মুখে-মারি পালোয়ানের বেজায় নাম—তার মতো পালোয়ান নাকি আর নাই। ঠুকে-মারি সত্যিকারের মস্ত পালোয়ান, মুখে-মারির নাম শুনে সে হিংসায় আর বাঁচে না। শেষে একদিন ঠুকে-মারি আর থাকতে না পেরে, কম্বলে নব্বুই মণ আটা বেঁধে নিয়ে, সেই কম্বল কাঁধে ফেলে মুখে মারির বাড়ি রওয়ানা হলো।

পথে এক জায়গায় বড্ড পিপাসা আর খিদে পাওয়ায় ঠুকে-মারি কম্বলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা ডোবার ধারে বিশ্রাম করতে বসল। তারপর চোঁ-চোঁ করে এক বিষম লম্বা চুমুক দিয়ে ডোবার অর্ধেক জল খেয়ে বাকি অর্ধেকটায় সেই আটা মেখে নিয়ে সেটাও সে খেয়ে ফেলল। শেষে মাটিতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

সেই ডোবাতে একটা হাতি রোজ জল খেতে আসত। সেদিনও সে জল খেতে এল; কিন্তু ডোবা খালি দেখে তার ভারি রাগ হলো। পাশেই একটা মানুষ শুয়ে আছে দেখে সে তার মাথায় দিল গোদা পায়ের এক লাথি। ঠুকে-মারি বলল, "ওরে, মাথা টিপেই দিবি যদি, একটু ভালো করে দেনা বাপু!" হাতির তখন আরো বেশি রাগ হল। সে শুঁড়ে করে ঠুকে-মারিকে তুলে আছাড় মারতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঠুকে-মারি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাতিমশাইকে থলের মধ্যে পুরে রওয়ানা হ'ল।

খানিক দূরে গিয়ে সে মুখে মারির বাড়িতে এসে হাজির হ'ল আর বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগল, "কই হে মুখে-মারি! ভারি নাকি পালোয়ান তুমি! সাহস থাকে তো লড় না এসে!" শুনে মুখে-মারি তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুখে মারির বৌ বলল, "কর্তা আজ বাড়ি নেই। কোথায় যেন পাহাড় ঠেলতে গিয়েছেন।" ঠুকে-মারি বলল, "এটা তাকে দিয়ে ব'লো যে এ

মালিক তার সঙ্গে লড়তে চায়।" এই বলে সে হাতিটাকে ছুঁড়ে তাদের উঠানে ফেলে দিল।

ব্যাপার দেখে বাড়ির লোকের চক্ষুস্থির! কিন্তু মুখে-মারির সেয়ানা খোকা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "ও মাগো! দুষ্টু লোকটা আমার দিকে একটা ইঁদুর ফেলেছে! কি করি বল তো?" তার মা বলল, "কিছু ভয় নেই। তোমার বাবা এসে ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন। এখন ইঁদুরটাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।"

এই কথা বলামাত্র ঝাঁটার ঝট্‌পট্ শব্দ হ'লো আর ছেলেটা বলল, "ঐ যা! ইঁদুরটা নর্দমায় পড়ে গেল।" ঠুকে-মারি ভাবল, 'যার খোকা এরকম, সে নিশ্চয়ই আমার উপযুক্ত জুড়ি হবে।'

বাড়ির সামনে একটা তালগাছ ছিল, সেইটা উপ্‌ড়ে নিয়ে ঠুকে-মারি হেঁকে বলল, "ওরে খোকা, তোর বাবাকে বলিস যে আমার একটা ছড়ির দরকার ছিল, তাই এটা নিয়ে চললাম।" খোকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "ওমা দেখেছ? ঐ দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।" খড়্‌কে কাঠি শুনে ঠুকে-মারির চোখ দুটো আলুর মতো বড় হয়ে উঠল। সে ভাবল, 'দরকার নেই বাপু, ও-সব লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে!' সে তখনই হন্ হন্ করে সে গ্রাম ছেড়ে নিজের গ্রামে পালিয়ে গেল।

মুখে-মারি বাড়িতে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে! লোকটা গেল কই?" খোকা বলল, "সে ঐ তালগাছটা নিয়ে পালিয়ে গেল।" "তুই তাকে কিছু বললি না?" "নিয়ে গেল, তা আমি আর তাকে বলব কি?" এই কথা শুনে মুখে-মারি ভয়ানক রেগে বলল, "হতভাগা! তুই আমার ছেলে হয়ে আমার নাম ডোবালি! দরকার হলে দুটো কথা বলতে পারিস্ নে? যা! আজই তোকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব।" এই বলে সে অপদার্থ ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দিতে চলল।

কিন্তু গঙ্গা তো গ্রামের কাছে নয়—সে অনেক দূরে। মুখে-মারি হাঁটছে হাঁটছে আর ভাবছে ছেলেটা যখন কান্নাকাটি করবে, তখন তাকে বলবে, 'আচ্ছা, এবার তোকে ছেড়ে দিলাম।' কিন্তু ছেলেটা কাঁদেও না, কিছু বলেও না, সে বেশ আরামে কাঁধে চড়ে 'গঙ্গায়' চলেছে। তখন মুখে-মারি তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, "আর দেরি নেই, এই গঙ্গা এসে পড়ল বলে।" ছেলেটা চট্ করে বলে উঠল, "হ্যাঁ বাবা। বড্ড জলের ছিটা লাগছে।" শুনে মুখে-মারির চক্ষুস্থির! সে তখনই ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, "শিগ্গির বল, সত্যি করে, লোকটাকে তুই কিছু বলেছিস কি না?" ছেলে বলল, "ওকে তো আমি কিছু বলি নি। আমি মাকে চেঁচিয়ে বললাম দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল।" মুখে-মারি এক গাল হেসে তার পিঠ থাব্‌ড়ে বলল, "সাবাস্ ছেলে! বাপ্‌কা বেটা!"

সন্দেশ—১৩২৮

বোকা বুড়ি

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ি। তারা ভারি গরিব। আর বুড়ি বেজায় বোকা আর ভয়ানক বেশি কথা বলে—যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়—তার পেটে কোন কথা থাকে না।

বুড়ো একদিন তার জমি চষতে চষতে মাটির নীচে এক কলসি পেলে, সেই কলসি ভরা টাকা আর মোহর! তখন তার ভারি ভাবনা হল—এ টাকা যদি ফেলে রাখি কোন্‌দিন কে চুরি ক'রে নেবে। আর যদি টাকা বাড়ি নিয়ে যাই, বুড়ি টের পেয়ে যাবে--সে সকলের কাছে তার গল্প করবে; ক্রমে কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লে রাজার কোটাল এসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যাবে। ভেবে ভেবে সে এক ফন্দি আঁট্‌ল। সে ঠিক করল যে বুড়িকে সব কথা বলবে কিন্তু এরকম উপায় করবে যাতে বুড়ির কথা কেউ না বিশ্বাস করে।

তখন সে একটা মাছ কিনে এনে তার ক্ষেতের ধারে একটা গাছের উপর বেঁধে রাখল, আর একটা খরগোস এনে নদীর ধারে একটা গর্তের মধ্যে জাল দিয়ে জড়িয়ে রাখল। তারপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল, "একটা ভারি আশ্চর্য খবর শুনলাম—গাছের ডালে নাকি মাছ উড়ে বসে আর খরগোস নাকি জলে খেলা করে। আমাদের গণকঠাকুর বলেন—

'মৎস্য বসেন গাছে
জলে খরগোস নাচে
গুপ্ত রতন খুঁজলে পাবে খুঁড়লে তারি কাছে'।"

বুড়ি বলল, "তোমার যেমন কথা!" বুড়ো বলল, "হাঁ! এরকম নাকি সত্যি সত্যি দেখা গেছে।" এই বলে বুড়ো আবার কাজে বেরুল।

আধঘণ্টা না যেতে যেতেই বুড়ো আবার ফিরে এসে ভারি ব্যস্ত হয়ে বুড়িকে সেই টাকা পাওয়ার কথা বলল। তখন বুড়ো বুড়ি মিলে টাকা আনতে চলল। পথে যেতে যেতে বুড়ো সেই গাছতলায় এসে বলল, "গাছের উপর চকচক করছে ওটা কি?" এই বলে সে একটা ঢিল ছুঁড়তেই মাছটা পড়ে গেল। বুড়ি তো অবাক! তখন বুড়ো বলল, "নদীতে জাল ফেলেছিলাম, মাছ-টাছ পড়ল কিনা দেখে আসি।" জাল টানতেই- ওমা! খরগোস যে! তখন বুড়ো বলল, "কেমন! গণকঠাকুরের কথা আর অবিশ্বাস করবে?" তারপর টাকা নিয়ে তারা বাড়ি এল।

টাকা পেয়েই বুড়ি বলল, "ঘর করব, বাড়ি করব, গহনা বানাব, পোশাক কিনব।" বুড়ো বলল, "ব্যস্ত হ'য়ো না—কিছুদিন রয়ে সয়ে দেখ—ক্রমে সবই হবে। হঠাৎ অত কাণ্ড করলে লোকে সন্দেহ করবে যে।" কিন্তু বুড়ির তাতে মন উঠে না—সে একে বলে, ওকে বলে; শেষে একেবারে কোটালের কাছে নালিশ করে দিল। কোটালের হুকুমে বুড়োকে হাতকড়া দিয়ে হাজির করা হল।

বুড়ো সব কথা শুনে বলল, "সে কি হুজুর! আমার স্ত্রীর কি মাথার কিছু ঠিক আছে? সে তো ওরকম আবোল তাবোল কত কি বলে।" কোটাল তখন তেড়ে উঠলেন--"বটে! তুমি টাকা পেয়ে লুকিয়ে রেখেছ--আবার বুড়ির নামে দোষ দিচ্ছ?" বুড়ো বলল, "কিসের টাকা? কবে পেলাম? কোথায় পেলাম? আমি তো কিছুই জানি না।"

বুড়ি বলল, "না তুমি কিছুই জান না? সেই যেদিন গাছের ডালে মাছ বসেছিল, নদীতে জাল ফেলে খরগোস ধরলে—সেদিনের কথা তোমার মনে নেই? কচি খোকা আর কি?"

তাই শুনে সবাই হাসতে লাগল; কোটাল এক ধমক দিয়ে বুড়িকে বলল— "যা পাগলি, বাড়ি যা! ফের যদি এ-সব যা-তা বলবি তোকে আমি কয়েদ ক'রে রাখব।"

বুড়ি তখন বাড়ি ফিরে গেল। কোটালের ভয়ে সে আর কারু কাছে টাকার কথা বলত না।

সন্দেশ—১৩২২

সুদন ওঝা

সুদন ছিল ভারি গরিব, তার এক মুঠো অন্নেরও সংস্থান নাই। রোজ জুয়া খেলে লোককে ঠকিয়ে যা পায়, তাই দিয়ে কোনরকমে তার চলে যায়। যেদিন যা উপায় করে, সেইদিনই তা খরচ করে ফেলে, একটি পয়সাও হাতে রাখে না। এই-রকমে কয়েক বছর কেটে গেল; ক্রমে সুদনের জ্বালায় গ্রামের লোক অস্থির হয়ে পড়ল, পথে তাকে দেখলেই সকলে ছুটে গিয়ে ঘরে দরজা দেয়: সে এমন পাকা খেলোয়াড় যে কেউ তার সঙ্গে বাজি রেখে খেলতে চায় না।

একদিন সুদন সকাল থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু গ্রামময় ঘুরেও কাউকে দেখতে পেল না। ঘুরে ঘুরে নিরাশ হয়ে সুদন ভাবল—'শিব-মন্দিরের পুরুতঠাকুর তো মন্দিরেই থাকে—যাই, তার সঙ্গেই আজ খেলব।' এই ভেবে সুদন সেই মন্দিরে চলল। দূর থেকে সুদনকে দেখেই পুরুতঠাকুর ব্যাপার বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মন্দিরের মধ্যে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

মন্দিরের পুরুতকে না দেখতে পেয়ে সুদন একটু দমে গেল বটে, কিন্তু তখনই স্থির করল—'যাঃ—তবে আজ মহাদেবের সঙ্গেই খেলব।' তখন মূর্তির সামনে গিয়ে বলল—"ঠাকুর! সারাদিন ঘুরে ঘুরে এমন একজনকেও পেলাম না, যার সঙ্গে খেলি। রোজগারের আর কোন উপায়ও আমি জানি না, তাই এখন তোমার সঙ্গে খেলব। আমি যদি হারি, তোমার মন্দিরের জন্য খুব ভালো একটি দাসী এনে দিব; আর তুমি যদি হার, তবে তুমি আমাকে একটি সুন্দরী মেয়ে দিবে—আমি তাকে বিয়ে করব।" এই বলে সুদন মন্দিরের মধ্যেই ঘুঁটি পেতে খেলতে বসে গেল। খেলার দান ন্যায়মত দুই পক্ষেই সুদন দিচ্ছে—একবার নিজের হয়ে, একবার দেবতার হয়ে খেলছে। অনেকক্ষণ খেলার পর সুদনেরই জিত হল। তখন সে বলল—"ঠাকুর! এখন তো আমি বাজি জিতেছি, এবার পণ দাও।" পাথরের মহাদেব কোন উত্তর দিলেন না, একেবারে নির্বাক রইলেন। তা দেখে সুদনের হল রাগ! "বটে! কথায় উত্তর দাও না কেমন দেখে নেব।"—এই বলেই সে করল কি, মহাদেবের সম্মুখে যে দেবীমূর্তি ছিল সেটি তুলে নিয়েই উঠে দৌড়।

সুদনের স্পর্ধা দেখে মহাদেব তো একেবারে অবাক! তখনি ডেকে বললেন—"আরে, আরে, করিস কি? শিগ্গির দেবীকে রেখে যা। কাল ভোরবেলা যখন মন্দিরে কেউ থাকবে না, তখন আসিস, তোকে পণ দিব।" এ-কথায় সুদন দেবীকে ঠিক জায়গায় রেখে চলে গেল।

এখন হয়েছে কি, সেই রাত্রে একদল স্বর্গের অপ্সরা এল মন্দিরে পুজো করতে। পুজোর পর সকলে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলে, মহাদেব রম্ভা ছাড়া অন্য সকলকে যেতে বললেন, সকলেই চলে গেল, রইল শুধু রম্ভা। ক্রমে রাত্রি প্রভাত না হতেই সুদন এসে হাজির। মহাদেব রম্ভাকে পণস্বরূপ দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

সুদনের আহ্লাদ দেখে কে! অপ্সরা স্ত্রীকে নিয়ে অহংকারে বুক ফুলিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। সুদনের বাড়ি ছিল একটা ভাঙা কুঁড়ে, অপ্সরা মায়াবলে আশ্চর্য সুন্দর এক বাড়ি তৈরি করল। সেই বাড়িতে তারা পরম সুখে থাকতে লাগল। এই ভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল।

সপ্তাহে একদিন, রাত্রে অপ্সরাদের সকলকে ইন্দ্রের সভায় হাজির থাকতে হয়। সেই দিন উপস্থিত হলে, রম্ভা যখন ইন্দ্রের সভায় যেতে চাইল, তখন সুদন বললে—"আমাকে সঙ্গে না নিলে কিছুতেই যেতে দিব না।" মহা মুশকিল! ইন্দ্রের সভায় না গেলেও সর্বনাশ—দেবতাদের নাচ গান সব বন্ধ হবে—আবার সুদনও কিছুতেই ছাড়ছে না। তখন রম্ভা মায়াবলে সুদনকে একটা মালা বানিয়ে গলায় পরে নিয়ে ইন্দ্রের সভায় চলল। সভায় গিয়ে সুদনকে মানুষ করে দিলে পর, সে সভার এক কোণে লুকিয়ে বসে সব দেখতে লাগল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলে, নাচগান সব থেমে গেল। রম্ভা সুদনকে আবার মালা বানিয়ে গলায় পরে চলল তার বাড়িতে। ক্রমে

সুদনের বাড়ির কাছে একটা নদীর ধারে এসে রম্ভা যখন আবার তাকে মানুষ করে দিল, তখন সুদন বলল—"তুমি বাড়ি যাও, আমি এই নদীতে স্নান আহ্নিক করে, পরে যাচ্ছি।"

এই নদীর ধারে ছিল ত্রিভুবন তীর্থ। এখানে দেবতারা পর্যন্ত স্নান করতে আসতেন। সেদিন সকালেও ছোটখাট অনেক দেবতা নদীর ঘাটে স্নান করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখে সুদন চিনতে পারল—তাঁরা রাত্রে ইন্দ্রের সভায় রম্ভাকে খুব খাতির করেছিলেন। সুদন ভাবল—'আমার স্ত্রীকে এরা এত সম্মান করে তাহলে আমাকে কেন করবে না?' এই ভেবে সে খুব গম্ভীর ভাবে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল—যেন সেও ভারি একজন দেবতা, কিন্তু দেবতারা তাকে দেখে অত্যন্ত অবজ্ঞা ক'রে তার দিকে ফিরেও চাইলেন না—তাঁরা তাঁদের স্নান আহ্নিকেই মন দিলেন। এ তাচ্ছিল্য সুদনের সহ্য হল না। সে করল কি, একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে দেবতাদের বেদম প্রহার দিয়ে বলল—"এত বড় আস্পর্ধা! আমি রম্ভার স্বামী, আমাকে তোরা মানিস নে?" দেবতারা মার খেয়ে ভাবলেন- 'কি আশ্চর্য! রম্ভা কি তবে মানুষ বিয়ে করেছে?' তাঁরা তখনই স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে সব কথা বললেন।

এদিকে সুদন বাড়ি গিয়েই হাসতে হাসতে স্ত্রীর কাছে তার বাহাদুরির কথা বলল। শুনে রম্ভার তো চক্ষুস্থির! স্বামীর নির্বুদ্ধিতা দেখে লজ্জায় সে মরে গেল, আর বলল—"তুমি সর্বনাশ করেছ! এখনি আমাকে ইন্দ্রের সভায় যেতে হবে।"

দেবতারা ইন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করলে পর ইন্দ্রের যা রাগ! "এতবড় স্পর্ধা! স্বর্গের অপ্সরা হয়ে রম্ভা পৃথিবীর মানুষকে বিয়ে করেছে?" ঠিক এই সময়ে রম্ভাও গিয়ে সেখানে উপস্থিত! তাকে দেখেই ইন্দ্রের রাগ শতগুণ বেড়ে উঠল। আর তিনি তৎক্ষণাৎ শাপ দিলেন, "তুমি স্বর্গের অপ্সরা হয়ে মানুষ বিয়ে করেছ, আবার তাকে লুকিয়ে স্বর্গে এনে আমার সভায় নাচ দেখিয়েছ এবং স্পর্ধা করে সেই লোক আবার দেবতাদের গায় হাত তুলেছে--অতএব, আমার শাপে তুমি আজ হতে দানবী হও। বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের যে সাতটি মন্দির আছে, সেই মন্দির চুরমার করে আবার যতদিন কেউ নূতন করে গড়িয়ে না দিবে, ততদিন তোমার শাপ দূর হবে না।"

রম্ভা তখনি পৃথিবীতে এসে সুদনকে শাপের কথা জানিয়ে বলল—"আমি এখন দানবী হয়ে বারাণসী যাব। সেখানে বারাণসীর রাজকুমারীর শরীরে ঢুকব, আর লোকে বলবে রাজকুমারীকে ভূতে পেয়েছে। রাজা নিশ্চয়ই যত ওঝা কবিরাজ ডেকে চিকিৎসা করাবেন; কিন্তু আমি তাকে ছাড়ব না, তাই কেউ রাজকুমারীকে ভালো করতে পারবে না। এদিকে তুমি বারাণসী গিয়ে বলবে যে, তুমি রাজকুমারীকে আরাম করতে পার। তারপর তুমি বুদ্ধি ক'রে ভূত ঝাড়ানোর চিকিৎসা আরম্ভ করলে আমি একটু একটু করে রাজকুমারীকে ছাড়তে থাকব। তারপর তুমি রাজাকে বলবে যে, তিনি বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির একেবারে চূর্ণ ক'রে, আবার যদি নূতন করে গড়িয়ে দেন, তবেই রাজকুমারী সম্পূর্ণ আরাম হবেন। রাজা অবিশ্যি তাই করবেন আর তাহলেই আমার শাপ দূর হবে। তুমিও অগাধ টাকা পুরস্কার পেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।" এই কথা বলতে বলতেই রম্ভা হঠাৎ দানবী হয়ে, তখনই চক্ষের নিমেষে বারাণসী গিয়ে একেবারে রাজকুমারীকে আশ্রয় করে বসল।

রাজকুমারী একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে, বিড় বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে, সেই যে ছুটে বেরুলেন, আর বাড়িতে ঢুকলেনই না। তিনি শহরের কাছেই একটা গুহার মধ্যে থাকেন, আর রাস্তা দিয়ে লোকজন যারা চলে তাদের গায় ঢিল ছুঁড়ে মারেন! রাজা কত ওঝা বদ্যি ডাকালেন, রাজকুমারীর কোন উপকারই হল না। শেষে রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন—"যে রাজকুমারীকে ভালো করতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিব—রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিব।"

রাজবাড়ির দরজার সামনে ঘণ্টা ঝুলনো আছে, নূতন ওঝা এলেই ঘণ্টায় ঘা দেয়, আর তাকে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারীর চিকিৎসা করান হয়। সুদন রম্ভার উপদেশমত বারাণসী গিয়ে রাজকুমারীর পাগল হওয়ার কথা শুনে ঘণ্টায় ঘা দিল। রাজা তাকে ডেকে বললেন "ওঝার জ্বালায় অস্থির হয়েছি বাপু! তুমি যদি রাজকুমারীকে ভালো করতে না পার, তবে কিন্তু তোমার মাথাটি কাটা যাবে।" এ কথায় সুদন রাজি হয়ে তখনই রাজকন্যার চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল।

ভূতের ওঝারা ভড়ংটা করে খুব বেশি, সুদনও সে সব করতে কসুর করল না। ঘি, চাল, ধূপ, ধুনো দিয়ে প্রকাণ্ড যজ্ঞ আরম্ভ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করে হিজি-বিজি মন্ত্র পড়াও বাদ দিল না। যজ্ঞ শেষ করে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বতের গুহায় চলল, যেখানে রাজকন্যা থাকে। সেখানে গিয়েও বিড় বিড় করে খানিকক্ষণ মন্ত্র পড়ল—"ভূতের বাপ—ভূতের মা—ভূতের ঝি, ভূতের ছা—দূর দূর দূর, পালিয়ে যা।" ক্রমে সকলে দেখল যে, ওঝার ওষুধে একটু-একটু করে কাজ দিচ্ছে। কিন্তু ভূত রাজকুমারীকে একেবারে ছাড়ল না। তিনি তখনো গুহার ভিতরেই থাকেন, কিছুতেই বাইরে আসলেন না। যা হোক, রাজা সুদনকে খুব আদর যত্ন করলেন, আর, যাতে ভূত একেবারে ছেড়ে যায়, সেরূপ ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। দুদিন পর্যন্ত সুদন আরো কত কিছু ভড়ং করল। তৃতীয় দিনে সে রাজার কাছে এসে বলল—"মহারাজ! রাজকুমারীর ভূত বড় সহজ ভূত নয়—এ হচ্ছে দৈবী ভূত। মহারাজ যদি এক অসম্ভব কাজ করতে পারেন—বিশ্বেশ্বরের সাতটা মন্দির চুরমার ক'রে, আবার নূতন করে ঠিক আগের মতো গড়িয়ে দিতে পারেন, তবেই আমি রাজকন্যাকে আরাম করতে পারি।"

রাজা বললেন—"এ আর অসম্ভব কি?" রাজার হুকুমে তখনই হাজার হাজার লোক লেগে গেল। দেখতে দেখতে মন্দিরগুলি চুরমার হয়ে গেল। তারপর এক মাসের মধ্যে আবার সেই সাতটি মন্দির ঠিক যেমন ছিল তেমনই করে নূতন মন্দির গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীও সেরে উঠলেন, অপ্সরাও শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল। তারপর খুব ঘটা করে সুদনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হল আর রাজা বিয়ের যৌতুক দিলেন তাঁর অর্ধেক রাজত্ব।

সন্দেশ ১৩২৭

রামের শঙ্খ

গরিব চাষা বেচারার বড় দুরবস্থা। সেবার তার খেতের শস্য এতই কম হয়েছে যে তার দুবেলা পেট ভরে খাওয়াই জোটে না। তার ভাঙা কুঁড়ের পাশেই এক দুষ্টু লোকের বাড়ি; সে অনেক গরিব লোককে ফাঁকি দিয়ে দেদার টাকা আর মস্ত দালান করেছে।

চাষা সেই লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসো করল; "কি করে টাকা জমায় বলতে পার কি?" দুষ্টু লোকটা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল, "রাম-নাম জপ কর টাকা তিনিই দেবেন।"

চাষা বেচারা ভালো মানুষ, সে তো তখন থেকে কেবলই দিন রাত "রাম-রাম-রাম-রাম" বলে। কিন্তু টাকা আর আসে না। শেষটায় ঘরে আর এক মুঠোও চাল রইল না। তখন বেচারা বড়ই মুশকিলে পড়ল। না খেয়ে খেয়ে তার গলার জোর চলে গেছে—রাম-নাম করতে পারে না। অথচ টাকা না হলেও চলে না—রাম-নাম ছাড়বারও জো নেই। বেচারা চিঁ চিঁ ক'রে নাম জপ করছে এমন সময় একজন রোগা টিংটিঙে লোক এসে একটা শঙ্খ দিয়ে চাষাকে বলল, "এই শঙ্খটা নাও। দশবার রাম-নাম করে পুব মুখো হয়ে এই শঙ্খে তিনবার ফুঁ দিয়ে যা চাইবে তাই পাবে।" এই বলেই সে চলে গেল।

চাষা তো তখনই দশবার রাম-নাম করে পুবমুখো হয়ে শঙ্খে তিনবার ফুঁ দিয়েই বলল, "পোলাও, মাংস, তরকারি, পায়েস, মিঠাই এই-সব চাই।"—অমনি থালা ভরা সুন্দর সুন্দর খাবার এসে হাজির!—বেচারা তখন পেট ভরে খেয়ে বাঁচল। তার পরের দিন যখন সেই দুষ্টু লোকটার সঙ্গে চাষার দেখা হ'ল, তখন সে চাষাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাই, তোমার আজ এত ফুর্তি কেন? রাম-নাম করে বুঝি মেলাই টাকা পেয়েছ?"

চাষা বেচারা ভালো মানুষ সে সব কথা তাকে খুলে বলল, কেবল শঙ্খটা কি ক'রে বাজাতে হয় তা বলল না। দুষ্টু লোকটার বড় হিংসা হ'ল। সে রোজই শঙ্খটার লোভে চাষার বাড়ি যাওয়া আসা করতে লাগল, আর একদিন সুবিধা বুঝে সেটাকে চুরি করল। কিন্তু সেটা চুরি করেও তার কোন লাভ হল না। বাড়ি গিয়ে সেটাকে সে কতরকম করে বাজাতে লাগল আর নানান জিনিস চাইতে লাগল, কিন্তু কিছুই পেল না। শেষটায় খুব জব্দ হয়ে সে চাষার কাছে ছুটে গেল, আর বলল, "তোমার শঙ্খটা আমি চুরি করেছি। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে ভবিষ্যতে তুমি শঙ্খের কাছ থেকে যা কিছু জিনিস নেবে তার দ্বিগুণ জিনিস আমাকে দেবে, তবে তোমাকে সেটা ফিরিয়ে দেবো।" চাষা বেচারা আর কি করে? নাই মামার চেয়েও তো কানা মামা ভালো: তাই সে দুষ্টু লোকটার কথায়ই রাজি হ'ল। তখন থেকে শঙ্খের কাছে সে যা কিছু জিনিস পায়, দুষ্টু লোকটা তার দ্বিগুণ জিনিস পায়।

শেষটায় একবার সে দেশে ভয়ানক গরম পড়ল; বৃষ্টি বন্ধ হ'ল, আর নদী, পুকুর, কুয়ো সব শুকিয়ে গেল। তখন চাষা শঙ্খের কাছে একটা জলভরা কুয়ো চাইল। অমনি তার বাড়িতে একটা সুন্দর ঠাণ্ডা জলের কুয়ো হ'ল, আর সেই দুষ্টু লোকটার

বাড়িতে দুটো সুন্দর কুয়ো হ'ল।

চাষার এত হিংসা হল যে তার আর রাত্রে ঘুমই হল না। সে কেবল ভাবতে লাগল কি করে দুষ্টু লোকটাকে জব্দ করবে। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাল। সে শঙ্খের কাছে চাইল, "আমার একটা চোখ কানা ক'রে দাও!"

অমনি তার একটা চোখ কানা হয়ে গেল, আর সেই দুষ্টু লোকটা একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। অন্ধ হয়ে যেই সে ঘর থেকে বেরোবে, অমনি সে দুটো কুয়োর একটার মধ্যে পড়ে গেল, আর হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরল।

সন্দেশ—১৩২৩

অন্ধের বর চাওয়া

অতি গরিব এক অন্ধ। তার ভারি দুঃখ—তার ঘরবাড়ি নাই, টাকা পয়সা নাই, ছেলেপিলে নাই, আর সে চোখে দেখতে পায় না। মনের দুঃখে অনেক কষ্টে তার দিন কাটে।

একদিন স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে বললেন, "ওরে অন্ধ, তুই আর কাঁদিস নে, আমি তোকে বর দিতে এসেছি। তুই কি বর চাস আমায় বল। একটিমাত্র বর তুই পাবি, সুতরাং ভালো করে ভেবেচিন্তে বলিস।"

অন্ধ কি বর চাইবে ভেবেই পায় না। একবার বলতে চায়, আমার চোখে দৃষ্টি এনে দাও—আবার ভাবে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে করব কি, বলি টাকাপয়সা দাও কিংবা ঘরবাড়ি দাও। আবার তার মনে হয়, টাকাপয়সা, ঘরবাড়িই-বা কার জন্যে চাই—আমার ছেলেপিলে কেউ নাই। আর দুদিন বাদেই যদি মরে যাই তাহলে এ-সব চেয়েই-বা লাভ কি? আর সব পেয়েও যদি মনের সুখটুকু না পাই, তাহলে তো সবই বৃথা।

তার ভাবনা দেখে দেবদূত বললেন, "আচ্ছা, তুই এখন না বলতে পারিস, নাহয় আমি কাল আবার আসব, তখন বলিস। এর মধ্যে ভালো করে ভেবে রাখ।"

অন্ধ বেচারার আর সারারাত ঘুমই হল না। ভোরবেলা দেবদূত আবার ফিরে এসে বললেন, "আমি এসেছি—এখন কি বর চাস বল।"

তখন অন্ধের বুদ্ধিটা হঠাৎ কেমন খুলে গেল। সে লাফিয়ে উঠে বলল, "আমায় খালি এই বর দিন যে আমি যেন হাসতে হাসতে দেখে যেতে পারি যে আমার নাতি-নাতনিরা চৌতলা বাড়িতে সোনার পালঙ্কে বসে আমার চারিদিকে খেলা করছে।"

দেবদূত তার বর চাওয়ার বাহাদুরি দেখে হেসে বললেন, "আচ্ছা তাই হোক।"

এক বরে অন্ধের ছেলেপিলে, ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা, চোখের দৃষ্টি, অনেক বয়স আর মনের সুখ, সবই চেয়ে নেওয়া হল।

সন্দেশ—১৩২৬

টাকার আপদ

বুড়ো মুচি রাতদিনই কাজ করছে আর গুনগুন গান করছে। তার মেজাজ বড় খুশি, স্বাস্থ্যও খুব ভালো। খেটে খায়; স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

তার বাড়ির ধারে এক ধনী বেনে থাকে। বিস্তর টাকা তার; মস্ত বাড়ি, অনেক চাকরবাকর। মনে কিন্তু তার সুখ নাই, স্বাস্থ্যও তার ভালো নয়। মুচির বাড়ির সামনে দিয়ে সে রোজ যাতায়াত করে আর ভাবে, 'এ লোকটা এত গরিব হয়েও রাতদিনই আনন্দে গান করছে, আর আমার এত টাকাকড়ি, আমার একটুও আনন্দ হয় না মনে—গাওয়া তো দূরের কথা। ইচ্ছা হলে তো টাকা দিয়ে রাজ্যের বড়-বড় ওস্তাদ আনিয়ে বাড়িতে গাওয়াতে পারি—নিজেও গাইতে পারি—কিন্তু সে ইচ্ছা হয় কই?' শেষটায় একদিন সে মনে মনে ঠিক করল সে এবার যখন মুচির বাড়ির সামনে দিয়ে যাবে তখন তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবে।

পরদিন সকালেই সে গিয়ে মুচিকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হে মুচিভায়া, বড় যে ফুর্তিতে গান কর, বছরে কত রোজকার কর তুমি?"

মুচি বলল, "সত্যি বলছি মশাই, সেটা আমি কখনো হিসাব করি নি। আমার কাজেরও কোনদিন অভাব হয় নি, খাওয়াপরাও বেশ চলে যাচ্ছে। কাজেই, টাকার কোন হিসাব রাখবারও দরকার হয় নি কোনদিন।"

বেনে বলল, "আচ্ছা, প্রতিদিন কত কাজ করতে পার তুমি?"

মুচি বলল, "তারও কিছু ঠিক নেই। কখনো বেশি করি, কখনো কম করি।"

মুচির সাদাসিধে কথাবার্তায় বেনে বড় খুশি হল, তারপর, একটা টাকার থলে নিয়ে সে মুচিকে বলল, "এই নাও হে—তোমাকে এই একশো টাকা দিলাম। এটা রেখে দাও, বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখের সময় কাজে লাগবে।"

মুচির তো ভারি আনন্দ; সে সেই টাকার থলেটা নিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। তার জীবনে সে কখনো একসঙ্গে এতগুলি টাকা চোখে দেখে নি।

কিন্তু, আস্তে আস্তে তার ভাবনা আরম্ভ হল। দিনের বেলা বেশ ছিল; রাত্তির হতেই তার মনে হতে লাগল, 'ঐ বুঝি চোর আসছে!' বেড়ালে ম্যাও করতেই সে মনে করল, 'ঐ রে! আমার টাকা নিতে এসেছে!' শেষটায় তার আর সহ্য হ'ল না। টাকার থলিটা নিয়ে সে ছুটে বেনের বাড়ি গিয়ে বলল, "এই রইল তোমার টাকা! এর চেয়ে আমার গান আর ঘুম ঢের ভালো!"

সন্দেশ—১৩২৭

বিবিধ কবিতা

প্রকৃতি, পশুপাখি, ঋতু, শিশু, ইস্কুল, বিচিত্রচিন্তা।

সুকুমার রায়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'নদী' কবিতাটি 'মুকুল' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তখন তাঁর বয়স আট বছর। পরের বছর 'নার্সারি রাইমে'র, অনুকরণে একটি ছড়া প্রকাশিত হয়। নদী দিয়ে 'বিবিধ কবিতা' অংশের সংকলন আরম্ভ হয়েছে আর ছড়াটি ছবি ও ছড়ার গুচ্ছের সঙ্গে গেছে।

এই কবিতাগুলির মধ্যে সুকুমার রায়ের কবিমানসের যে দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে সে দিকের পরিচয় প্রকট নয়। অন্যত্র কবি যেন কাব্যিকতাকে উপহাস করে গেছেন, কিন্তু এখানে সস্নেহ কৌতুক ও হাসিঠাট্টার সঙ্গে জগৎ-দেখা চোখে একটা ভাবালুতার আবেশ জড়িয়ে আছে।

ইস্কুলের সম্পর্কে কবির মনোভাব লক্ষণীয়। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভার কাছেই বিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ কাঠাম বিরক্তিকর বোধ হয়েছে—সুকুমার রায় তার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

সূচী

প্রকৃতি :

পশুপাখি :

ঋতু :

শিশু :

ইস্কুল :

বিচিত্র-চিন্তা :

প্রকৃতি

নদী

হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে
কল কল শব্দ করি সবে ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।
পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই-সব, কি-বা মনোলোভা।
কোথাও কোকিল দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে,
কোথাও ময়ূরে দেখে পাখা প্রসারিয়া
বন ধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া!
নদীতীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।
দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে ধায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়॥

মুকুল—১৩০৩

অন্ধ মেয়ে

গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা!
সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি,
রঙিন বেশে, রঙিন ফুলে রঙিন প্রজাপতি!

অন্ধ মেয়ে দেখছে না তা—নাই-বা যদি দেখে—
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে!
শুনছে সে যে পাখির ডাকে হরষ কোলাকুলি,
মিষ্টি ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি!

দুঃখ-সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,
তারও আঁধার জগৎখানি মধুর তারই কাছে॥

সন্দেশ—১৩২৪

সাগর যেথায়

সাগর যেথায় লুটিয়ে পড়ে নতুন মেঘের দেশে,
আকাশ ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে।
মেঘের শিশু ঘুমায় সেথা আকাশ দোলায় শুয়ে,
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছুঁয়ে।
সন্ধ্যা সকাল মেঘের মেলা কূল কিনারা ছাড়ি,
রঙ-বেরঙের পাল তুলে দেয় দেশ-বিদেশে পাড়ি।
মাথায় জটা মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে,
জোছনারাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে।
কোন্ অকূলের সন্ধানেতে কোন্ পথে যায় ভেসে,
পথহারা কোন্ গ্রামের পারে, নাম-জানা-নেই দেশে।
ঘূর্ণীপথের ঘোরের নেশা দিক্‌বিদিকে লাগে,
আগল-ভাঙা পাগল হাওয়া বাদল রাতে জাগে;
ঝড়ের মুখে স্বপন টুটে, আঁধার আসে ঘিরে,
মেঘের প্রাণে চমক হানে আকাশ চিরে চিরে!
বুকের মাঝে শঙ্খ বাজে দুন্দুভি দেয় সাড়া,
মেঘের মরণ ঘনিয়ে নামে মত্ত বাদল ধারা॥

সন্দেশ—১৩২১

আয় রে আলো আয়

পূব গগনে রাত পোহালো,
ভোরের কোলে লাজুক আলো নয়ন মেলে চায়।
আকাশতলে ঝলক জ্বলে,
মেঘের শিশু খেলার ছলে আলোক মাখে গায়।
সোনার আলো, রঙিন আলো,
স্বপ্নে আঁকা নবীন আলো—আয় রে আলো আয়।
আয় রে নেমে আঁধার পরে,
পাষাণ কালো ধৌত করে আলোর ঝরনায়।
ঘুম ভাঙালো পাখির তানে
জাগ রে আলো আকুল গানে অ[illegible]ল নীলিমায়।
আলসভরা আঁখির কোণে,
দুঃখভয়ে আঁধার মনে, আয় রে আলো আয়॥

সন্দেশ—১৩২৬

মেঘের খেয়াল

আকাশের ময়দানে বাতাসের ভরে,
ছোট, বড়, সাদা, কালো, কত মেঘ চরে।
কচি কচি থোপা থোপা মেঘেদের ছানা
হেসে খেলে ভেসে যায় মেলে কচি ডানা।
কোথা হতে কোথা যায়, কোন তালে চলে,
বাতাসের কানে কানে কত কথা বলে।

বুড়ো বুড়ো-ধাড়ি মেঘ ঢিপি হয়ে উঠে
শুয়ে বসে সভা করে সারাদিন জুটে।
কি যে ভাবে চুপচাপ, কোন্ ধ্যানে থাকে,
আকাশের গায়ে গায়ে কত ছবি আঁকে।
কত আঁকে, কত মোছে, কত মায়া করে,
পলে পলে কত রঙ কত রূপ ধরে।

জটাধারী বুনো মেঘ ফোঁস ফোঁস ফোলে,
গুরু গুরু ডাক ছেড়ে কত ঝড় তোলে।
ঝিলিকের ঝিকিমিকি চোখ করে কানা,
হুড় হুড় কড় কড় দশদিকে হানা।
ঝুল কালো চারিধার, আলো যায় ঘুচে,
আকাশের যত নীল সব দেয় মুছে॥

সন্দেশ—১৩২৭

আজব খেলা

সোনার মেঘে আলতা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল-সাঁঝে সূর্যিমামা নিত্যি আসে যায়।

নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভরে ভরে
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন করে।

ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জেবলে,
সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে।

আবার আঁকে, আবার মোছে দিনের পরে দিন
আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।

ফুরায় না কি সোনার খেলা? রঙের নাহি পার?
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার?

সেই খেলা যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে
উঠছে জেগে—সেই কথা কি সূর্যিমামা জানে?

সন্দেশ—১৩২৫

পশুপাখি

কত বড়

ছোট্ট সে একরত্তি ইঁদুরের ছানা,
ফোটে নাই চোখ তার, একেবারে কানা।
ভাঙা এক দেরাজের ঝুলমাখা কোণে,
মার বুকে শুয়ে শুয়ে মার কথা শোনে।

যেই তার চোখ ফোটে সেই দেখে চেয়ে—
দেরাজের ভারি কাঠ চারিদিক ছেয়ে।
চেয়ে বলে, মেলি তার গোল গোল আঁখি—
"ওরে বাবা! পৃথিবীটা এত বড় নাকি?"

সন্দেশ—১৩২৭

বড়াই

গাছের গোড়ায় গর্ত করে ব্যাঙ বেঁধেছেন বাসা,
মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গান ধরেছেন খাসা।
রাজার হাতি হাওদা পিঠে হেলেদুলে আসে—
'বাপ রে!' বলে ব্যাঙ বাবাজি গর্তে ঢোকেন ত্রাসে!
রাজার হাতি, মেজাজ ভারি হাজার রকম চাল;
হঠাৎ রেগে মটাং করে ভাঙলো গাছের ডাল।
গাছের মাথায় চড়াই পাখি অবাক হয়ে কয়—
'বাস রে বাস! হাতির গায়ে এমন জোরও হয়!'
মুখ বাড়িয়ে ব্যাঙ বলে, 'ভাই, তাইতো তোরে বলি—
আমরা, অর্থাৎ চার পেয়েরা, এম্নিভাবেই চলি॥'

সন্দেশ—১৩২২

বেজায় রাগ

ও হাড়গিলে, হাড়গিলে ভাই, খাপ্পা দেখি বড্ড আজ!
ঝগড়া কি আর সাজে তোমার? এই কি তোমার যোগ্য কাজ?
হোমরা-চোমরা মান্য তোমরা বিদ্যে, বুদ্ধি, মর্যাদায়,
ওদের সঙ্গে তর্ক করছ—নাই কি কোন লজ্জা তায়?
জানছ নাকি বলছে ওরা? 'কিচির মিচির কিচ্চিরি,'
অর্থাৎ কিনা তোমার নাকি চেহারাটা বিচ্ছিরি!
বলছে, আচ্ছা বলুক, তাতে ওদেরই তো মুখ ব্যথা,
ঠ্যাঁটা লোকের শাস্তি যত, ওরাই শেষে ভুগবে তা।
ওরা তোমায় খোঁড়া বলছে? বেয়াদব তো খুব দেখি!
তোমার পায়ে বাতের কষ্ট ওরা সে-সব বুঝবে কি?
তাই বলে কি নাচবে রাগে? উঠবে চটে চট করে?
মিথ্যে আরো ত্যক্ত হবে ওদের সাথে টক্করে।
ওই শোনো, কি বলছে আবার, কচ্ছে কত বক্তৃতা—
বলছে, তোমার ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢালাবে—সত্যি তা?
চড়াই পাখির বড়াই দেখ তোমায় দিচ্ছে টিটকিরি—
বলছে, তোমার মিষ্টি গলায় গান ধরো তো গিটকিরি।
বলছে, তোমার কাঁথাটাকে 'রিফুকর্ম' করবে কি?
খোঁড়া ঠ্যাঙে নামবে জলে? আর কোলাব্যাং ধরবে কি?
আর চটো না, আর শুনো না, ঠ্যাঁটা মুখের টিপ্পনি,
ওদের কথায় কান দিতে নেই সরে পড় এক্ষনি॥

সন্দেশ—১৩২০

সঙ্গীহারা

সবাই নাচে, ফুর্তি করে, সবাই গাহে গান,
একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান?
দেখছ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি—
তাই তো আমার মেজাজ খ্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।

তাও কি হয়! ওই যে মাঠে শালিখ পাখি ডাকে
তার কাছে কই যাও নি তো ভাই, শুধাও নি তো তাকে!
শালিখ পাখি বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছিমিছি,
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায় কেবল কিচিমিচি।

মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ
তার কাছে কই বসলে না তো শুনলে না তার গান!
দোয়েল পাখির ঘ্যানঘ্যানানি আর কি লাগে ভালো?
যেমন রূপে, তেমন গুণে, তেমনি আবার কালো।

রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙ্গার কাছে,
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কারো আছে?
মাছরাঙ্গা! তারেও কি আর পাখির মধ্যে ধরি?
রকম-সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি!

পায়রা, ঘুঘু, কোকিল, চড়াই, চন্দনা, টুনটুনি,
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি?
এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি, নেহাৎ ছোট জাত,
দেখলে আমি তফাৎ হটি অমনি পঁচিশ হাত!

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে—
সবার তুমি খুঁৎ পেয়েছ, নিখুঁৎ কেবল নিজে!
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নেই লেখা,
তাইতে তোমায় কেউ পোঁছে না, তাইতে থাক একা॥

সন্দেশ—১৩২৩

ছবি ও গল্প

ছবির টানে গল্প লিখি, নেই তো এতে ফাঁকি
যেমন ধারা কথায় শুনি, হুবহু তাই আঁকি।

পরীক্ষাতে গোল্লা পেয়ে হারু ফেরেন বাড়ি, চক্ষু দুটি ছানাবড়া, মুখখানি তার হাঁড়ি।

রেগে আগুন হলেন বাবা সকল কথা শুনে, আচ্ছা করে পিটিয়ে তারে দিলেন তুলো ধুনে।

মারের চোটে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে,

শুনে মায়ের বুক ফেটে যায়, 'হায় কি হল' বলে।

পিসি ভাসেন চোখের জলে কুটনো কোটা ফেলে,

আহ্লাদেতে পাশের বাড়ির আটখানা হয় ছেলে॥

সন্দেশ—১৩২৯

বিচার

ইঁদুর দেখে মামদো কুকুর বল্লে তেড়ে হেঁকে—
"বলবো কি আর, বড়ই খুশি হলেম তোরে দেখে।
আজকে আমার কাজ কিছু নেই, সময় আছে মেলা,
আয় না খেলি দুইজনাতে মোকদ্দমার খেলা।
তুই হবি চোর, তোর নামেতে করব নালিশ রুজু"—
"জজ কে হবে?" বল্লে ইঁদুর, বিষম ভয়ে জুজু।
"কোথায় উকিল, প্যায়দা, পুলিশ, বিচার কিসে হবে?"
মামদো বলে, "তাও জানিস নে? শোন বলে দিই তবে।
আমিই হব উকিল, হাকিম, আমিই হব জুরি,
কান ধরে তোর বলবো, 'ব্যাটা, ফের করেছিস চুরি?'
সটান দেব ফাঁসির হুকুম অমনি একেবারে—
বুঝবি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে!"

সন্দেশ—১৩২৮

বিষম কাণ্ড

কর্তা চলেন, গিন্নি চলেন, খোকাও চলেন সাথে,
ভড়বড়িয়ে, বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে।
তেড়ে হনহন চলে তিনজন যেন পল্টন চলে,
সিঁড়ি উঠতেই, একি কাণ্ড! এ আবার কি বলে!
ল্যাজ লম্বা, কান গোল গোল, তিড়িং-বিড়িং ছোটে,
চোখ মিটমিট, কুটুস কাটুস—এটি কোন্ জন বটে!
হেই! হুশ! হ্যাশ! ওরে বাস রে মৎলবখান কিরে?
করলে তাড়া যায় না তবু, দেখছে আবার ফিরে!
ভাবছে বুড়ো, করবো গুঁড়ো ছাতার বাড়ি মেরে,
আবার ভাবে ফসকে গেলে কামড়ে দেবে তেড়ে।
আরে বাপ রে! বসলো দেখ দুই পায়ে ভর করে,
বুক দুরদুর বুড়ো ভল্লুর, মোমবাতি যায় পড়ে।
ভীষণ ভয়ে দাঁত কপাটি, তিন মহাবীর কাঁপে,
গড়িয়ে নামে হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে।

সন্দেশ—১৩৩০

ঋতু

মনের মতন

কান্নাহাসির পোঁটলা বেঁধে বর্ষভরা পুঁজি,
বৃদ্ধ বছর উধাও হল ভূতের মুলুক খুঁজি।
নূতন বছর এগিয়ে এসে হাত পাতে ওই দ্বারে,
বল দেখি মন, মনের মতন কি দিবি তুই তারে?

আর কি দিব?—মুখের হাসি, ভরসাভরা প্রাণ,
সুখের মাঝে, দুখের মাঝে আনন্দময় গান॥

সন্দেশ—১৩২৬

বর্ষ গেল, বর্ষ এল

বর্ষ গেল, বর্ষ এল, গ্রীষ্ম এলেন বাড়ি,
পৃথ্বী এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ি।
সত্যিকালের এই পৃথিবী বয়স কেবা জানে,
লক্ষ হাজার বছর ধরে চলছে একই টানে।
আপন তালে আকাশ পথে আপনি চলে বেগে,
গ্রীষ্মকালের তপ্ত রোদে বর্ষাকালের মেঘে,
শরৎকালের কান্নাহাসি হাল্কা বাদল হাওয়া,
কুয়াশাঘেরা পর্দা ফেলে হিমের আসা-যাওয়া।
শীতের শেষে রিক্ত বেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্তে লয় তুলি।
না জানি কোন্ নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে,
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে!
না জানি কোন্ ঘূর্ণীপাকে দিনের পরে দিন,
এমন করে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরামহীন!
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষ যুগের প্রথা,
না জানি তার চালচলনের হিসাব রাখে কোথা!

সন্দেশ—১৩২২

নূতন বৎসর

'নূতন বছর! নূতন বছর!' সবাই হাঁকে সকাল সাঁঝে,
আজকে আমার সূর্যিমামার মুখটি জাগে মনের মাঝে।
মুস্কিলাসান করলে মামা, উস্কিয়ে তার আগুনখানি,
ইস্কুলেতে লাগলো তালা, থামলো সাধের পড়ার ঘানি।

এগ্‌জামিনের বিষম ঠেলা চুকলো রে ভাই, ঘুচলো জ্বালা,
নূতন সালের নূতন তালে হোক তবে আজ 'হকি'র পালা
কোন্‌খানে কোন্ মেজের কোণে, কলম কানে চশমা নাকে,
বিরামহারা কোন্ বেচারা দেখেন কাগজ, ভয় কি তাঁকে?

অঙ্কে দেবেন 'হকি'র গোলা, শঙ্কা তো নাই তাহার তরে,
তংকা হাজার মিলুক তাঁহার, ডঙ্কা মেরে চলুন ঘরে।
দিনেক যদি জোটেন খেলায় সাঁঝের বেলায় মাঠের মাঝে,
'গোল্লা' পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার নাহয় যাবেন কাজে!

আয় তবে আয় নবীন বরষ! মলয় বায়ের দোলায় দুলে,
আয় সঘনে গগন বেয়ে, পাগলা ঝড়ের পালটি তুলে।
আয় বাংলার বিপুল মাঠে, শ্যামল ধানের ঢেউ খেলিয়ে,
আয় রে সুখে ছুটির দিনে, আমকাঁঠালের খবর নিয়ে!

আয় দুলিয়ে তালের পাখা, আয় বিছিয়ে শীতল ছায়া,
পাখির নীড়ে, চাঁদের হাটে, আয় জাগিয়ে মায়ের মায়া।
তাতুক না মাঠ, ফাটুক না কাঠ, ছুটুক না ঘাম নদীর মতো
জয় হে তোমার নূতন বছর! তোমার যে গুণ গাইব কত?

পুরান বছর মলিন মুখে যায় সকলের বালাই নিয়ে,
ঘুচলো কি ভাই মনের কালি সেই বুড়োকে বিদায় দিয়ে?
নূতন সালে নূতন বলে নূতন আশায় নূতন সাজে,
আয় দয়ালের নাম লয়ে ভাই, যাই সকলে যে যার কাজে!

সন্দেশ—১৩২২

(১)

ওই এল বৈশাখ, ওই নামে গ্রীষ্ম,
খাই খাই রবে যেন ভয়ে কাঁপে বিশ্ব!
চোখে যেন দেখি তার ধূলিমাখা অঙ্গ,
বিকট কুটিলজটে ভ্রূকুটির ভঙ্গ,
রোদে রাঙা দুই আঁখি শুকায়েছে কোটরে,
ক্ষুধার আগুন যেন জ্বলে তার জঠরে!
মনে হয় বুঝি তার নিঃশ্বাসমাত্রে
তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে!
ভয় লাগে, হয় বুঝি ত্রিভুবন ভস্ম—
ওরে ভাই, ভয় নাই, পাকে ফলশস্য!
তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে
পৃথিবী বসেছে পাকে, চেয়ে দেখ চক্ষে,
আম পাকে, জাম পাকে, ফল পাকে কত যে,
বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে!

সন্দেশ—১৩২৩

(২)

সর্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষশেষে রুদ্রবেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে।
তাপিয়ে গগন, কাঁপিয়ে ভুবন মাতলো তপন নাচলো পবন,
রৌদ্র ঝলে আকাশতলে অগ্নি জ্বলে জলেস্থলে।
ফেলছে আকাশ তপ্ত নিশাস, ছুটছে বাতাস ঝলসিয়ে ঘাস,
ফুলের বিতান শুখনো শ্মশান, যায় বুঝি প্রাণ, হায় ভগবান!
দারুণ তৃষায় ফিরছে সবায় জল নাহি পায়, হায় কি উপায়,
তাপের চোটে কথা না ফোটে, হাঁপিয়ে ওঠে, ঘর্ম ছোটে।
বৈশাখী ঝড় বাধায় রগড়, করে ধড়ফড় ধরার পাঁজর,
দশ দিক হয় ঘোর ধূলিময়, জাগে মহাভয় হেরি সে প্রলয়,
করি তোলপাড় বাগান বাদাড় ওঠে বার বার ঘন হুংকার,
শুনি নিয়তই, থাকি থাকি ওই হাঁকে হৈ হৈ, মাভৈ মাভৈ॥

সন্দেশ—১৩৩০

শ্রাবণে

জল ঝরে, জল ঝরে, সারাদিন, সারারাত—
অফ্‌রান নামতায় বাদলের ধারাপাত।

আকাশের মুখঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার।

স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজল ভরে ওঠে ভরসায়।

উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই, শেষ নাই, বরষার প্লাবনের।

জলে জলে জলময়, দশদিক টলমল,
অবিরাম একই গান—ঢালো জল, ঢালো জল।

ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।

শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,
ধরণীর আশাভয়, ধরণীর সুখদুখ॥

সন্দেশ—১৩২৬

শিশু

শিশুর দেহ

চশমা-আঁটা পণ্ডিতে কয়, শিশুর দেহ দেখে—
'হাড়ের পরে মাংস গেঁথে, চামড়া দিয়ে ঢেকে,
শিরার মাঝে রক্ত দিয়ে, ফুসফুসেতে বায়ু,
বাঁধলো দেহ সুঠাম করে পেশী এবং স্নায়ু।'
কবি বলেন, 'শিশুর মুখে হেরি তরুণ রবি,
উৎসারিত আনন্দে তার জাগে জগৎ ছবি,
হাসিতে তার চাঁদের আলো, পাখির কলকল,
অশ্রুকণা ফুলের দলে শিশির ঢলঢল।
মা বলেন, 'এই দুরু দুরু মোর বুকেরই বাণী,
তারি গভীর ছন্দে গড়া শিশুর দেহখানি।
শিশুর প্রাণে চঞ্চলতা আমার অশ্রুহাসি,
আমার মাঝে লুকিয়ে ছিল এই আনন্দরাশি।
গোপনে কোন্ স্বপ্নে ছিল অজানা কোন্ আশা,
শিশুর দেহে মূর্তি নিল আমার ভালোবাসা।'

সন্দেশ—১৩২৯

বেজায় খুশি

বাহবা বাবুলাল! গেলে যে হেসে!
বগলে কাতুকুতু কে দিল এসে?
এদিকে মিটিমিটি দেখ কি চেয়ে?
হাসি যে ফেটে পড়ে দু গাল বেয়ে!
হাসে যে রাঙা ঠোঁট দন্ত মেলে,
চোখের কোণে কোণে বিজলি খেলে।
হাসির রসে গলে ঝরে যে লালা,
কেন এ খি-খি-খি-খি হাসির পালা?
যে দেখে সেই হাসে হাহাহা হাহা,
বাহবা বাবুলাল, বাহবা বাহা!

সন্দেশ—১৩২২

খোকা ঘুমায়

কোন্‌খানে কোন্‌ সুদূর দেশে, কোন্‌ মায়ের বুকে,
কাদের খোকা মিষ্টি এমন ঘুমায় মনের সুখে?
অজানা কোন্‌ দেশে সেথা, কোন্‌খানে তার ঘর?
কোন্‌ সমুদ্র, কত নদী, কত দেশের পর?
কেমন সুরে কি বলে মা ঘুমপাড়ানি গানে,
খোকার চোখে নিত্যি সেথা ঘুমটি ডেকে আনে?
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, তাদেরও কি থাকে?
'ঘুমটি দিয়ে যাওগো' বলে মা কি তাদের ডাকে?
শেয়াল আসে বেগুন খেতে, বর্গি আসে দেশে?
ঘুমের সাথে মিষ্টিমধুর মায়ের সুরটি মেশে?
খোকা জানে মায়ের মুখটি সবার চেয়ে ভালো,
সবার মিষ্টি মায়ের হাসি, মায়ের চোখের আলো।
স্বপন মাঝে ছায়ার মতো মায়ের মুখটি ভাসে,
তাইতে খোকা ঘুমের ঘোরে আপন মনে হাসে॥

সন্দেশ—১৩২০

ভারি মজা

এই নেয়েছ, ভাত খেয়েছ, ঘণ্টাখানেক হবে—
আবার কেন, হঠাৎ হেন, নামলে এখন টবে?
একলা ঘরে ফুর্তিভরে, লুকিয়ে দুপুর বেলা
স্নানের ছলে ঠাণ্ডা জলে জল-ছপ-ছপ খেলা!
জল ছিটিয়ে, টব পিটিয়ে, ভাবছ 'আমোদ ভারি,
কেউ কাছে নাই, যা খুশি তাই করতে এখন পারি।'
চুপ চুপ চুপ—ওই দুপদুপ! ওই জেগেছে মাসি,
আসছে ধেয়ে শুনতে পেয়ে দুষ্টু মেয়ের হাসি॥

সন্দেশ—১৩২৮

লোভী ছেলে

কি ভেবে যে আপন মনে
হাসি আসে ঠোঁটের কোণে,
আধ-আধ ঝাপসা বুলি,
কোন কথা কয় না খুলি।
বসে বসে একলা নিজে
লোভী ছেলে ভাবেন কি যে—
শুধু শুধু চামচ চেটে
মনে মনে সাধ কি মেটে?
একটুখানি মিষ্টি দিয়ে
রাখ আমায় চুপ করিয়ে,
নৈলে পরে চেঁচিয়ে জোরে
তুলব বাড়ি মাথায় করে॥

সন্দেশ—১৩২৩

সাহস

পুলিশ দেখে ডরাই নে আর, পালাই নে আর ভয়ে,
আরশুলা কি ফড়িং এলে থাকতে পারি সয়ে,
আঁধার ঘরে ঢুকতে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক দুরদুর জুজুর নামটি শুনে,
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও তো থাকি কত,
মেঘ ডাকলে চেঁচাই নেকো আহাম্মুকের মতো।
মামার বাড়ির কুকুরদুটোর বাঘের মতো চোখ,
তাদের আমি খাবার খাওয়াই এমনি আমার রোখ!
এমনি আরো নানান দিকে সাহস আমার খেলে,
সবাই বলে 'খুব বাহাদুর' কিংবা 'সাবাস ছেলে'।
কিন্তু তবু শীতকালেতে সকালবেলায় হেন
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হলে কান্না আসে কেন?
সাহস টাহস সব যে তখন কোন্‌খানে যায় উড়ে—
ষাঁড়ের মতন কণ্ঠ ছেড়ে চেঁচাই বিকট সুরে!

সন্দেশ—১৩২৪

লক্ষ্মী

হাত-পা-ভাঙা নোংরা পুতুল মুখটি ধুলোয় মাখা,
গালদুটি তার খাবলামতন চোখদুটি তার ফাঁকা,

কোথায়-বা তার চুলবিনুনি কোথায়-বা তার মাথা,
আধখানি তার ছিন্ন জামা, গায় দিয়েছেন কাঁথা।

পুতুলের মা ব্যস্ত কেবল, তার সেবাতেই রত
খাওয়ান, শোয়ান, আদর করেন, ঘুম ডেকে দেন কত।

বলতে গেলাম 'বিশ্রী পুতুল' অম্নি বলেন রেগে—
'লক্ষ্মী পুতুল, জ্বর হয়েছে তাই তো এখন জেগে।'

দ্বিগুণ জোরে চাপড়ে দিল 'আয় আয় আয়' বলে—
নোংরা পুতুল লক্ষ্মী হয়ে পড়লো ঘুমে ঢুলে!

সন্দেশ - ১৩২৬

আদুরে পুতুল

যাদুরে আমার আদুরে গোপাল, নাকটি নাদুস, থোপনা গাল,
ঝিকিমিকি চোখ মিটিমিটি চায়, ঠোঁট দুটি তায় টাটকা লাল।
মোমের পুতুল ঘুমিয়ে থাকুক দাঁত মেলে আর চুল খুলে,
টিনের পুতুল চীনের পুতুল, কেউ কি এমন তুলতুলে?
গোবদা গড়ন এমনি ধরণ আবদারে কেউ ঠোঁট ফুলোয়?
মখমলি রঙ, মিষ্টি নরম, দেখছ কেমন হাত বুলোয়?
বলবি কি বল, হাবলা পাগল, আবোল তাবোল কান ঘেঁষে,
ফোকলা গদাই, যা বলবি তাই ছাপিয়ে পাঠাই 'সন্দেশে'॥

সন্দেশ—১৩২৭

ভালো ছেলের নালিশ

মাগো! প্রসন্নটা দুষ্টু এমন! খাচ্ছিল সে পরোটা
গুড় মাখিয়ে আরাম করে বসে—
আমায় দেখে একটা দিল, নয়কো তাও বড়টা,
দুইখানা সে আপনি খেল কষে!

তাইতে আমি কান ধরে তার একটুখানি পেঁচিয়ে
কিল মেরেছি, 'হ্যাংলা ছেলে' বলে—
অমনি কিনা মিথ্যে করে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে
গেল সে তার মায়ের কাছে চলে!

মাগো! এমনি ধারা শয়তানি তার, খেলতে গেলাম দুপরে,
বল্ল, 'এখন খেলতে আমার মানা',
ঘণ্টাখানেক পরেই দেখি দিব্যি ছাতের উপরে
ওড়াচ্ছে তার সবুজ ঘুড়ি খানা।

তাইতে আমি দৌড়ে গিয়ে, ঢিল মেরে আর খুঁচিয়ে
ঘুড়ির পেটে দিলাম করে ফুটো—
আবার দেখ, বুক ফুলিয়ে, সটান মাথা উঁচিয়ে
আনছে কিনে নতুন ঘুড়ি দুটো!

সন্দেশ—১৩২৯

খোকার ভাবনা

মোমের পুতুল, লোমের পুতুল, আগলে ধরে হাতে,
তবুও কেন হাবলা ছেলের মন ওঠে না তাতে?
একলা জেগে এক মনেতে চুপটি করে বসে
আনমনা সে কিসের তরে আঙুলখানি চোষে?
নাইকো হাসি, নাইকো খেলা, নাইকো মুখে কথা,
আজ সকালে হাবলাবাবুর মন গিয়েছে কোথা?
ভাবছে বুঝি দুধের বোতল আসছে নাকো কেন?
কিংবা ভাবে মায়ের কিসে হচ্ছে দেরি হেন।
ভাবছে এবার দুধ খাবে না, কেবল খাবে মুড়ি,
দাদার সাথে কোমর বেঁধে করবে হুড়োহুড়ি,
ফেলবে ছুঁড়ে চামচটাকে পাশের বাড়ির চালে,
নাহয় তেড়ে কামড়ে দেবে দুষ্টু দাদুর গালে।
কিংবা ভাবে একটা কিছু ঠুকতে যদি পেতো,
পুতুলটাকে করতো ঠুকে একেবারে থেঁতো।

সন্দেশ—১৩২৯

নিঃস্বার্থ

গোপলাটা কি হিংসুটে মা! খাবার দিলেম ভাগ করে,
কল্লে নাকো মুখেও কিছু, ফেল্লে ছুঁড়ে রাগ করে।
জ্যাঠাইমা যে মেঠাই দিলেন 'দুই ভায়েতে খাও' বলে—
দশটি ছিল, একটি তাহার চাখতে নিলেম 'ফাও' বলে,
আর যে নটি, ভাগ করে তায় তিনটে দিলেম গোপলাকে—
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে।
বুঝিয়ে বলি, 'কাঁদিস কেন? তুই যে নেহাৎ কনিষ্ঠ,
বয়স বুঝে সামলে খাবি, তা নৈলে হয় অনিষ্ট।
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুণতি তাই,
মোদ্দা আমার ছয়খানি হয়, তিন বছরে তিনটি পাই।'
তাও মানে না, কেবল কাঁদে—স্বার্থপরের শয়তানি,
শেষটা আমায় মেঠাইগুলো খেতেই হল সবখানি।

সন্দেশ—১৩২৬

ইস্কুল

ছুটি

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ—
পোড়া স্কুলের পড়ার পরে আর কি বসে মন?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘণ্টা হতেই শুরু
প্রাণটা করে 'পালাই পালাই' মনটা উড়ু উড়ু—
পড়ার কথা খাতায় পাতায়, মাথায় নাহি ঢোকে!
মন চলে না, মুখ চলে যায় আবোল তাবোল বকে!
কানটা ঘোরে কোন্ মুলুকে হুঁশ থাকে না তার,
এ কান দিয়ে ঢুকলে কথা ও কান দিয়ে পার।
চোখ থাকে না আর কিছুতেই, কেবল দেখে ঘড়ি,
বোর্ডে আঁকা অঙ্ক ঠেকে আঁচড়কাটা খড়ি!
কল্পনাটা স্বপ্নে চড়ে ছুটছে মাঠে ঘাটে—
আর কি রে মন বাঁধন মানে? ফিরতে কি চায় পাঠে?
পড়ার চাপে ছটফটিয়ে আর কি রে দিন চলে?
ঝুপ করে মন ঝাঁপ দিয়ে পড় ছুটির বন্যাজলে॥

সন্দেশ—১৩২৫

দিনের হিসাব

ভোর না হতে পাখিরা জোটে, গানের চোটে ঘুমটি ছোটে—
চোখটি খোলো, গাত্র তোলো, আরে মোলো, সকাল হল।
হায় কি দশা, পড়তে বসা, অঙ্ক কষা, কলম ঘষা,
দশটা হলে হট্টগোলে দৌড়ে চলে বই বগলে।
স্কুলের পড়া, বিষম তাড়া, কানটি নাড়া, বেঞ্চে দাঁড়া,
মরে কি বাঁচে! সমুখে পাছে বেত্র নাচে নাকের কাছে॥

খেলতে যে চায়, খেলবে কি ছাই, বৈকেলে হায়, সময় কি পায়?
খেলাটি ক্রমে যেমনি জমে দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে,
ভাঙলো মেলা, সাধের খেলা—আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা—
মুখটি হাঁড়ি, তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি যে যার বাড়ি।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপসা চোখে ক্ষীণ আলোকে অঙ্ক টোকে;
ছুটি পাবার সুযোগ আবার আয় রবিবার, হপ্তা কাবার॥

সন্দেশ—১৩২১

ছুটি

ছুটি! ছুটি! ছুটি!
মনের খুশি রয় না মনে, হেসেই লুটোপুটি।
ঘুচলো এবার পড়ার তাড়া, অঙ্ক কাটাকুটি,
দেখব না আর পণ্ডিতের ওই রক্ত আঁখিদুটি।
আর যাব না স্কুলের পানে নিত্য গুটি গুটি,
এখন থেকে কেবল খেলা, কেবল ছুটোছুটি।
পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙিয়ে আয় রে সবাই জুটি,
গ্রীষ্মকালের দুপুর রোদে গাছের ডালে উঠি।
আয় রে সবাই হল্লা করে হরেক মজা লুটি,
একদিন নয়, দুইদিন নয়, দুই দুই মাস ছুটি!

সন্দেশ—১৩২২

পড়ার হিসাব

ফিরল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হল ছুটি—
আবার চলে বই বগলে সবাই গুটি গুটি।
পড়ার পরে কার কি রকম মনটি ছিল এবার,
সময় এল এখন তারই হিসেবখানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি, কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন, কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ-বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ-বা কেবল কাঁচুমাচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাসে বলেন, 'ওরে গদাই,
এবার কিছু পড়লি? নাকি খেলতি কেবল সদাই?'
গদাই ভয়ে চোখ পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বল্লে, 'এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্বনেশে—
মামার বাড়ি যেদ্দিন যাওয়া অম্নি গাছে চড়া,
এক্কেবারে অম্নি ধপাস—পড়ার মতো পড়া!'

সন্দেশ—১৩২৩

আড়ি

কিসে কিসে ভাব নেই? ভক্ষক ও ভক্ষ্য—
বাঘে ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে।

শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরি,
সাপে আর নেউলে তো চিরকাল বৈরী!

আদা আর কাঁচকলা মেলে কোনদিন সে?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।

তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখ নি?
ছ্যাঁক ছ্যাঁক রাগ যেন খেতে আসে এখনি।

তার চেয়ে বেশি আড়ি আমি পারি কহিতে—
তোমাদের কারো কারো কেতাবের সহিতে॥

সন্দেশ—১৩২৫

হরিষে বিষাদ

দেখছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে
ছুটির কত খবর লেখে, কিসের ছুটি কদিন হবে।
ঈদ, মহরম, দোল, দেওয়ালি, বড়দিন আর বর্ষশেষে—
ভাবছে যত ফুল্লমুখে, ফুর্তিভরে ফেলছে হেসে।
এমন কালে নীল আকাশে হঠাৎ-খ্যাপা মেঘের মতো,
উথলে ছোটে কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত।
'কি হল তোর?' সবাই বলে, 'কলমটা কি বিঁধলো হাতে?'
'জিভে কি তোর দাঁত বসালি?' 'কামড়ালো কি ছারপোকাতে?'
প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে, অশ্রু ঝরে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বল্লে কেঁদে আগুন রেগে—
'ঈদ পড়েছে জষ্ঠিমাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি,
বর্ষশেষ আর দোল তো দেখি রোববারেতেই পড়লো দুটি।
দিনগুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাজি পঞ্জিকাতে—
মুখ ধোব না, ভাত খাব না, ঘুম যাব না আজকে রাতে।'

সন্দেশ—১৩২৬

বিচিত্র-চিন্তা

আশ্চর্য

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
'বাঁদর, বেকুব, আজব হাঁদা,
বকাট ফাজিল, অকাট গাধা!'

আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি, যতন করি—
'শান্ত, মানিক, শিষ্ট, সাধু,
বাছা রে, ধন রে, লক্ষ্মী, যাদু।'

মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক'টি,
কেহ খুশি, কেহ উঠিল চটি!

রকম-রকম কালির টানে
কারো হাসি, কারো অশ্রু আনে,
মারে না, ধরে না, হাঁকে না বুলি,
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?

সাদায় কালোয় কি খেলা জানে?
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে॥

সন্দেশ—১৩২৬

বিষম চিন্তা

মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার,
সবাই বলে 'মিথ্যে বাজে বকিস নে আর খবরদার!'
অমনধারা ধমক দিলে কেমন করে শিখব সব?
বলবে সবাই 'মুখ্যু ছেলে', বলবে আমায় 'গো-গর্দভ'।
কেউ কি জানে দিনের বেলায় কোথায় পালায় ঘুমের ঘোর?
বর্ষা হলেই ব্যাঙের গলায় কোত্থেকে হয় এমন জোর?
গাধার কেন শিং থাকে না? হাতির কেন পালক নেই?
গরম তেলে ফোড়ন দিলে লাফায় কেন তা ধেই-ধেই?
সোডার বোতল খুল্লে কেন ফসফসিয়ে রাগ করে?
কেমন করে রাখবে টিকি মাথায় যাদের টাক পড়ে?
ভূত যদি না থাকবে তবে কোত্থেকে হয় ভূতের ভয়?
মাথায় যাদের গোল বেধেছে তাদের কেন 'পাগোল' কয়?
কতই ভাবি এ-সব কথা, জবাব দেবার মানুষ কই?
বয়স হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।

সন্দেশ—১৩২৯

আনন্দ

যে আনন্দ ফুলের বাসে, যে আনন্দ পাখির গানে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দে বাতাস বহে, যে আনন্দ সাগর জলে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়, যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দে আকাশ ভরা, যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ সকল সুখে, যে আনন্দ রক্তধারায়,
সে আনন্দ মধুর হয়ে তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মতো থাকুক তব জীবন ভরি॥

সন্দেশ—১৩৩০

আলোছায়া

হোক না কেন যতই কালো,
　　এমন ছায়া নাই রে নাই—
লাগলে পরে রোদের আলো
　　পালায় না যে আপনি ভাই!
শুষ্ক মুখে আঁধার ধোঁয়া
　　কঠিন হেন কোথায় বল,
লাগলে যাতে হাসির ছোঁয়া
　　আপনি গলে হয় না জল?

সন্দেশ—১৩২৭

নিরুপায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে—
'সহজে উদরে ঢুকিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব, হব না পেটুক।'
মাস দুই যেতে খাতা খুলে দেখি
এরি মাঝে মন লিখিয়াছে এ কি!
লিখিয়াছে, 'যদি নেমন্তন্নে
কে'দে ওঠে প্রাণ লুচির জন্যে,
উচিত হবে কি কাঁদানো তাহারে?
কিংবা যখন বিপুল আহারে,
তেড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া—
তখন কি করি, আমি নিরুপায়!
তাড়াতে না পারি, বলি আয়, আয়,
ঢুকে আয় মুখে দুয়ার ঠেলিয়া
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া!'

সন্দেশ—১৩২৬

নানা গল্প

'দেশ-বিদেশের গল্প' নামাঙ্কিত গুচ্ছটিতে প্রধানত রূপকথা, রাজা-উজিরের কাহিনী ও পুরোনো দিনের বিষয় সঞ্চিত হয়েছে; সেগুলিতে সুকুমার রায়ের কবিকল্পনা ও রসিকতা দুয়ের ধারা মোটামুটি অন্তঃসলিলা। আর 'নানা গল্প' অংশে সেই দুটি গুণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; অধিকাংশ গল্পে দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে মেশানো থাকলেও কয়েকটি প্রধানত কল্পনাশ্রিত আর কয়েকটি বিশুদ্ধ 'মজার গল্প'।

খুব ছোটদের থেকে আরম্ভ করে কিশোরদের উপযোগী পর্যন্ত উনিশটি গল্প এখানে গ্রথিত হয়েছে। দুয়েকটিতে ইংরেজির ছায়া থাকলেও পরিবেশনে সবগুলিই দেশী।

সূচীপত্র

ছাতার মালিক

তারা দেড় বিঘৎ মানুষ।

তাদের আড্ডা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, বনের ধারে, ব্যাঙ-ছাতার ছায়ার তলায়। ছেলেবেলায় যখন তাদের দাঁত ওঠে নি, তখন থেকে তারা দেখে আসছে, সেই আদ্যিকালের ব্যাঙের ছাতা। সে যে কোথাকার কোন্ ব্যাঙের ছাতা, সে খবর কেউ জানে না, কিন্তু সবাই বলে, "ব্যাঙের ছাতা"।

যত সব দুষ্টু ছেলে, রাত্রে যারা ঘুমোতে চায় না, মায়ের মুখে ব্যাঙের ছাতার গান শুনে শুনে তাদেরও চোখ বুজে আসে।—

গাল ফোলা কোলাব্যাঙ পাল তোলা রাঙা ছাতা
মেঠোব্যাঙ, গেছোব্যাঙ, ছেঁড়া ছাতা, ভাঙা ছাতা।
সবুজ রঙ জবড়জঙ জরির ছাতা সোনা ব্যাঙ
টোক্কা-আঁটা ফোক্‌লা ছাতা কোঁকড়া মাথা কোনা ব্যাঙ॥

—কত ব্যাঙের ছাতা!

কিন্তু, আজ অবধি ব্যাঙকে তারা চোখেও দেখে নি। সেখানে, মাঠের মধ্যে ঘাসের মধ্যে, সবুজ সবুজ্ পাগ্‌লা ফড়িঙ থেকে থেকে তুড়ুক্ করে মাথা ডিঙিয়ে লাফিয়ে যায়; সেখানে, রঙ-বেরঙের প্রজাপতি, তারা ব্যস্ত হয়ে ওড়ে ওড়ে আর বসতে চায়, বসে বসে আর উড়ে পালায়; সেখানে, গাছে গাছে কাঠবেড়ালি সারাটা দিন গাছ মাপে আর জরিপ করে, গাছ বেয়ে ওঠে আর গাছ বেয়ে নামে। আর রোদে বসে গোঁফ তাওয়ায় আর হিসেব কষে। কিন্তু তারাও কেউ ব্যাঙের খবর বলতে পারে না।

গ্রামের যত বুড়োবুড়ি, দিদিমা আর ঠাকুরমা, তাঁরা বলেন, আজও সে ব্যাঙ মরে নি, তার ছাতার কথা ভোলে নি।

যখন ভরা বর্ষায় বাদল নামে, বন-বাদাড়ে লোক থাকে না, ব্যাঙ তখন আপন ছাতার তলায় বসে মেঘের সঙ্গে তর্ক করে। যখন নিশুত রাতে সবাই ঘুমোয়, কেউ দেখে না, তখন ব্যাঙ এসে তার ছাতার ছায়ায় ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তান জুড়ে দেয়, "দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্, এখন দ্যাখ।" কিন্তু যেদিন সব দুষ্টু ছেলে জট্‌লা করে বাদলায় ভিজে দেখতে গেল, কই তারা তো কেউ ব্যাঙ দেখে নি? আর যেবার তারা নিঝুম রাতে ভরসা করে বনের ধারে কান পেতেছে, সেবারে তো কই গান শোনে নি!

কিন্তু ছাতা যখন আছে, ব্যাঙ তখন না এসে যাবে কোথায়? একদিন না একদিন ব্যাঙ ফিরে আসবেই—আর বলবে, ''আমার ছাতা কই?'' তখন তারা বলবে, ''এই যে তোমার আদ্যিকালের নতুন ছাতা—নিয়ে যাও। আমরা ভাঙি নি, ছিঁড়ি নি, নষ্ট করি নি, নোঙরা করি নি, খালি ওর ছায়ায় বসে গল্প করেছি।"—কিন্তু ব্যাঙও আসে না, ছাতাও সরে না, ছায়াও নড়ে না, গল্পও ফুরোয় না।

এমনি করেই দিন কেটে যায়, এমনি করেই বছর ফুরোয়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় গ্রাম জুড়ে এই রব উঠল, "ব্যাঙ এসেছে, ব্যাঙ এসেছে। ছাতা নিতে ব্যাঙ এসেছে।"

কোথায় ব্যাঙ ? কে দেখেছে ? বনের ধারে ছাতার তলায়; লালু দেখেছে, কালু দেখেছে, চাঁদা ভোঁদা সবাই দেখেছে। কি করছে ব্যাঙ ? কিরকম ব্যাঙ ? লালু বলল, "পাটকিলে লাল ব্যাঙ—যেন হলুদগোলা চুন। এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" কালু বলল, "ছাইয়ের মতন ফ্যাক্‌সা রঙ, এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" চাঁদা বলল, "চক্‌চকে সবুজ, যেন নতুন কচি ঘাস—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।" ভোঁদা বলল, "ভুসো-ভুসো রঙ, যেন পুরোনো তেঁতুল-তেঁতুল—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।"

গ্রামের যত বুড়ো, যত মহা-মহা পণ্ডিত সবাই বলল, "কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তোরা কি দেখেছিস আবার বল।" লালু কালু চাঁদা ভোঁদা সবাই বললে, "ছাতার তলায় জ্যান্ত ব্যাঙ, তার চার হাত লম্বা ল্যাজ!" শুনে সবাই মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু উঁহু! তাহলে কক্ষনো সেটা ব্যাঙ নয়, সেটা বোধহয় ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচি। তা নইলে ল্যাজ থাকবে কেন?"

ব্যাঙ না হোক, ব্যাঙের ছেলে তো বটে—ছেলে না হোক নাতি, কিম্বা ভাইপো, কিম্বা ব্যাঙের কেউ তো বটে। সবাই বললে, "চল্ চল্, দেখবি চল্।" সবাই মিলে দৌড়ে চলল।

মাঠের পারে, বনের ধারে, ব্যাঙ-ছাতার আগায় বসে কে একজন রোদ পোয়াচ্ছে। রঙটা যেন শ্যাওলা-ধরা গাছের বাকল, ল্যাজখানা তার ঘাসের ওপর ঝুলে পড়েছে, এক চোখ বুজে এক চোখ খুলে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে। সবাই তখন চেঁচিয়ে বললে, "তুমি কে হে? কস্তুম্? তুম্ কোন্ হায়? হু আর ইউ?" শুনে সে ডাইনেও তাকালে না, বাঁয়েও তাকালে না, খালি একবার রঙ বদলে খোলা চোখটা বুজলে আর বোজা চোখটা খুললে, আর চিড়িক্ করে এক হাত লম্বা জিভ বার করেই তক্ষুনি আবার গুটিয়ে নিলে।

গ্রামের যে হোম্‌রা বুড়ো, সে বলল, "মোড়ল ভাই, ওটা যে জবাব দেয় না? কালা নাকি?" মোড়ল বলল, "হবেও বা।" সর্দার খুড়ো সাহস করে বলল, "চল না ভাই, এগিয়ে যাই, কানের কাছে চেঁচিয়ে বলি।" মোড়ল বলল, "ঠিক বলেছ।" হোম্‌রা বলল, "তোমরা এগোও। আমি এই আঁক্‌শি নিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে উঁচিয়ে বসি। যদি কিছু করতে আসে, ঘ্যাঁচাৎ ক'রে কুপিয়ে দেব।"

তখন সর্দার সেই ছাতার ওপর উঠে ল্যাজওয়ালাটার কানের কাছে হঠাৎ "কোন হ—া—য়্" বলে এমনি জোরে হাঁকড়ে উঠল যে, সেটা আরেকটু হলেই ছাতার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে, দুচোখ তাকিয়ে বলল, "উঃ? অত চেঁচান কেন মশাই? আমি কি কালা?" তখন সর্দার নরম হ'য়ে বলল, "তুমি ব্যাঙের কেউ হও না?" জন্তুটা তখন "না-না-না-না—কেউ না—কেউ না—কেউ না" ব'লে দুই চোখ বুজে ভয়ানক রকম দুলতে লাগল।

তাই না দেখে সর্দার বুড়ো চিৎকার করে বলল, "তবে যে তুমি ছাতা নিতে এসেছ?" সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচাতে লাগল, "নেমে এসো, নেমে এসো—শিগ্‌গির নেমে এসো।" মোড়ল খুড়ো ছুটে গিয়ে প্রাণপণে তার ল্যাজটা ধরে টানতে লাগল।

আর হোম্‌রা বুড়ো ঝোপের মধ্যে থেকে আঁক্‌শিটা উঁচিয়ে তুলল। ল্যাজওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলল, "কি আপদ! মশাই, ল্যাজ ধরে টানেন কেন? ছিঁড়ে যাবে যে?"

সর্দার বলল, "তুমি কেন ব্যাঙের ছাতায় চড়েছ? আর পা দিয়ে ছাতা মাড়াচ্ছ?" জন্তুটা তখন আকাশের দিকে গোল গোল চোখ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বলল, "কি বললেন? কিসের কি?" সর্দার বলল, "বললাম যে ব্যাঙের ছাতা।"

যেমনি বলা, অমনি সে খ্যাক খ্যাক খ্যাক খ্যাক খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে হাসতে, একেবারে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ল। তার গায়ে লাল নীল হলদে সবুজ রামধনুর মতো অদ্ভুত রঙ খুলতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল, "কি হয়েছে? কি হয়েছে?" কেউ বলল, "জল দাও," কেউ বলল, "বাতাস কর।" অনেকক্ষণ পর জন্তুটা ঠাণ্ডা হয়ে, উঠে বলল, "ব্যাঙের ছাতা কিহে? ওটা বুঝি ব্যাঙের ছাতা হল? যেমন বুদ্ধি তোমাদের! ওটা ছাতাও নয়, ব্যাঙেরও কিছু নয়। যারা বোকা, তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।" শুনে কেউ কোন কথা বলতে পারল না, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষকালে ছোকরা মতো একজন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে মশাই?" ল্যাজওয়ালা বলল "আমি বহুরূপী—আমি গিরগিটির খুড়তুত ভাই, গোসাপের জ্ঞাতি। এটা এখন আমার হল—আমি বাড়ি নিয়ে যাব।"

এই বলে সে "ব্যাঙের ছাতা"টাকে বগলদাবা করে নিয়ে, গম্ভীরভাবে চলে গেল। আর সবাই মিলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

সন্দেশ—১৩২৬

ব্যাঙের রাজা

রাজবাড়িতে যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের পাশে ব্যাঙেদের পুকুর। সোনাব্যাঙ, কোলাব্যাঙ, গেছোব্যাঙ,- মেঠোব্যাঙ— সকলেরই বাড়ি সেই পুকুরের ধারে। ব্যাঙেদের সর্দার যে বুড়ো ব্যাঙ, সে থাকে দেয়ালের ধারে, একটা মরা গাছের ফাটলের মধ্যে, আর ভোর হলে সবাইকে ডাক দিয়ে জাগায়—"আয় আয় আয়—গ্যাঁক্‌ গ্যাঁক্‌ গ্যাঁক্‌—দেখ দেখ দেখ—ব্যাঙ ব্যাঙ ব্যাঙ— ব্যাঙাচি।" এই বলে সে অহংকারে গাল ফুলিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর ব্যাঙগুলো সব "যাই যাই যাই—থাক থাক থাক" ব'লে, ঘুম ভেঙে, মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে, পুকুরপারের সভায় বসে।

একদিন হয়েছে কি, সর্দার ব্যাঙ ফুর্তির চোটে লাফ দিয়েছে উলটোমুখে ডিগবাজি খেয়ে—আর পড়বি তো পড়, একেবারে দেয়াল টপকে রাজপথের মধ্যিখানে। রাজা তখন সভায় চলেছেন, সিপাইশান্ত্রী লোকলস্কর দলবল সব সঙ্গে চলছে। মোটা মোটা সব নাগরাই জুতো, খটমট ঘ্যাচম্যাচ করে ব্যাঙ বুড়োর মাথার ওপর দিয়ে

ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে এমনি রোখ করে চলতে লেগেছে, যে ভয়ে ব্যাঙের প্রাণ তো যায় যায়! হঠাৎ কোত্থেকে কার একটা লাঠি না ছাতা না কিসের গুঁতো এসে এমনি ধাঁই করে ব্যাঙের গায়ে লেগেছে যে সে বেচারা ঠিকরে গিয়ে পথের ধারে ঘাসের ওপর চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ব্যাঙ বুড়োর খুব লেগেছিল, কিন্তু হাতও ভাঙে নি, পাও ভাঙে নি, সে আস্তে আস্তে উঠে বসল—আর চারিদিকে তাকিয়ে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল দেখে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে খুব সাবধানে মুখ বার করে সে চেয়ে দেখল, মাথায়-মুকুট রঙিন-পোশাক রাজা, আলো ঝলমল চতুর্দোলায় চড়ে সভায় যাচ্ছেন। লোকেরা সব "রাজা, রাজা" বলে নমস্কার করছে, নাচছে, গাইছে আর ছুটোছুটি করছে। আর রাজামশাই চতুর্দোলায় বসে খুশি হয়ে, এর দিকে তাকাচ্ছেন, ওর দিকে তাকাচ্ছেন, আর কেবলি হাসছেন। তাই দেখে ব্যাঙের বড় ভালো লাগল, সেও দু হাত তুলে নমস্কার করতে লাগল আর বলতে লাগল, "রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা!" তার মনে হল রাজামশাই ঠিক যেন তার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেললেন! ব্যাঙ তখন কাঁদ-কাঁদ হয়ে নিশ্বাস ফেলে ভাবল, 'আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!'

তারপর ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজে খুঁজে ব্যাঙ যখন বাসায় ফিরল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সবাই বলল, "সর্দার বুড়ো, সর্দার বুড়ো সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে? আমরা যে কত ডাকলাম, কত খুঁজলাম, তুমি তো কই সাড়াও দিলে না।" সর্দার বলল—"চোপ্ চোপ্ চোপ্ রাও! রাজা দেখতে গিয়েছিলাম।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সব এক সঙ্গে "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" "রাজা কে ভাই?" বলে চেঁচিয়ে উঠল। বুড়ো তখন গাল ফুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে, দুচোখ বুজে, দুহাত তুলে লাফিয়ে বলল, "রাজা হচ্ছে এই এত্তো বড়ো উঁচু, আর ধবধবে সাদা আর ঝক্‌ঝকে আলোর মতো—আর তাকে দেখলেই সবাই মিলে ডাকতে থাকে—"রাজা রাজা রাজা রাজা।" তাই শুনে ব্যাঙেরা সবাই বলতে লাগল, "আহা! আহা! আমাদের যদি একটা রাজা থাকত!" তাদের যে রাজা নেই এই কথা ভাবতে ভাবতে তাদের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। বুড়ো ব্যাঙ বলল, "ভাই সকল, এসো আমরা রাজার জন্য দরখাস্ত করি।" তখন সবাই মিলে গোল হয়ে বসে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, নানান সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা চাই রাজা চাই—রাজা চাই রাজা চাই।"

ব্যাঙ পুকুরের ব্যাঙ-দেবতা—যিনি বাদলা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঁঝরি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন—তিনি তখন আকাশতলায় চাদর মেলে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্যাঙেদের চিৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "বৃষ্টিও নেই, বাদলাও নেই, মেঘের কোন চিহ্নও নেই, বাছারা সব চেঁচাও কেন?" ব্যাঙেরা বলল, "আমাদের রাজা নেই, রাজা চাই।" দেবতা বললেন, "এই নে রাজা।" বলে মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙে তাদের সামনে ফেলে দিলেন।

ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার মাথার ওপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চক্‌চক্ করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙেদের ফুর্তি আর ধরে না। তারা গোল হয়ে ঘিরে বসে মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গাইতে লাগল—"রাজা রাজা রাজা রাজা—রাজা রাজা রাজা রাজা—"

এমনি করে দুদিন যায়, দশদিন যায়, শেষটায় একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নি বললেন, "ছাই রাজা! কর্তা যে সেদিন রাজা দেখলেন, এর চেয়ে সে অনেক ভালো। এ রাজা নড়েওনা চড়েওনা, এদিকেও দেখেনা ওদিকেও দেখেনা—ছাই রাজা! তাই শুনে সবাই বলল, "ছাই রাজা! ছাই রাজা!—নড়েও না চড়েও না, দেখেও না শোনেও না—ছাই রাজা!" তখন আবার বুড়ো ব্যাঙ গাছের উপর চড়ে বলল, "ভাই সকল এসো আমরা দরখাস্ত করি—আমাদের ভালো রাজা চাই।" আবার সবাই গোল হয়ে বসে আকাশপানে চোখ তাকিয়ে নানান সুরে ডাকতে লাগল—"রাজা চাই! রাজা চাই! ভালো রাজা—নতুন রাজা।" তাই শুনে ব্যাঙ দেবতা জেগে বললেন, "ব্যাপারখানা কি? এই তো সেদিন তোদের রাজা দিলাম, এর মধ্যে আবার নতুন কি হল?" ব্যাঙেরা বলল, "ও রাজা ছাই রাজা! ও রাজা বিশ্রী রাজা—ও রাজা নড়েও না চড়েও না—ও রাজা চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না চাই না—" ব্যাঙ দেবতা বললেন, "থাম্ তোরা থাম্—নতুন রাজা দিচ্ছি।" এই ব'লে, একটা বককে সেই পুকুরের ধারে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই নে তোদের নতুন রাজা।"

তাই না দেখে, ব্যাঙেরা সব অবাক হয়ে বলতে লাগল, "বাপ্ রে বাপ! কি প্রকাণ্ড রাজা চক্চকে ঝক্ঝকে ধবধবে সাদা! ভালো রাজা! সুন্দর রাজা! রাজা রাজা রাজা রাজা।" বকের তখন খিদে ছিল না, মাছ খেয়ে পেট ভরা ছিল, তাই সে কিছু বলল না; খালি চোখ মিটমিট করে একবার এদিকে তাকাল, একবার ওদিকে তাকাল, তারপর এক পা তুলে চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে ব্যাঙেদের উৎসাহ আর ধরে না, তারা প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল হল, সন্ধে হল—তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি এল—তখন ব্যাঙেদের গান গাওয়া বন্ধ হল।

তার পরের দিন সকালবেলায় উঠে যেমনি তারা গান ধরেছে, অমনি বক রাজা এসে একটা গোব্দামতন মোটা ব্যাঙকে টপাস্ করে মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে! তাই দেখে ব্যাঙেরা সব হঠাৎ কেমন মুষড়ে গেল—তাদের 'রাজা রাজা' গান একেবারে পাঁচ সুর নেমে গেল। বকরাজা ব্যাঙটিকে দিয়ে জলযোগ করে একটি ঠ্যাঙ মুড়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

এমনি করে এক-এক বেলায় এক-একটি ব্যাঙ বকরাজার পেটের মধ্যে যায়। ব্যাঙ মহলে হৈ চৈ লেগে গেল। সবাই মিলে সভায় ব'সে যুক্তি করে বলল, "এটা বড় অন্যায় হচ্ছে। রাজাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, সে হল আমাদের রাজা, সে এমন করলে আমরা পালাই কোথা?" কিন্তু বুঝিয়ে বলবে কে? সর্দার গিন্নি বললেন, "তার জন্য ভাবছিস কেন? এতে আর মুশকিল কিসের? এই দেখ না, আমিই গিয়ে বলে আসছি।"

সর্দার গিন্নি বকরাজার পায়ের সামনে গ্যাঁট হয়ে বসে, হাতমুখ নেড়ে কড়কড়ে গলায় বলতে লাগলেন, "ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝক্ঝকে রঙ ভালো, তোর এক পা-ও ভালো, দুই পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভালো নয়—তুই আমাদের খাস কেন? শামুক আছে শামুক খা না, পোকা-মাকড় প্রজাপতি তাও তো তুই খেতে পারিস। রাজা হয়ে আমাদের খেতে চাস? ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাম রাম রাম রাম—অমন আর কক্ষনো করিস নে।" বক দেখলে তার পায়ের কাছে দিব্যি একটা নাদুস্নুদুস্ ব্যাঙ, তার

নরম নরম গোলগাল চেহারা! টপ্ করে বকরাজার জিভ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল আর খপ্ করে সর্দার গিন্নি তার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন!

ব্যাঙেদের মুখে আর কথাটি নেই। সবাই তাড়াতাড়ি চট্‌পট্ সরে বসে বড়-বড় হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পরে সর্দার ব্যাঙ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, "পাজি রাজা! লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু রাজা!" তাই শুনে সবাই এক সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, "পাজি রাজা! দুষ্টু রাজা!—চাই না চাই না চাই না চাই না—রাজা চাই না, রাজা চাই না।"

ব্যাঙ দেবতা জেগে বললেন, "দূর ছাই! আবার কি হল?" ব্যাঙেরা বলল, "বাপ রে বাপ্! বাপ রে বাপ্! কি দুষ্টু রাজা! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও!"

তখন ব্যাঙ দেবতা হুশ্ করে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে পালাল। আর ব্যাঙেরা সব বাসায় গিয়ে বলতে লাগল, "গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ গ্যাঁক্—বাপ্ বাপ্ বাপ্—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—রাজাটাজা আর কক্ষনো চাইব না।"

সন্দেশ—১৩২৭

পুতুলের ভোজ

পুতুলের মা খুকি আজ ভয়ানক ব্যস্ত। আজ কিনা ছোট্ট পুতুলের জন্মদিন, তাই খুব খাওয়ার ধুম লেগেছে। ছোট্ট টেবিলের ওপর ছোট্ট-ছোট্ট থালাবাটি সাজিয়ে, তার মধ্যে কি চমৎকার করে খাবার তৈরি করে রাখা হয়েছে। আর চারদিকে সত্যি-কারের ছোট্ট-ছোট্ট চেয়ার সাজানো রয়েছে, পুতুলেরা বসে খাবে বলে।

খুকির যে ছোটদাদা, তার কিনা সাড়ে চার বছর বয়স, তাই সে বলে, "পুতুলরা খেতেই পারে না, তাদের আবার জন্মদিন কি?" কিন্তু খুকি সে কথা মানবে কেন? সে বলে, "পুতুলরা সব পারে। কে বলল পারে না? কে বলল যে কক্ষনো কোনদিন তারা কথা বলে না, কক্ষনো কোনদিন খায় না?"—খোকাপুতুলের যখন অসুখ করেছিল তখন সে কি 'মা, মা' বলে কাঁদতো না? নিশ্চয়ই কাঁদতো। তা না হলে খুকি জানলো কি করে যে তার অসুখ করেছে? খুকির দাদা এ-সবের জবাব দিতে পারে না, তাই সে 'বোকা মেয়ে, হাঁদা মেয়ে' বলে মুখ ভেংচিয়ে চলে যায়।

খুকি গেল তার মার কাছে নালিশ করতে। মা সব শুনেটুনে বললেন, "সব সময়ে সকলের কাছে কি পুতুলরা জ্যান্ত হয়? যেদিন দেখবি পুতুল সত্যি করে খাবার খাচ্ছে, সেদিন ছোড়দাকে ডেকে দেখাস।" খুকি বলল, "আজকে যদি ওরা জেগে উঠে খাবার খেতে থাকে, তা হলে কি মজাই হবে! আমার বোধ হয় রাত্তিরে যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, তখন তাদের দিন হয়! তা না হলে আমরা তো দেখতে

পেতাম? সেই যে একদিন টিনের তৈরি দুষ্টু পুতুলটা খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় ওরা রাত্রে উঠে মারামারি করেছিল! তা না হলে খাট থেকে পড়লো কেন? আজ থেকে আমি ঘুমোবার সময় খুব ভালো করে কান পেতে থাকব।''

পুতুলের জন্মদিনে কি চমৎকার খাবার! ময়দার মিঠাই, ময়দার পিঠে, ছোট্ট-ছোট্ট নারকেলের মোয়া, আর ছোট্ট-ছোট্ট গুড়ের টিকলি—এমনি সব আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস। রাত্রে শোবার আগে খুকি তার পুতুলদের ঝেড়ে মুছে, নাইয়ে, খাইয়ে ঘুম পাড়ালো আর বলে দিল, ''এই দেখ, খাবার টাবার রইল, রাত্রে উঠে খাস।'' কোথায় কে বসবে, কোন্‌টার পর কোন্‌টা খাবে, ঝগড়া করলে কে কি শাস্তি পাবে, সব বলে, তারপর দুষ্টু পুতুলটাকে খুব বকে, ধমকে আর ছোট্ট পুতুলকে জন্মদিনের জন্য খুব খানিকটা আদর-টাদর করে, তারপর খুকি গেল বিছানায় শুতে। যেমনি শোওয়া, অমনি ঘুম।

খুকিও ঘুমিয়েছে, আর অমনি ঘরের মধ্যে কাদের টিপটিপ পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাদের একজন খুকুমণির জুতোর কাছে, ঘরের কোণে, ছবির বইগুলোর কাছে, পুতুলদের চাদরঢাকা খাটের কাছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে; এটা ওটা শুঁকছে আর কুটুর কুটুর করে এতে ওতে কামড়িয়ে দেখছে! খানিকটা বর্ণপরিচয়ের পাতা খেয়ে দেখলো, ভালো লাগে না; জুতোর ফিতেটা চিবিয়ে দেখলো তার মধ্যে কিচ্ছু
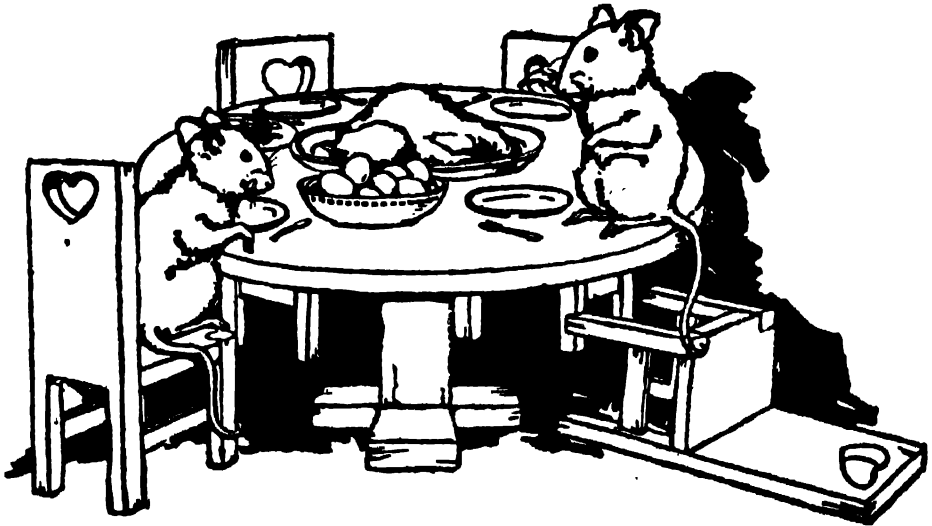
রস নেই; টিনের পুতুলটাকে কামড়িয়ে দেখল—ওরে বাবা, কি শক্ত! এমন সময়ে, হঠাৎ অন্ধকারে তার চোখ পড়লো—টেবিলে সাজানো ও-সব কি রে!

দৌড়ে, চেয়ারটেবিল উল্টে, এক লাফে টেবিলের ওপর চড়ে সে একটুখানি শুঁকেই ব্যস্ত হয়ে বলল, ''কিঁচ কিঁচ, কিঁই-চ!'' তার মানে, ''ওগো শিগ্গির এসো—দেখে যাও!'' অমনি টিপটিপ, টুপুটুপু, ট্যাপট্যাপ, থপ করে সেইরকম আরেকটা এসে হাজির। ঠিক সেইরকম লোমে ঢাকা ছেয়ে রঙ, সেইরকম সরু লম্বা ল্যাজ, আর

সেইরকম চোখা চোখা নাক আর মিটমিটে কালো কালো চোখ। দুজনের উৎসাহ আর ধরে না! টপাটপ, টপাটপ খাচ্ছে আর তাদের ভাষায় কেবলি বলছে, "এটা খাও ওটা খাও! এটা কি সুন্দর! ওটা কেমন চমৎকার।" এমনি করে দেখতে দেখতে জন্মদিনের যত খাবার সব চেটেপুটে শেষ!

সকালবেলায় খুকি উঠে দেখলো—ওমা! কি আশ্চর্য! সব খাওয়া শেষ হয়ে গেছে! কখন যে পুতুলগুলো জেগে উঠলো, কখন যে খেল আর কখন যে আবার ঘুমোল, কিছুই সে টের পায় নি। "খেয়েছে! খেয়েছে! সব খাবার খেয়েছে!" বলে সে এমন চেঁচিয়ে উঠলো যে মা, বাবা, ছোড়দা, বড়দা, সবাই ছুটে এসে হাজির।

ব্যাপার দেখে আর খুকির কথা শুনে সবাই বলল, "তাইতো! কি আশ্চর্য!" খালি ছোড়দা বলল, "তা বৈকি! ও নিজে খেয়ে এখন বলছে—পুতুলে খেয়েছে।" দেখ তো কি অন্যায়!

আসলে ব্যাপারটা যে কি, তা কেবল মা জানেন আর বাবা জানেন, কারণ তাঁরা ঘরের কোণে ইঁদুরের ছোট্ট-ছোট্ট পায়ের দাগ দেখেছিলেন। কিন্তু সে কথা খুকিকে যদি বল, সে কক্ষনো তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

সন্দেশ—১৩২৭

হিংসুটি

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে—বেজায় হিংসুটে, আর বেজায় ঝগড়াটে। তার নাম বলতে গেলেই তো মুশকিল, কারণ ঐ নামে সন্দেশের শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকেন, তাঁরা তো আমার উপর চটে যাবেন।

হিংসুটির দিদি বড় লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজে কর্মে তেমনি লেখা পড়ায়। হিংসুটির বয়স সাত বছর হয়ে গেল, এখনো তার প্রথম ভাগই শেষ হল না—আর তার দিদি তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়—সে এখনই 'বোধোদয়' আর 'ছেলেদের রামায়ণ' প'ড়ে ফেলেছে। ইংরিজি ফার্স্টবুক তার কবে শেষ হয়ে গেছে। হিংসুটি কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তার দিদিকেও হিংসে করতো। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটি খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি সেবার ছবির বই প্রাইজ পেলে, আর হিংসুটি কিচ্ছু পেলে না, তখন যদি তার অভিমান দেখতে! সে সারাটি দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে রইল—কারো সঙ্গে কথাই বলল না। তারপর রাত্রি বেলায় দিদির অমন সুন্দর বইখানাকে কালি ঢেলে মলাট ছিঁড়ে কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটে মেয়ে!

হিংসুটির মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু বোনকেই আদর করে খেতে

দিয়েছেন। হিংসুটি খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কিরে, কি হল ? জিভে কামড় লাগল নাকি ?" হিংসুটির মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদছে। তখন তার মা এক ধমক দিয়ে বললেন, "কি হয়েছে বল না!" তখন হিংসুটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দিদির ঐ রসমুণ্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়।" তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুণ্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটি নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্ধেক সে খেতে পারল না—নষ্ট করে ফেলে দিল। দিদির জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন জামা নতুন কাপড় আসলে হিংসুটি তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে।

একদিন হিংসুটি তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কি, লাল জামা গায়ে, লাল জুতা পায়ে, টুকটুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটি বলল, "দেখেছ! দিদি কি দুষ্টু! নিশ্চয় মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় করেছে—আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে!" তখন তার ভয়ানক রাগ হ'ল। সে ভাবল, 'আমি তো ছোট বোন, আমারই তো পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে?' এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কি সুন্দর পুতুল! কেমন মিট্‌মিটে চোখ, আর ফুটফুটে মুখ, কেমন কচি কচি হাত পা, আর টুক্‌টুকে জামা কাপড়। যত সব ভালো ভালো জিনিস সব কিনা দিদি পাবে! হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে

ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ গেল না; সে একটা ডাণ্ডা নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পুতুলটাকে মারতে লাগল। মারতে মারতে তার নাক মুখ হাত পা ভেঙে তার জামা কাপড় ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেলবেলা মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বললেন, "তোর জন্য কি এনেছি দেখিস নি?" শুনে হিংসুটি দৌড়ে এল, "কই মামা? কি এনেছ? দাও না।"

মামা বললেন, "মার কাছে দেখ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।" হিংসুটি উৎসাহে নাচতে লাগল, মাকে বলল, "কোথায় রেখেছ মা?" মা বললেন, "আলমারিতে

আছে।" শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠ্ল। সে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল, "সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পরানো—মাথায় কালো কালো কোঁকড়ান চুল ছিল?" মা বললেন, "হ্যাঁ—তুই দেখেছিস্ নাকি?"

হিংসুটির মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এর পরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আর কি করে কমবে?

সন্দেশ—১৩২৪

পেটুক

"হরিপদ! ও হরিপদ!"

হরিপদর আর সাড়া নেই। সবাই মিলে এত চেঁচাচ্ছে, হরিপদ আর সাড়াই দেয় না। কেন, হরিপদ কালা নাকি? কানে কম শোনে বুঝি? না, কম শুনবে কেন—বেশ দিব্যি পরিষ্কার শুনতে পায়। তবে হরিপদ কি বাড়ি নেই? তা কেন? হরিপদ মুখভরা ক্ষীরের লাড়ু, ফেলতেও পারে না, গিলতেও পারে না। কথা বলবে কি করে? আবার ডাক শুনে ছুটে আসতেও পারে না—তা হলে যে ধরা পড়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি লাড়ু গিলছে আর জল খাচ্ছে; আর যতই গিলতে চাচ্ছে, ততই গলার মধ্যে লাড়ুগুলো আঠার মতো আটকে যাচ্ছে। বিষম খাবার জোগাড় আর কি!

এটা কিন্তু হরিপদর ভারি বদ অভ্যাস! এর জন্য কত ধমক, কত শাসন, কত শাস্তি, কত সাজাই যে সে পেয়েছে, তবু তো তার আক্কেল হল না। তবু সে লুকিয়ে চুরিয়ে পেটুকের মতো খাবেই। যেমন হরিপদ, তেমনি তার ছোট ভাইটি। এদিকে পেটরোগা, দুদিন অন্তর অসুখ লেগেই আছে, তবু হ্যাংলামি তার যায় না।

সেই যে এক বিষম পেটুকের গল্প শুনেছিলাম—সে একদিন এক বড় নেমন্তন্নের দিনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "আজ আমি নেমন্তন্নে যাব না।" সবাই বললে, "কি ভয়ানক! তুমি এমন ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞা করছ কেন?" কিন্তু সে কারো কথা শুনল না, ঘরের মধ্যে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল, আর সকলকে বলে দিল, "ভাই, তোমরা আমার ঘরের বাইরে তালা লাগিয়ে দাও।" পেটুক মশায় ঘরের মধ্যে বন্ধ আছেন, কিন্তু মনটাকে তো আর বন্ধ করে রাখা যায় না—মনটা তার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই নেমন্তন্নের জায়গায়। সে ভাবছে—'এতক্ষণে বোধ হয় আসন পেতেছে আর পাত্ত পড়েছে—এইবারে বোধ হয় খেতে ডাকছে। কি খেতে দিচ্ছে? লুচি নিশ্চয়ই? লুচি আর বেগুনভাজা দিয়ে গেছে—এবার ডাল, তরকারি, ছক্কা, সব আসছে। তা আসুক, আমি তো আর যাচ্ছি না।—এইবারে কি মাছের কালিয়া?—তারপরে মাংস বুঝি?—তা হোক না—আমি তো আর যাচ্ছি না? মাংসটা না জানি কেমন রেঁধেছে! সেবারে ওদের বাড়ি রান্না অতি চমৎকার হয়েছিল। অবিশ্যি

এখনো সময় আছে—কিন্তু থাকলেই-বা কি? আমি তো যাচ্ছি না। যাক, এতক্ষণে টক দেওয়া হয়েছে—এইবার দই, সন্দেশ, রাবড়ি—আর রসগোল্লা! ঐ যা, ফুরিয়ে গেল তো!" বলেই এক লাফে জানলা টপকে হাঁপাতে হাঁপাতে সে নেমন্তন্নের জায়গায় গিয়ে হাজির!

আমাদের হরিপদর দশাও ঠিক তাই। যেদিন শাস্তিটা একটু শক্ত রকমের হয় তারপর কয়েকদিন ধরে প্রতিজ্ঞা থাকে, "এমন কাজ আর করব না।" যখন অসময়ে অখাদ্য খেয়ে, রাত্রে তার পেট কামড়ায় তখন কাঁদে আর বলে, "আর না—এইবারেই শেষ!" কিন্তু দুদিন না যেতে আবার যেই সেই। তাই সবাই বলে, "কাবু হলেই 'আর গাব খাব না', আর তাজা হলেই 'গাব খাব না তো খাব কি'?" এই তো কিছুদিন আগে পিসিমার ঘরে দই খেতে গিয়ে তারা জব্দ হয়েছিল—কিন্তু তবু তো লজ্জা নেই!

হরিপদর ছোট ভাই শ্যামাপদ এসে বলল, "দাদা, শিগ্গির এসো। পিসিমা এইমাত্র এক হাঁড়ি দই নিয়ে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন।" দাদাকে এত ব্যস্ত হয়ে এ খবরটা দেবার অর্থ এই যে, পিসিমার ঘরে যে শেকল দেওয়া থাকে, শ্যামাপদ সেটা হাতে নাগাল পায় না—তাই দাদার সাহায্য দরকার হয়। দাদা এসে আস্তে আস্তে শেকলটি খুলে, আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের তলায় দইয়ের হাঁড়ি থেকে এক খাবলা তুলে নিয়ে, খপ করে মুখে দিয়েছে। মুখে দিয়েই চিৎকার! কথায় বলে "ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে", কিন্তু হরিপদর চেঁচানো তার চাইতেও সাংঘাতিক! চিৎকার শুনে মা, মাসি, দিদি, পিসি, যে যেখানে ছিলেন সব "কি হল, কি হল" বলে দৌড়ে এলেন। শ্যামাপদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে দাদার চিৎকারের নমুনা শুনেই এক দৌড়ে ঘোষেদের পাড়ায় গিয়ে হাজির! সেখানে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো তার বন্ধু শান্তি ঘোষের কাছে সে পড়া বুঝিয়ে নিচ্ছে। এদিকে হরিপদর অবস্থা দেখেই পিসিমা বুঝেছেন যে হরিপদ দই ভেবে তাঁর চুনের হাঁড়ি চেখে বসেছে! তারপর হরিপদর যা সাজা! এক সপ্তাহ ধরে সে না পারে চিবোতে, না পারে গিলতে! তার খাওয়া নিয়েই এক মহা হাঙ্গাম! কিন্তু তবু তো তার লজ্জা নেই—আজ আবার লুকিয়ে কোথায় লাড়ু খেতে লেগেছে!

খানিক বাদে মুখখানি ধুয়ে মুছে হরিপদ ভালোমানুষের মতো এসে হাজির! হরিপদর বড়মামা বললেন, "কি রে! এতক্ষণ কোথায় ছিলি?" হরিপদ বলল, "এই তো, উপরে ছিলাম।" "তবে আমরা এত চেঁচাচ্ছিলাম—তুই জবাব দিচ্ছিলি না যে?" হরিপদ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "আজ্ঞে, জল খাচ্ছিলাম কিনা—" "শুধু জল? না কিছু স্থলও ছিল?" হরিপদ শুনে হাসতে লাগলো—যেন তার সঙ্গে ভারি একটা রসিকতা করা হয়েছে। এর মধ্যে তার মেজমামা মুখখানা গম্ভীর করে এসে হাজির! তিনি ভেতর থেকে খবর এনেছেন যে হরিপদ একটু আগেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপর থেকেই প্রায় দশবারোখানা ক্ষীরের লাড়ু কম পড়ছে। তিনি এসেই হরিপদর বড়মামার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরাজিতে ফিসফাস কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "বাড়িতে ইঁদুরের যে রকম উৎপাত, ইঁদুর মারবার একটা বন্দোবস্ত না করলে চলছে না। চারদিকে যে রকম প্লেগ আর ব্যারাম এই পাড়াসুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষা নেই।" বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে—দিদিকে বলেছি, সেঁকো বিষ দিয়ে লাড়ু

পাকাতে—সেগুলো পাড়াময় ছড়িয়ে দিলেই ইঁদুরবংশ নির্বংশ হবে।" হরিপদ জিজ্ঞাসা করলো, "লাড়ু কবে পাকানো হবে?" বড়মামা বললেন, "সে এতক্ষণে হয়ে গেছে—সকালেই টেঁপিকে দেখছিলাম একতাল ক্ষীর নিয়ে দিদির সঙ্গে লাড়ু পাকাতে বসেছে।" হরিপদর মুখখানা আমসির মতো শুকিয়ে এলো—সে খানিকটা ঢোক গিলে বলল, "সেঁকোবিষ খেলে কি হয়, বড়মামা?" "হবে আবার কি? ইঁদুরগুলো মারা পড়ে, এই হয়।" "আর যদি মানুষ ঐ লাড়ু খেয়ে ফেলে?" "তা, একটু আধটু যদি খেয়ে ফেলে তো নাও মরতে পারে—গলা জ্বলবে, মাথা ঘুরবে, বমি হবে, হয়তো হাত-পা খিঁচবে।" "আর যদি একেবারে এগারোটা লাড়ু খেয়ে ফেলে?" বলে হরিপদ 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলল। তখন বড়মামা হাসি চেপে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "বলিস কিরে! তুই খেয়েছিস নাকি?" হরিপদ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হ্যাঁ বড়মামা, তার মধ্যে সাতটা খুব বড়-বড় ছিল। তুমি শিগ্গির ডাক্তার ডাকো, বড়মামা—আমার কিরকম গা ঝিম ঝিম আর বমি বমি করছে!"

মেজমামা দৌড়ে গিয়ে তাঁর বন্ধু রমেশডাক্তারকে পাশের বাড়ি থেকে ডেকে আনলেন। তিনি এসে প্রথমেই খুব একটা কড়া রকমের তিতো ওষুধ হরিপদকে খাইয়ে দিলেন। তারপর তাকে কি একটা শুঁকতে দিলেন, তার এমন ঝাঁজ যে, বেচারার দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। তারপর তাঁরা সবাই মিলে লেপকম্বল চাপা দিয়ে তাকে ঘামিয়ে অস্থির করে তুললেন। তারপর আরেকটা ভয়ানক উৎকট ওষুধ খাওয়ানো হলো, সে এমন বিস্বাদ আর এমন দুর্গন্ধ যে খেয়েই হরিপদ ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে লাগল।

তারপর ডাক্তার তার পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন। তিনদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না; চিরেতার ঝোল আর সাগু খেয়ে থাকবে। হরিপদ বলল, "আমি ওপরে মার কাছে যাব।" ডাক্তার বললেন, "না। যতক্ষণ বাঁচবার আশা আছে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ও আপনাদের এখানেই থাকবে।" বড়মামা বললেন, "হাঁ! মার কাছে যাবে, না আরো কিছু? মাকে এখন ভাবিয়ে তুলে তোমার লাভ কি? তাঁকে এখন খবর দেবার কিছু দরকার নেই।"

তিনদিন পরে যখন সে ছাড়া পেলো তখন হরিপদ আর সেই হরিপদ নেই—সে একেবারে বদলে গেছে। তার বাড়ির লোকে সবাই জানে হরিপদর ভারি ব্যারাম হয়েছিল—তার মা জানেন যে বেশি পিঠে খেয়েছিল বলে হরিপদর পেটের অসুখ হয়েছিল—হরিপদ জানে সেঁকোবিষ খেয়ে সে আরেকটু হলেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি, তা জানে কেবল হরিপদর বড়মামা আর মেজমামা, আর জানে রমেশডাক্তার—আর এখন জানলে তোমরা, যারা এই গল্প পড়ছ।

সন্দেশ—১৩২৪

"এই দ্যাখ টেঁপি, দ্যাখ কিরকম করে হাউই ছাড়তে হয়। বড় যে রাজুমামাকে ডাকতে চাচ্ছিলি? কেন, রাজুমামা না হলে বুঝি হাউই ছোটানো যায় না? এই দ্যাখ।"

দাদার বয়স প্রায় বছর দশেক হবে, টেঁপির বয়স মোটে আট, অন্য-অন্য ভাই-বোনেরা আরো ছোট। সুতরাং দাদার দাদাগিরির আর অন্ত নেই! দাদাকে হাউই ছাড়তে দেখে টেঁপির বেশ একটু ভয় হয়েছিল, পাছে দাদা হাউয়ের তেজে উড়ে যায়। কিন্তু দাদার ভরসা দেখে তারও একটু ভরসা হল।

দাদা হাউইটাকে হাতে নিয়ে, একটুখানি বেঁকিয়ে ধরে বিজ্ঞের মতো বলতে লাগল, "এই সলতের মতো দেখছিস, এইখানে আগুন ধরাতে হয়। সলতেটা জ্বলতে জ্বলতে যেই হাউই ভসভস করে ওঠে, অমনি, ঠিক সময়টি বুঝে—এই এমনি করে হাউইটিকে ছেড়ে দিতে হয়। এইখানেই হচ্ছে আসল বাহাদুরি। কাল দেখলি তো, প্রকাশটা কিরকম আনাড়ির মতো করছিল। হাউই জ্বলতে না জ্বলতে ফস করে ছেড়ে দিচ্ছিল। সেইজন্যই হাউইগুলো আকাশের দিকে না উঠে নিচু হয়ে এদিক-সেদিক বেঁকে যাচ্ছিল।"

এই বলে সবজান্তা দাদা একটি দেশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ভাইবোনেরা সব অবাক হয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। দেশলাইয়ের আগুনটি সলতের কাছে নিয়ে

দাদা ঘাড় বেঁকিয়ে, মুচকি হেসে আর একবার টেঁপিদের দিকে তাকালেন। ভাবখানা এই যে, আমি থাকতে রাজুমামা-ফাজুমামার দরকার কি?

ফ্যাঁস-ফোঁস-ছররর! এত শিগ্গির যে হাউয়ের আগুন ধরে যায় সেটা দাদার খেয়ালেই ছিল না, দাদা তখনো ঘাড় বেঁকিয়ে, হাসি-হাসি মুখ করে, নিজের বাহাদুরির কথা ভাবছেন। কিন্তু হাসিটি না ফুরোতেই হাউই যখন ফ্যাঁস করে উঠল, তখন সেই সঙ্গে দাদার মুখ থেকেও হাঁউমাউ গোছের একটা বিকট শব্দ আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। আর তার পরেই দাদা যে একটা লম্ফ দিলেন, তার ফলে দেখা গেল যে ছাতের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে অত্যন্ত আনাড়ির মতো তিনি হাত-পা ছুঁড়ছেন। কিন্তু তা দেখবার অবসর টেঁপিদের হয় নি। কারণ দাদার চিৎকার আর লম্ফভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে তারাও কান্নার সুর চড়িয়ে বাড়ির ভেতরদিকে রওনা হয়েছিল।

কান্নাটান্না থামলে পর রাজুমামা যখন দাদার কান ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল যে, দাদার হাতের কাছে ফোস্কা পড়ে গেছে আর গায়ের দু'তিন জায়গায় পোড়ার দাগ লেগেছে। কিন্তু তার জন্য দাদার তত দুঃখ নেই, তার আসল দুঃখ এই যে, টেঁপির কাছে তার বিদ্যেটা এমন অন্যায়ভাবে ফাঁস হয়ে গেল। রাজুমামা চলে যেতেই সে হাতে মলম মাখতে মাখতে বলতে লাগল, কোথাকার কোন্ দোকান থেকে হাউই কিনে এনেছে—ভালো করে মশলা মেশাতেও জানে না। বিষ্টু

পাঠকের দোকান থেকে হাউই আনলেই হত। বারবার বলেছি—রাজুমামা হাউই চেনে না, তবু তাকেই দেবে হাউই কিনতে।'' তারপর সে টেঁপিকে আর ভোলা ময়না আর খুকুনুকে, বেশ করে বুঝিয়ে দিল যে, সে যে চেঁচিয়েছিল আর লাফ দিয়েছিল সেটা ভয়ে নয়, হঠাৎ ফুর্তির চোটে।

সন্দেশ—১৩২৯

যতীনের জুতো

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, ''এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট কর তবে ঐ ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।''

যতীনের চটি লাগে প্রতিমাসে একজোড়া। ধুতি তার দুদিন যেতে না যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোন জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলো সব মলাটছেঁড়া, কোণ দুমড়োনো, স্লেটটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফাটা। স্লেটের পেনসিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোট-ছোট টুকরো টুকরো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল, লেড পেনসিলের গোড়া চিবোনো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেনসিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গেছিল। তাই দেখে ক্লাসের মাস্টারমশাই বলতেন, ''তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?''

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। দুদিন পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়দুড় করে সিঁড়ি নামা, যেতে যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হল। কাজেই একমাস যেতে না যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করলো। মা বললেন, ''ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, নাহলে একেবারে যাবে।'' কিন্তু মুচি ডাকা হয় না। চটির হাঁও বেড়ে চলে।

একটা জিনিসের যতীন খুব যত্ন করতো! সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটি তার মনে লাগতো সেটিকে সে যত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখতো। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কতদিন তাকে তাড়া খেতে হতো। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করতো তার আঠা চাই বলে। ঘুড়ির ল্যাজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটতে কাঁচি দরকার হলে সে মায়ের সেলায়ের বাক্স ঘেঁটে ঘন্ট করে রেখে দিত। ঘুড়ি ওড়াতে আরম্ভ করলে তার খাওয়া-দাওয়া মনে থাকতো না। সেদিন যতীন ইস্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়খানা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে চটিটা এতো ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুস্কিল। কিন্তু সিঁড়ি

দিয়ে নামবার সময় তার সে কথা মনে রইলো না; সে দুতিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে লাগলো! শেষকালে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে সমস্ত দাঁত বের করে ভ্যাংচাতে লাগলো! যেমনি সে শেষ তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নীচ থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁই সাঁই করে শূন্যের ওপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিকঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামলো, তখন যতীন দেখলো সে কোন্ অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে কাছে এলো, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে সেগুলোকে যত্ন করে ঝাড়তে লাগলো। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বরগোছের, সে যতীনকে বলল, "তুমি দেখছি ভারি দুষ্টু। জুতোজোড়ার এমন দশা করেছ? দেখ দেখি, আরেকটু হলে বেচারিদের প্রাণ বেরিয়ে যেত।" যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, "জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?" মুচিরা বলল, "তা না তো কি? তোমরা বুঝি মনে কর তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে জোরে ছোটো তখন ওদের লাগে না? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা মচমচ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গেছিল, তখন কি ওর লাগে নি? খুব লেগেছিল। সেইজন্যই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিস-পত্রের ভার আমাদের ওপর। তারা সে-সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।" মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, "নাও, সেলাই কর।" যতীন রেগে বলল, "আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।" মুচি একটু হেসে বলল, "এ কি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে 'করব না' বললেই হল! এই ছুঁচসুতো নেও, সেলাই কর।" যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, "আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।" মুচি বলল, "আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।" যতীন ভয়ে ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসলো। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নিচু করে থেকে থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই হলো। তখন সে মুচিকে বলল, "কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।" মুচি বলল, "সে কি! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনো বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোন জুতোর ওপর অত্যাচার না কর। তারপর দর্জির কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আর কি কি জিনিস নষ্ট করেছ দেখা যাবে।"

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোন-রকমে অন্য চটিটা সেলাই করলো। ভাগ্যে এ পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল।. সে বাড়িতে সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সিঁড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "যাও, একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও, আবার নেমে এসো। দেখ, আস্তে আস্তে একটি একটি সিঁড়ি উঠবে নামবে।" যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নীচে আসলে মুচিরা বলল, "হয় নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, দুবার তিনটে করে সিঁড়ি

ডিঙিয়েছ। আবার ওঠো। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙোবে না।" এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারির পা টনটন করছিল। সে এবার আস্তে আস্তে ওপরে উঠল, আস্তে আস্তে নেমে এল। তারা বলল, "আচ্ছা, এবার মন্দ হয় নি। তা হলে চল দর্জির কাছে।"

এই বলে তারা তাকে আরেকটা মাঠে নিয়ে গেল, সেখানে খালি দর্জিরা বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা জিগেস করল, "কি? কি ছিঁড়েছ?" মুচিরা উত্তর দিল, "নতুন ধুতিটা দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।" দর্জিরা মাথা নেড়ে বলল, "বড় অন্যায়, বড় অন্যায়! শিগ্‌গির সেলাই কর।" যতীনের আর না বলবার সাহস হলো না। সে ছুঁচসুতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে গেল। সবেমাত্র দু-এক ফোঁড় দিয়েছে, অমনি দর্জিরা চেঁচিয়ে উঠল, "ওকে কি সেলাই বলে? খোলো, খোলো!" অমনি করে, বেচারি যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, "খোলো, খোলো।" শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলে বলল, "আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আর আমি কখনো কাপড় ছিঁড়ব না, জুতো ছিঁড়ব না।" তাতে দর্জিরা হাসতে হাসতে বলল, "খিদে পেয়েছে? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে।" এই বলে তারা তাদের কাপড়ে দাগ দেবার পেনসিল কতগুলো এনে দিল, "তুমি তো পেনসিল চিবোতে ভালোবাস, এইগুলো চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।"

এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যতীন মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময়ে আকাশে বোঁ বোঁ করে কিসের শব্দ হল, আর যতীনের তালি দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের ওপর পড়ল। ঘুড়িটা ফিসফিস করে বলল, "তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগ্‌গির আমার ল্যাজটা ধর।" যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির ল্যাজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দর্জিরা বড়-বড় কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নীচের দিকে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটা কি হল কে জানে! যতীন দেখল সে সিঁড়ির নীচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

কিছুদিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, "আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফূর্তি নেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলা নেই, কিছুই নেই। তা নইলে একজোড়া জুতো চার মাস যায়?"

আসল কথা—যতীন এখনো সেই মুচিদের আর দর্জিদের কথা ভুলতে পারে নি।

গোপালের পড়া

দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই গোপাল অত্যন্ত ভালোমানুষের মতন মুখ করিয়া দুই-একখানা পড়ার বই হাতে লইয়া তিনতলায় চলিল। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে গোপ্‌লা, এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস?" গোপাল বলিল, "তিনতলায় পড়তে যাচ্ছি।"

মামা—"পড়বি তো তিনতলায় কেন? এখানে বসে পড়-না।"

গোপাল—"এখানে লোকজন যাওয়া আসা করে, ভোলা গোলমাল করে, পড়বার সুবিধা হয় না।"

মামা—"আচ্ছা, যা, মন দিয়ে পড় গে।"

গোপাল চলিয়া গেল, মামাও মনে মনে একটু খুশি হইয়া বলিলেন, "যাক, ছেলেটার পড়াশুনোয় মন আছে।"

এমন সময়ে ভোলাবাবুর প্রবেশ—বয়স তিন কি চার, সকলের খুব আদুরে। সে আসিয়াই বলিল, "দাদা কই গেল?" মামা বলিলেন, "দাদা এখন তিনতলায় পড়াশুনো করছে, তুমি এইখানে বসে খেলা কর।"

ভোলা তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর বসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিল, "দাদা কেন পড়াশুনো করছে, পড়াশুনো করলে কি হয়? কি করে পড়াশুনো করে?" ইত্যাদি। মামার তখন কাগজ পড়িবার ইচ্ছা, তিনি প্রশ্নের চোটে অস্থির হইয়া শেষটায় বলিলেন, "আচ্ছা ভোলাবাবু, তুমি ভোজিয়ার সঙ্গে খেলা কর গিয়ে, বিকেলে তোমায় লজেঞ্চুস এনে দেব।" ভোলা চলিয়া গেল। আধঘণ্টা পরে ভোলারামের পুনঃপ্রবেশ। সে আসিয়াই বলিল, "মামা, আমিও পড়াশুনো করব।" মামা বলিলেন, "বেশ তো, আরেকটু বড় হও, তোমায় রঙচঙে সব পড়ার বই এনে দেব।"

ভোলা—"না, সেরকম পড়াশুনো নয়, দাদা যেরকম পড়াশুনো করে সেইরকম।"

মামা—"সে আবার কিরে?"

ভোলা—"হ্যাঁ, সেই যে পাৎলা পাৎলা রঙিন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে, আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়, সেইরকম।"

দাদার পড়াশুনার বর্ণনা শুনিয়া মামার চক্ষুস্থির হইয়া গেল! তিনি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া তিনতলায় উঠিলেন, চুপি-চুপি ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন তাঁহার ধনুর্ধর ভাগ্নেটি জানালার সামনে বসিয়া একমনে ঘুড়ি বানাইতেছে। বইদুটি ঠিক দরজার কাছে তক্তাপোষের উপরে পড়িয়া আছে। মামা অতি সাবধানে বই দু-খানা দখল করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

খানিক পরেই গোপালচন্দ্রের ডাক পড়িল। গোপাল আসিতেই মামা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর ছুটির আর কদিন বাকি আছে?"

গোপাল বলিল—"আঠারো দিন।"

মামা—"বেশ পড়াশুনো করছিস তো? না কেবল ফাঁকি দিচ্ছিস?"

গোপাল বলিল—"না, এই তো, এতক্ষণ পড়ছিলাম।"

মামা—"কি বই পড়ছিলি?"

গোপাল—"সংস্কৃত।"

মামা—"সংস্কৃত পড়তে বুঝি আজকাল বই লাগে না? আর অনেকগুলো পাৎলা কাগজ, আঠা আর কাঠি নিয়ে নানারকম কারিকুরি করার দরকার হয়?"

গোপালের তো চক্ষু স্থির! মামা বলে কি? সে একেবারে হতভম্ব হইয়া হাঁ করিয়া মামার দিকে তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন—"বই কোথায়?"

গোপাল বলিল—"তিনতলায়।"

মামা বই বাহির করিয়া বলিলেন—"এগুলো কি?"

তাহার পর তাহার কানে ধরিয়া ঘরের এক কোণে বসাইয়া দিলেন। গোপালের ঘুড়ি, লাটাই, সুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম আঠারো দিনের জন্য মামার জিম্মায় বন্ধ রহিল।

সন্দেশ—১৩৩০

গল্প

"বড়মামা, একটা গল্প বল-না।"

"গল্প? এক ছিল গ, এক ছিল ল আর এক ছিল প—"

"না—ও গল্পটা না। ওটা বিচ্ছিরি গল্প—একটা বাঘের গল্প বল।"

"আচ্ছা। যেখানে মস্ত নদী থাকে আর তার ধারে প্রকাণ্ড জঙ্গল থাকে—সেইখানে একটা মস্ত বাঘ ছিল আর ছিল একটা শেয়াল।"

"না, শেয়াল তো বলতে বলি নি—বাঘের গল্প।"

"আচ্ছা, বাঘ ছিল, শেয়ালটেয়াল কিচ্ছু ছিল না। একদিন সেই বাঘ করেছে কি একটা ছোট্ট সুন্দর হরিণের ছানার ঘাড়ে হাল্লুম করে কামড়ে ধরেছে—"

"না—সেরকম গল্প আমার শুনতে ভালো লাগে ন। একটা ভালো গল্প বল।"

"ভালো গল্প কোথায় পাব? আচ্ছা শোন—এক ছিল মোটা বাবু আর এক ছিল রোগা বাবু। মোটা বাবু কিনা মোটা, তাই তার নাম বিশ্বম্ভর, আর রোগা বাবু কিনা রোগা, তাই তার নাম কানাই।"

"বিস-কম্বল মানে কি মোটা, আর কানাই মানে রোগা?"

"না; মোটা কিনা, তাই তার মস্ত মোটা নাম—বিশ্‌-শম্‌-ভর্‌। আর রোগা লোকের নাম কানাই।"

"রোগা কানাই বলল, 'মোটা বিশ্বম্ভর, তোমার এমন বিচ্ছিরি ঢাকাই জালার মতন চেহারা কেন?' মোটা বিশ্বম্ভর বলল, 'রোগা কানাই, তোর হাত-পা কেন কাঠির মতন, হাড়গিল্লের ঠ্যাঙের মতন, রোদে শুকনো দড়ির মতন?' তখন তারা

ভয়ানক চটে গেল। রোগা বলল, 'মোটকা লোকের বুদ্ধি মোটা।' মোটা বলল, 'রোগা লোকের কিপটে মন'।''

''মোটা বুদ্ধি মানে কি বোকা বুদ্ধি?''

''হ্যাঁ। তারপর শোন--মোটা আর রোগা তখন খুব ঝগড়া করতে লাগলো। এ বলল, 'রোগা মানুষ ভালো নয়'--ও বলল, 'মোটা হলেই দুষ্টু হয়।' তখন তারা বলল, 'আচ্ছা চল তো পণ্ডিতের কাছে—বইয়েতে কি লেখা আছে—জিজ্ঞাসা কর তো।' ''

''বইয়েতে কি সব লেখা থাকে?''

''হ্যাঁ, থাকে। তারা তখন দুজনেই পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নালিশ করলো। পণ্ডিতমশাই নাকের আগায় চশমা এঁটে, কানের ফাঁকে কলম গুঁজে, মুণ্ডু নেড়ে, টিকি ঝেড়ে তেড়ে বললেন, রোসো! দাঁড়াও, একটু বোসো—রোগা এবং মোটা এদের কে কিরকম পাজি, বিচার করব আজই।' এই বলে পণ্ডিতমশাই তাকিয়ার ওপর পাশ ফিরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। রোগা কানাই আর মোটা বিশ্বম্ভর বসেই আছে, বসেই আছে--এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়! তখন পণ্ডিতমশাই চোখ রগড়ে বললেন, ব্যাপারখানা কি? বাবুরা বলল, 'আজ্ঞে, সেই রোগা আর মোটার কথা। পণ্ডিত বললেন, 'ঠিক ঠিক--এই বলে প্রকাণ্ড একখানা বই নিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হেলেদুলে, ষাঁড়ের মতন সুরটি করে তিনি বলতে লাগলেন- বইয়ে আছে—

মোটকা মানুষ হোঁৎকা মুখ,
বুদ্ধি ভোঁতা আহাম্মুক—'

অমনি রোগা কানাই হো হো করে হেসে উঠলো। তখন পণ্ডিত বললেন--

'শুকনো লোকের শয়তানি,
দেমাক দেখে হার মানি।'

তাই শুনে মোটাবাবু হেসে লুটোপুটি। তখন পণ্ডিত বললেন, 'বইয়ে লিখেছে--

মস্ত মোটা মানুষ যত
আস্ত কোলা ব্যাঙের মতো
নিষ্কর্মা সব হদ্দ কুঁড়ে
কুমড়ো গড়ায় রাস্তা জুড়ে!
—আর—
চিমসে রোগা যত ব্যাটা
বিষম ফাজিল, বেদম জ্যাঠা
শুঁটকো লোকের কারসাজি,
হিংসুটে আর হাড় পাজি॥'

তাই শুনে রোগা মোটা দুয়ে মিলে ভয়ানক রকম চটে গেল। পণ্ডিত বললেন—

'দুটোই বাঁদর, দুটোই গাধা,
রোগা মোটা সমান হাঁদা।
ভণ্ড বেড়াল, পালের ধাড়ি,
লাগাও মুখে ঝাঁটার বাড়ি।
মাথায় মাথায় ঠুকে ঠুকে
চুনকালি দাও দুটোর মুখে॥'

"এই বলে পণ্ডিতমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে, নাকে মুখে গুঁজে, আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলেন।"

"তারপর সেই বাবুরা কি বলল?"

"বাবুরা হাঁ করে বোকার মতো মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাড়ি চলে গেল আর ভাবলো পণ্ডিতটা কি বোকা!"

সন্দেশ—১৩২২

সত্যি

ইনি কে জানো না বুঝি? ইনি নিধিরাম পাটকেল!

কোন্ নিধিরাম? যার মিঠায়ের দোকান আছে?

আরে দুৎ! তা কেন? নিধিরাম ময়রা নয়—প্রফেসর নিধিরাম!

ইনি কি করেন?

কি করেন আবার কি? আবিষ্কার করেন!

ও বুঝেছি! ঐ যে উত্তর মেরুতে যায়, যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা—মানুষজন সব মরে যায়—

দূর মুখ্যু! আবিষ্কার বললেই বুঝি উত্তরমেরু বুঝতে হবে, বা দেশ-বিদেশে ঘুরতে হবে? তাছাড়া বুঝি আবিষ্কার হয় না?

ও! তা হলে?

মানে বিজ্ঞান শিখে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে নতুন নতুন কথা শিখছেন, নতুন নতুন জিনিস বানাচ্ছেন। ইনি আজ পর্যন্ত কত কি আবিষ্কার করেছেন তোমরা তার খবর রাখ কি? ওঁর তৈরি সেই গন্ধবিকট তেলের কথা শোন নি? সেই তেলের আশ্চর্য গুণ! আমি নিজে মাখি নি বা খাই নি কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালার কে যেন বলেছেন যে সে ভয়ংকর তেল। সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে দেড় দিনে আধহাত লম্বা গোঁফ বেরোয়।

সে কি মশাই! তাও কি হয়?

আলবাৎ হয়! বললে বিশ্বেস করবে না, কিন্তু নন্দলাল ডাক্তার বলেছে ভুলু মিস্তিরের খোকাকে ঐ তেল মাখিয়ে তার এল্লা মোটা গোঁফ হয়ে গেছিল।

কি আবোল তাবোল বকছেন মশাই!

বিশ্বেস করতে না চাও তা বিশ্বেস কোরো না, কিন্তু চোখে যা দেখছ তা বিশ্বেস করবে তো? কি কাণ্ড হচ্ছে দেখছ তো? ঐ দেখ নিধিরাম পাটকেলের নতুন কামান তৈরি হচ্ছে। নতুন কামান, নতুন গোলা, নতুন সব। একি সহজ

কথা ভেবেছ? ঐ রকম আর গোটা পঞ্চাশ কামান আর হাজার দশেক গোলা তৈরি হলেই উনি লড়াই করতে বেরুবেন।

সব নতুন রকম হচ্ছে বুঝি?

নতুন না তো কি? নতুন অথচ সস্তা! ঐ দেখ কামান আর ঐ দেখ গোলা, কামানে কি আছে? নল আছে আর বাতাসভরা হাপর আছে। নলের মধ্যে গোলা ভরে খুব খানিক দম নিয়ে ভ-শ করে যেমনি হাপর চেপে ধরবে অমনি হুশ করে গোলা ছিটকে পড়বে আর ফট করে ফেটে যাবে।

তারপরে?

তার পরেই তো হচ্ছে আসল মজা। গোলার মধ্যে কি আছে জান? বিছুটির আরক আছে, লংকার ধোঁয়া আছে, ছারপোকার আতর আছে, গাঁদালের রস আছে, পচা মুলোর এক্সট্রাক্ট আছে, আরো যে কত কি আছে, তার নামও আমি জানি না। যতরকম উৎকট বিশ্রী গন্ধ আছে, যতরকম ঝাঁঝালো, তেজালো, বিটকেল জিনিস আছে, আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে সব তিনি মিশিয়েছেন ঐ গোলার মধ্যে। সেদিন ছোট একটা গোলা ওঁর হাত থেকে পড়ে ফেটে গেছিল শুনেছ তো?

তাই নাকি? তারপর হল কি?

যেমন গোলা ফাটলো অমনি তিনি চট করে একটা ধামা চাপা দিয়েছিলেন, নইলে কি হত কে জানে। তবু দেখছ ওষুধের গন্ধে আর ঝাঁঝে প্রফেসরের চেহারা কেমন হয়ে গেছে। তার আগে ওঁর চেহারা ছিল ঠিক কার্তিকের মতো; মাথাভরা কোঁকড়া চুল আর এক হাত লম্বা দাড়ি! সত্যি!

সত্যি নাকি?

সত্যি না তো কি?

সন্দেশ—১৩২৪

রাগের ওষুধ

কেদারবাবু বদরাগি লোক। যখন রেগে বসেন, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

একদিন তিনি মুখখানা বিষণ্ণ করে বসে আছেন, এমন সময়ে আমাদের মাস্টারবাবু এসে বললেন, "কি হে কেদারকেষ্ট, মুখখানা হাঁড়ি কেন?"

কেদারবাবু বললেন, "আর মশাই, বলবেন না, আমার সেই রুপোবাঁধানো হুঁকোটা ভেঙে সাতটুকরো হয়ে গেল—মুখ হাঁড়ির মতো হবে না তো কি বদনার মতো হবে?"

মাস্টারমশাই বললেন, "বল কি হে? এ তো কাচের বাসন নয়, কি মাটির পুতুল নয়—অমনি খামাখা ভেঙে গেল? এর মানে কি?"

কেদারবাবু বললেন, "খামাখা ভাঙতে যাবে কেন—কথাটা শুনুন না। হল কি—কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় নি। সকালবেলা উঠেছি, মুখ হাত ধুয়ে তামাক খেতে বসব, এমন সময়ে কলকেটা কাৎ হয়ে আমার ফরাসের ওপর টিকের আগুন পড়ে গেল। আচ্ছা, আপনিই বলুন—এতে কার না রাগ হয়? আরে, আমার হুঁকো, আমার কলকে, আমার আগুন, আমার ফরাস, আবার আমার ওপরেই জুলুম! তাই আমি রাগ করে—বেশি কিছু নয়—ঐ মুগুরখানা দিয়ে পাঁচ-দশ ঘা মারতেই কিনা হতভাগা হুঁকোটা ভেঙে খান খান!"

মাস্টারমশাই বললেন, "তা যাই বল বাপু, এ রাগ বড় চণ্ডাল—রাগের মাথায় এমন কাণ্ড করে বস, রাগটা একটু কমাও।"

"কমাও তো বললেন—রাগ যে মুখের কথায় বাগ মানবে—এ রাগ আমার তেমন নয়।"

"দ্যাখ, আমি এক উপায় বলি। শুনেছি, খুব ধীরে ধীরে এক দুই তিন করে দশ গুনলে রাগটা নাকি শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু তোমার যেমন রাগ, তাতে দশ-বারোতে কুলোবে না—তুমি একেবারে একশো পর্যন্ত গুনে দ্যাখো।"

তারপর একদিন কেদারবাবু ইস্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন ছুটির সময়, ছেলেরা খেলা করছে। হঠাৎ একটা মার্বেল ছুটে এসে কেদারবাবুর পায়ের হাড়ে ঠাঁই করে লাগলো। আর যায় কোথা! কেদারবাবু ছাতের সমান এক লাফ দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ছেলের দল যে যেখানে পারে একেবারে সটান চম্পট। তখন কেদারবাবুর মনে হলো মাস্টারবাবুর কথাটা একবার পরীক্ষা করে দেখি। তিনি আরম্ভ করলেন, এক দুই তিন চার পাঁচ—

ইস্কুলের মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে অঙ্ক বলছে, তাই দেখে ইস্কুলের দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে কয়েকজন লোক ডেকে আনলো। একজন বলল, "কি হয়েছে মশাই?" কেদারবাবু বললেন, "ষোলো, সতেরো, আঠারো, উনিশ, কুড়ি—"

সকলে বলল, "এ কি? লোকটা পাগল হল নাকি?—আরে, ও মশাই, বলি অমনধারা কচ্ছেন কেন?" কেদারবাবু মনে মনে ভয়ানক চটলেও—তিনি গুনেই চলেছেন, "ত্রিশ, একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ—"

আবার খানিক বাদে আরেকজন জিজ্ঞাসা করলো, "মশাই, আপনার কি অসুখ

করেছে? কবরেজমশাইকে ডাকতে হবে?" কেদারবাবু রেগে আগুন হয়ে বললেন, "উনষাট, ষাট, একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি—"

দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে গেল—চারদিকে গোলমাল, হৈ চৈ। তাই শুনে মাস্টারবাবু দেখতে এলেন, ব্যাপারখানা কি! ততক্ষণে কেদারবাবুর গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি দুই চোখ লাল করে লাঠি ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, "ছিয়ানব্বুই, সাতানব্বুই, আটানব্বুই, নিরেনব্বুই, একশো—কোন্ হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, মিথ্যেবাদী বলেছিল একশো গুনলে রাগ থামে?" বলেই ডাইনে-বাঁয়ে দুমদাম লাঠির ঘা।

লোকজন সব ছুটে পালালো। আর মাস্টারমশাই এক দৌড়ে সেই যে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, আর সারাদিন বেরোলেন না।

সন্দেশ—১৩২২

ডাকাত নাকি

হারুবাবু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছেন। স্টেশন থেকে বাড়ি প্রায় আধ মাইল দূর, বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হারুবাবু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছেন। তাঁর এক হাতে ব্যাগ, আরেক হাতে ছাতা।

চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মনে হল কে যেন তাঁর পেছন পেছন আসছে। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, সত্যি সত্যি কে যেন ঠিক তাঁরই মতন হনহনিয়ে তাঁর পেছন পেছন আসছে। হারুবাবুর মনে কেমন ভয় হল—চোরডাকাত নয়তো! ওরে বাবা! সামনের ঐ মাঠটা পার হবার সময়ে একলা পেয়ে হঠাৎ যদি ঘাড়ের ওপর দুচার ঘা লাঠি কষিয়ে দেয় তা হলেই তো গেছি! হারুবাবুর রোগা রোগা পা দুটো কাঁপতে কাঁপতে ছুটতে লাগলো। কিন্তু লোকটাও যে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে!

তখন হারুবাবু ভাবলেন, সোজা মাঠের ওপর দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। বড় রাস্তা দিয়ে বদ্যিপাড়া ঘুরেই যাওয়া যাক, নাহয় একটু হাঁটাই হল। তিনি ফস্ করে ডানদিকের একটা গলির ভেতর ঢুকেই বদ্যিদের বেড়া টপকে এক দৌড়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লেন। ওমা! সেই লোকটাও কি দুষ্টু, সেও দেখাদেখি ঠিক তেমনি করে বেপথ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে হাজির!

হারুবাবু ছাতাটাকে বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন—ভাবলেন যা থাকে কপালে, কাছে আসলেই দু-চার ঘা কষিয়ে দেব। হারুবাবুর মনে পড়লো, ছেলেবেলায় তিনি জিমনাস্টিক করতেন—দু-তিনবার তিনি হাতের 'মাসল' ফুলিয়ে দেখলেন, এখনো শক্ত হয় কি না।

আর একটু সামনেই কালীবাড়ি। হারুবাবু তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন। পেছনে পায়ের শব্দ

শুনে বুঝতে পারলেন যে, লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে! এ কিন্তু ডাকাত না হয়ে যেতেই পারে না! হারুবাবুর হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল, কপালে বড়-বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। এমন সময়ে হঠাৎ শোনা গেল, সামনে ঘাটের পাশে বসে কারা যেন গল্প করছে।

শুনবামাত্র হারুবাবুর মনে সাহস হল। তিনি ধাঁ করে ছাতা বাগিয়ে সিংহ-বিক্রমে ফিরে বললেন, "তবে রে! আমি টের পাই নি বুঝি? ভালো চাস তো—"

কিন্তু লোকটির চেহারা দেখে হঠাৎ তাঁর বক্তৃতার তেজ থেমে গেল। অত্যন্ত নিরীহ, রোগা ভালোমানুষ গোছের লোকটি—ডাকাতের মতো একেবারেই নয়!

হারুবাবু তখন একটু নরম মতন ধমক দিয়ে বললেন, "খামাখা আমার পেছন পেছন ঘুরছ কেন হে?" লোকটি অত্যন্ত ভয় পেয়ে আর থতমত খেয়ে বলল, "স্টেশনের বাবুটি যে বললেন, আপনি বলরামবাবুর পাশের বাড়িতেই থাকেন, আপনার সঙ্গে গেলেই ঠিকমত পেঁছব।—তা আপনি কি বরাবর এইরকম করে বেঁকেচুরে চলেন নাকি?" হারুবাবু ঠিক এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকেও বলবার মতো কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। কাজেই ঘাড় হেঁট করে আবার সোজা পথে বাড়ি ফিরে চললেন।

হাসির গল্প

আমাদের পোস্টাপিসের বড়বাবুর বেজায় গল্প করিবার সখ। যেখানে সেখানে, সভায় আসরে, নিমন্ত্রণে, তিনি তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া বসেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার ভাণ্ডার অতি সামান্য—কতগুলি বাঁধা গল্প, তাহাই তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া সব জায়গায় চালাইয়া দেন। কিন্তু একই গল্প বারবার শুনিতে লোকের ভালো লাগিবে কেন? বড়বাবুর গল্প শুনিয়া আর লোকের হাসি পায় না। কিন্তু তবু বড়বাবুর উৎসাহও তাহাতে কিছুমাত্র কমে না।

সেদিন হঠাৎ তিনি কোথা হইতে একটা নূতন গল্প সংগ্রহ করিয়া, মুখুজ্জেদের মজলিশে শুনাইয়া দিলেন। গল্পটা অতি সামান্য কিন্তু তবু বড়বাবুকে খাতির করিয়া সকলেই হাসিল। বড়বাবু তাহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন গল্পটা খুব লাগসই হইয়াছে। সুতরাং, তাহার দুইদিন বাদে যদু মল্লিকের বাড়ি নিমন্ত্রণে বসিয়া তিনি খুব আড়ম্বর করিয়া আবার সেই গল্প শুনাইলেন। দু-একজন, যাহারা আগে শোনে নাই, তাহারা শুনিয়া বেশ একটু হাসিল। বড়বাবু ভাবিলেন গল্পটা জমিয়াছে ভালো।

তাহার পর ডাক্তারবাবুর ছেলের ভাতে তিনি আবার সেই গল্পই খুব উৎসাহ করিয়া শুনাইলেন। এবারে ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কেহ গল্প শুনিয়া হাসিল না, কিন্তু বড়বাবু নিজেই হাসিয়া কুটিকুটি।

তাহার পরেও যখন তিনি আরো দুইতিন জায়গায় সেই একই গল্প চালাইয়া দিলেন তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষম চটিয়া গেল। বিশু বলিল, "না হে আর তো সহ্য হয় না। বড়বাবু বলে আমরা এতদিন সয়ে আছি—কিন্তু ওঁর গল্পের উৎসাহটা একটু না কমালে আর চলছে না।"

দুইদিন বাদে আমরা দশ-বারোজনে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে বড়বাবুর নাদুসনুদুস মূর্তিখানি দেখা দিল। আমরা বলিলাম, "আজ খবরদার! ওঁর গল্প শুনে কেউ হাসতে পারবে না! দেখি উনি কি করেন।" বড়বাবু বসিতেই বিশু বলিয়া উঠিল, "নাঃ, বড়বাবু আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছেন। আগে কেমন মজার মজার সব গল্প বলতেন, আজকাল কই, কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন।" বড়বাবু এ কথায় ভারি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার গল্প আর আগের মতন জমে না, এ কথাটি তাঁহার একটুও ভালো লাগিল না। তিনি বলিলেন, "বটে? আচ্ছা রোসো। আজ তোমাদের এমন গল্প শোনাবো, হাসতে হাসতে তোমাদের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই মামুলি পুঁজি হইতে একটা গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গল্প বলিলে কি হইবে? আমরা কেহ হাসিতে রাজি নহি—সকলেই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম। বিশু বলিল, "নাঃ, এ গল্পটা জুৎসই হল না।" তখন বড়বাবু তাঁহার সেই পুঁজি হইতে একে একে পাঁচসাতটি গল্প শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের মুখ পেঁচার মতো আরো গম্ভীর হইয়া উঠিল! তখন বড়বাবু খেপিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "যাও যাও! তোমরা হাসতে জান না—গল্পের কদর বোঝ না—আবার গল্প শুনতে চাও! এই গল্প শুনে সেদিন ইনস্পেক্টর

সাহেব পর্যন্ত হেসে গড়াগড়ি—তোমরা এ-সব বুঝবে কি?" তখন আমাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "সে কি বড়বাবু? আমরা হাসতে জানি নে? বলেন কি! আপনার গল্প শুনে কতবার কত হেসেছি, ভেবে দেখুন তো। আজকাল আপনার গল্পগুলো তেমন খোলে না—তা হাসবো কোত্থেকে? এই তো, বিশুদা যখন গল্প বলে তখন কি আমরা হাসি নে? কি বলেন?"

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বিশু? ও আবার গল্প জানে নাকি? আরে, একসঙ্গে দুটো কথা বলতে ওর মুখে আটকায়, ও আবার গল্প বলবে কি?" বিশু বলিল, "বিলক্ষণ! আমার গল্প শোনেন নি বুঝি?" আমরা সকলে উৎসাহ করিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা শুনিয়ে দাও তো।" বিশু তখন গম্ভীর হইয়া বলিল, "এক ছিল রাজা—" শুনিয়া আমাদের চার-পাঁচজন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে কি মজা রে, কি মজা! এক ছিল রাজা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

বিশু বলিল, "রাজার তিন ছেলে—"

শুনিবামাত্র আমরা একসঙ্গে প্রাণপণে এমন সশব্দে হাসিয়া উঠিলাম যে বিশু নিজেই চমকাইয়া উঠিল। সকলে হাসিতে হাসিতে এ উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম--কেহ বলিল, "দোহাই বিশুদা, আর হাসিও না"--কেহ বলিল, "বিশু-বাবু, রক্ষে করুন, ঢের হয়েছে।" কেহ কেহ এমন ভাব দেখাইল, যেন হাসিতে হাসিতে তাহাদের পেটে খিল ধরিয়া গিয়াছে।

বড়বাবু কিন্তু বিষম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "এ-সব ঐ বিশুর কারসাজি। ঐ আগে থেকে সব শিখিয়ে এনেছে। নইলে, ও যা বললে তাতে হাসবার মতো কি আছে বাপু?" এই বলিয়া তিনি রাগে গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

সেই সময় হইতে বড়বাবুর গল্প বলার সখটা বেশ একটু কমিয়াছে। এখন আর তিনি যখন তখন কথায় কথায় হাসির গল্প ফাঁদিয়া বসেন না।

সন্দেশ—১৩২৪

বাজে গল্প

(১)

দুই বন্ধু ছিল। একজন অন্ধ আরেকজন বদ্ধ কালা। দুইজনে বেজায় ভাব। কালা বিজ্ঞাপনে পড়িল আর অন্ধ লোকমুখে শুনিল, কোথায় যেন যাত্রা হইবে, সেখানে সঙেরা নাচগান করিবে। কালা বলিল, "অন্ধ ভাই, চল, যাত্রায় গিয়া নাচ দেখি।" অন্ধ হাত নাড়িয়া, গলা খেলাইয়া কালাকে বুঝাইয়া দিল, "কালা ভাই, চল, যাত্রায় নাচগান শুনিয়া আসি।"

দুইজনে যাত্রার আসরে গিয়া বসিল। রাত দুপুর পর্যন্ত নাচগান চলিল, তারপর অন্ধ বলিল, "বন্ধু, গান শুনিলে কেমন?" কালা বলিল, "আজকে তো নাচ দেখিলাম—গানটা বোধ হয় কাল হইবে।" অন্ধ ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিল, "মূর্খ তুমি! আজ হইল গান—নৃত্যটাই বোধ হয় কাল হইবে।"

কালা চটিয়া গেল। সে বলিল, "চোখে দেখ না, তুমি নাচের মর্ম জানিবে কি?" অন্ধ তাহার কানে আঙুল ঢুকাইয়া বলিল, "কানে শোন না, গানের তুমি কাঁচকলা বুঝিবে কি?" কালা চিৎকার করিয়া বলিল, "আজকে নাচ, কালকে গান," অন্ধ গলা ঝাঁকড়াইয়া আর ঠ্যাং নাচাইয়া বলিল, "আজকে গান, কালকে নাচ।"

সেই হইতে দুজনের ছাড়াছাড়ি। কালা বলে, "অন্ধটা এমন জুয়াচোর—সে দিনকে রাত করিতে পারে।" অন্ধ বলে, "কালাটা যদি নিজের কথা শুনিতে পাইত, তবে বুঝিত সে কতবড় মিথ্যাবাদী।

সন্দেশ—১৩২৫

(২)

কলকেতার সাহেববাড়ি থেকে গোষ্ঠবাবুর ছবি এসেছে। বাড়িতে তাই হুলুস্থুল। চাকর বামুন ধোপা নাপিত দারোগা পেয়াদা সবাই বলে, "দৌড়ে চল, দৌড়ে চল।"

যে আসে সেই বলে, "কি চমৎকার ছবি। সাহেবের আঁকা।" বুড়ো যে সরকারমশাই, তিনি বললেন, "সব চাইতে সুন্দর হয়েছে বাবুর মুখের হাসিটুকু—ঠিক তাঁরই মতন ঠান্ডা হাসি।" শুনে অবাক হয়ে সবাই বলল, "যা হোক! সাহেব হাসিটুকু ধরেছে খাসা।"

বাবুর যে বিষ্টুখুড়ো তিনি বললেন, "চোখদুটো যা এঁকেছে, ওরই দাম হাজার টাকা—চোখ দেখলে, গোষ্ঠর ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে।" শুনে একুশজন একবাক্যে হাঁ-হাঁ করে সায় দিয়ে উঠলো।

রেধো ধোপা তার কাপড়ের পোঁটলা নামিয়ে বলল, "তোফা ছবি। কাপড়খানার ইস্ত্রি যেন রেধো ধোপার নিজের হাতে করা।" নাপিত তার খুরের থলি দুলিয়ে বলল, "আমি উনিশ বছর বাবুর চুল ছাঁটছি—আমি ঐ চুলের কেতা দেখেই বুঝতে পারি, একখানা ছবির মতন ছবি। আমি যখনই চুল ছাঁটি, বাবু আয়না দেখে ঐরকম খুশি হন।"

বাবুর আহ্লাদী চাকর কেনারাম বলল, "বলব কি ভাই, এমন জলজ্যান্ত ছবি—আমি তো ঘরে ঢুকেই এক পেনাম ঠুকে চেয়ে দেখি, বাবু তো নয়—ছবি।" সবাই বলল, "তা ভুল হবারই কথা—আশ্চর্য ছবি যা হোক।"

তারপর সবাই মিলে ছবির নাকমুখ, গোঁফদাড়ি, সমস্ত জিনিসের খুব সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম আলোচনা করে প্রমাণ করলেন যে সব বিষয়েই বাবুর সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে—সাহেবের বাহাদুরি বটে! এমন সময় বাবু এসে ছবির পাশে দাঁড়ালেন।

বাবু বললেন, "একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। কলকেতা থেকে ওরা লিখছে যে

ভুলে আমার ছবি পাঠাতে কার যেন ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওটা ফেরৎ দিতে হবে।"

শুনে সরকারমশাই মাথা নেড়ে বললেন, "দেখেছ! ওরা ভেবেছে আমায় ঠকাবে! আমি দেখেই ভাবছি অমন ভিরকুটি দেওয়া প্যাখনা হাসি—এ আবার কার ছবি।"

খুড়ো বললেন, "দেখ না! চোখদুটো যেন উল্টে আসছে—যেন গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া!" রেধো ধোপা, সেও বলল, "একটা কাপড় পরেছে যেন চাষার মতো। ওর সাতজন্মে কেউ যেন পোশাক পরতে শেখে নি।" নাপিতভায়া মুচকি হেসে মুখ বেঁকিয়ে বলল, "চুল কেটেছে দেখ না—যেন মাথার ওপর কাস্তে চালিয়েছে।" কেনারাম ভীষণ খেপে চেঁচিয়ে বলল, "আমি সকাল বেলায় ঘরে ঢুকেই চোর ভেবে চমকে উঠেছি। আরেকটু হলেই মেরেছিলাম আর কি! আবার এরা বলছিল, ওটা নাকি বাবুর ছবি। আমার সামনে ও কথা বললে মুখ থুড়ে দিতুম না!" তখন সবাই মিলে একবাক্যে বলল যে, সবাই তারা টের পেয়েছিল, এটা বাবুর ছবি নয়। বাবুর নাক কি অমন চ্যাটালো? বাবুর কি হাঁসের পায়ের মতো কান? ও কি বসেছে, না ভালুক নাচছে?

সন্দেশ—১৩২৫

(৩)

কতগুলো ছেলে ছাতের ওপর হুড়োহুড়ি করে খেলা করছে—এমন সময়ে একটা মারামারির শব্দ শোনা গেল। তারপরেই হঠাৎ গোলমাল থেমে গিয়ে সবাই মিলে "হারু পড়ে গেছে" বলে কাঁদতে কাঁদতে নীচে চলল।

খানিক বাদেই শুনি একতলা থেকে কান্নাকাটির শব্দ উঠছে। বাইরের ঘরে যদুর বাবা গণেশবাবু ছিলেন—তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?" শুনতে পেলেন ছেলেরা কাঁদছে "হারু পড়ে গেছে।" বাবু তখন দৌড়ে গেলেন ডাক্তার ডাকতে।

পাঁচ মিনিটে ডাক্তার এসে হাজির—কিন্তু হারু কোথায়? বাবু বললেন, "এদিকে তো পড়ে নি, ভেতর বাড়িতে পড়েছে বোধহয়।" কিন্তু ভেতর বাড়িতে মেয়েরা বললেন, "এখানে তো পড়ে নি—আমরা ভাবছি বার বাড়িতে পড়েছে বুঝি।" বাইরেও নেই, ভেতরেও নেই, তবে কি ছেলে উড়ে গেল? তখন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হল, "কোথায় রে? কোথায় হারু?" তারা বলল, "ছাতের ওপর।" সেখানে গিয়ে তারা দেখে হারুবাবু অভিমান করে বসে বসে কাঁদছেন! হারু বড় আদুরে ছেলে, মারামারিতে সে পড়ে গেছে দেখেই আর সকলে মার খাবার ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। "হারু পড়ে গেছে" বলে এত যে কান্না, তার অর্থ, সকলকে জানানো হচ্ছে যে "হারুকে আমরা ফেলে দিই নি—সে পড়ে গেছে বলে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।"

হারু তখন সকলের নামে বাবার কাছে নালিশ করবার জন্য মনে মনে অভিমান জমিয়ে তুলছিল—হঠাৎ তার বাবাকে লোকজন আর ডাক্তারসুদ্ধ এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে তার আর নালিশ করাই হল না। যাহোক, হারুকে আস্ত দেখে সবাই এমন খুশি হল যে, শাসনটাসনের কথা কারো মনেই এলো না।

সবচেয়ে বেশি জোরে কেঁদেছিলেন হারুর ঠাকুরমা। তিনি আবার কানে শোনেন কিছু কম। তাঁকে সবাই জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এত কাঁদছিলেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি কি অত জানি? দেখলুম ঝিয়েরা কাঁদছে, বৌমা কাঁদছেন, তাই আমিও কাঁদতে লাগলুম—ভাবলুম একটা কিছু হয়ে থাকবে।"

সন্দেশ—১৩২৫

কুকুরের মালিক

ভজহরি আর রামচরণের মধ্যে ভারি ভাব। অন্তত, দুই সপ্তাহ আগেও তাহাদের মধ্যে খুবই বন্ধুতা দেখা যাইত।

সেদিন বাঁশপুকুরের মেলায় গিয়া তাহারা দুইজনে মিলিয়া একটা কুকুরছানা কিনিয়াছে। চমৎকার বিলাতি কুকুর—তাহার আড়াই টাকা দাম। ভজুর পাঁচসিকা

আর রামার পাঁচসিকা—দুইজনের পয়সা মিলাইয়া কুকুর কেনা হইল। সুতরাং দুইজনেই কুকুরের মালিক।

কুকুরটাকে বাড়িতে আনিয়াই ভজু বলিল, "অর্ধেকটা কুকুর আমার, অর্ধেকটা তোর।" রামা বলিল, "বেশ কথা! মাথার দিকটা আমার, ল্যাজের দিকটা তোর।" ভজু একটু ভাবিয়া দেখিল, মন্দ কি! মাথার দিকটা যাহার সেই তো কুকুরকে খাওয়াইবে, যত হাঙ্গাম সব তাহার। তাহা ছাড়া কুকুর যদি কাহাকেও কামড়ায়, তবে মাথার দিকের মালিকই দায়ী, ল্যাজের মালিকের কোন দোষ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং সে বলিল, "আচ্ছা, ল্যাজের দিকটাই নিলাম।"

দুইজনে দুপুরবেলায় বসিয়া কুকুরটার পিঠে হাত বুলাইয়া তোয়াজ করিত। রামা বলিত, "দেখিস, আমার দিকে হাত বোলাস নে।" ভজু বলিত, "খবরদার, এদিকে হাত আনিস নে।" দুইজনে খুব সাবধানে নিজের নিজের ভাগ বাঁচাইয়া চলিত। যখন ভজুর দিকের পা তুলিয়া কুকুরটা রামার দিকে কান চুলকাইত, তখন ভজু খুব উৎসাহ করিয়া বলিত "খুব দে—আচ্ছা করে খামচে দে।" আবার ভজুর দিকে মাছি বসিলে রামার দিকের মুখটা যখন সেখানে কামড়াইতে যাইত, তখন রামা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিত, "দে কামড়ে! একেবারে দাঁত বসিয়ে দে।"

একদিন একটা মস্ত লাল পিঁপড়া কুকুরের পিঠে কামড়াইয়া ধরিল। কুকুরটা গা ঝাড়া দিল, পিঠে জিভ লাগাইবার চেষ্টা করিল। নানারকম অঙ্গভঙ্গি করিয়া পিঠটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর কিছুতেই কৃতকার্য না হইয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দুইজনে বিষম তর্ক উঠিল, কার ভাগে কামড় পড়িয়াছে। এ বলে, "তোর দিকে পিঁপড়ে লেগেছে—তুই ফেলবি." ও বলে, "আমার বয়ে গেছে পিঁপড়ে ফেলতে—তোর দিকে কাঁদছে, সে তুই বুঝবি।" সেইদিন দুইজনে প্রায় কথাবার্তা বন্ধ হইবার জোগাড়।

তাহার পর একদিন কুকুরের কি খেয়াল চাপিল, সে তাহার নিজের ল্যাজটা লইয়া খেলা আরম্ভ করিল। নেহাৎ 'কুকুরে' খেলা -তাহার না আছে অর্থ, না আছে কিছু। সে ধনুকের মতো একপাশে বাঁকা হইয়া ল্যাজটার দিকে তাকাইয়া দেখে আর একটু একটু ল্যাজ নাড়ে। সেটা যে তাহার নিজের ল্যাজ, সে খেয়াল বোধহয় তাহার থাকে না তাই হঠাৎ অতর্কিতে ল্যাজ ধরিবার জন্য সে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটাও নড়িয়া যায়, কাজেই ল্যাজটা আর ধরা হয় না। ভজু আর রামা এই ব্যাপার দেখিয়া উৎসাহে পাল্লা দিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। রামার মহা স্ফূর্তি যে ভজুর ল্যাজকে তাড়া করা হইতেছে, আর ভজুর ভারি উৎসাহ যে তাহার ল্যাজ রামার মুখকে ফাঁকি দিয়া নাকাল করিতেছে।

দুইজনের চিৎকারেই হউক কি নিজের চ্যাঁটামির জন্যই হউক, কুকুরটার জিদ চড়িয়া গেল। সমস্তদিন সে থাকিয়া থাকিয়া চরকিবাজির মতো নিজের ল্যাজকে তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল। এই রকমে খামাখা পাক দিতে দিতে কুকরটা যখন হয়রান হইয়া হাঁফাইতে লাগিল, তখন রামা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভজু বলিল, "আমার দিকটাই জিতেছে।"

কিন্তু কুকুরটা এমন বেহায়া, পাঁচমিনিট যাইতে না যাইতেই সে আবার ল্যাজ তাড়ানো শুরু করিল। তখন রামা রাগিয়া বলিল, "এইও! তোমার ল্যাজ সামলাও। দেখছ না কুকুরটা হাঁপিয়ে পড়েছে।" ভজু বলিল, "সামলাতে হয় তোমার দিক

সামলাও—ল্যাজের দিকে তো আর হাঁপাচ্ছে না!" রামা ততক্ষণে রীতিমত চটিয়াছে। সে কুকুরের পিছন পিছন গিয়া ধাঁই করিয়া এক লাথি লাগাইয়া দিল। ভজু বলিল, "তবে রে! আমার দিকে লাথি মারলি কেন রে?" এই বলিয়াই সে কুকুরের মাথায় ঘাড়ে কানে চটাপট কয়েকটা চাঁটি লাগাইয়া দিল। দুইদিক হইতেই রেষারেষির চোটে কুকুরটা ছুটিয়া পালাইল। তখন দুইজনে বেশ একচোট হাতাহাতি হইয়া গেল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই রামা দেখে, কুকুরটা আবার ল্যাজ তাড়া করিতেছে। তখন সে কোথা হইতে একখানা দা আনিয়া এক কোপে ক্যাঁচ করিয়া ল্যাজের খানিকটা এমন পরিপাটি—উড়াইয়া দিল যে কুকুরটার আর্তনাদে ভজু ঘুমের মধ্যে লাফ দিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই দেখিল কুকুরের ল্যাজ কাটা, রামার হাতে দা। ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

তখন সে রামাকে মারিতে মারিতে মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিল। কুকুরটা ল্যাজ কাটার দরুন রামার উপর একটুও খুশি হয় নাই—সে নিমকহারাম হইয়া 'রামার দিক' দিয়াই রামার ঠ্যাঙে কামড়াইয়া দিল।

এখন দুইজনে চায় থানায় নালিশ করিতে। রামা বলে, "ল্যাজটা ভারি বেয়াড়া, বারবার মুখের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইতে চায়—তাই সে ল্যাজ কাটিয়াছে। ল্যাজ না কাটিলে কুকুর পাগল হইয়া যাইত, নাহয় সর্দিগর্মি হইয়া মরিত। মারা গেলে তো সমস্তটা কুকুরই মারা যাইত, সুতরাং ল্যাজ কাটার দরুন গোটা কুকুরটারই উপকার হইয়াছে। মুখও বাঁচিয়াছে, ল্যাজও বাঁচিয়াছে; তাহাতে রামারও ভালো, ভজুরও ভালো। কিন্তু ভজুর এতবড় আস্পর্ধা যে সে রামার দিকের কুকুরকে রামার উপর লেলাইয়া দিল। মুখের দিকে ভজুর কোন দাবিদাওয়া নাই, সে দিকটা সম্পূর্ণভাবেই রামার—সুতরাং রামার অনুমতি ছাড়া ভজু কোন্ সাহসে এবং কোন্ শাস্ত্র বা আইনমতে তাহা লইয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিতে যায়? ইহাতে অনধিকার-চর্চা, চুরি, তছরূপ—সবরকম নালিশ চলে।

ভজু কিন্তু বলে অন্যরকম। সে বলে রামার দিকের কুকুর রামাকে কামড়াইয়াছে, তাহাতে ভজুর কি দোষ? ভজু কেবল 'লে লে লে' বলিয়াছিল; তাহাতে কুকুর যদি রামাকে কামড়ায়, তবে সেটা তাহার শিক্ষার দোষ—রামা তাহাকে ভালো করিয়া শিক্ষা দেয় নাই কেন? তাহা ছাড়া ভজুর ল্যাজ খেলা করিতে চায়, রামার হিংসুটে মুখটা তাহাতে আপত্তি করে কেন? ভজুর ল্যাজকে কামড়াইতে যাইবার তাহার কি অধিকার আছে? আর রামা তাহার কুকুরের চোখ বাঁধিয়া কিংবা মুখোস আঁটিয়া দিলেই পারিত—সে ল্যাজ কাটিতে গেল কাহার হুকুমে? একবার নালিশটি করিলে রামচরণ 'বাপ বাপ' বলিয়া ছয়টি মাস জেল খাটিয়া আসিবেন—তাহা না হইলে ভজুর নাম ভজহরিই নয়।

এখন এ তর্কের আর মীমাংসাই হয় না। আমাদের হরীশখুড়ো বলিয়াছিলেন, "এক কাজ কর, কুকুরটার নাকের ডগা থেকে ল্যাজের আগা পর্যন্ত দাঁড়ি টেনে তার ডান দিকটা তুই নে, বাঁ দিকটা ওকে দে—তা হলেই ঠিকমত ভাগ হবে।" কিন্তু তাহারা ঐরকম "ছিলকা কুকুরের" মালিক হইতে রাজি নয়। কেউ কেউ বলিল, "তা কেন? ভাগাভাগির দরকার কি? গোটা কুকুরটাই রামার, আবার গোটা কুকুরটাই ভজুর।" কিন্তু এ কথায়ও তাহাদের খুব আপত্তি। একটা বই কুকুর নাই তার গোটা কুকুরটাই যদি রামার হয়, তবে ভজুর আবার কুকুর আসে কোথা হইতে?

আর গোটা কুকুরটাই যদি ভজুর হয়, তবে রামার আর থাকিল কি? কুকুর হইতে কুকুর বাদ দিলে বাকি রইল শূন্যি!

এখন তোমরা যদি ইহার মীমাংসা করিয়া দাও।

সন্দেশ—১৩২৫

উকিলের বুদ্ধি

গরিব চাষা, তার নামে মহাজন নালিশ করেছে। বেচারা কবে তার কাছে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল, সুদে আসলে তাই এখন পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষা অনেক কষ্টে একশো টাকা জোগাড় করেছে; কিন্তু মহাজন বলছে, ''পাঁচশো টাকার এক পয়সাও কম নয়; দিতে না পার তো জেলে যাও।'' সুতরাং চাষার আর রক্ষা নেই।

এমন সময় শাম্‌লা-মাথায়, চশমা-চোখে তুখোড়-বুদ্ধি উকিল এসে বলল, ''ঐ একশো টাকা আমায় দিলে, তোমার বাঁচবার উপায় করতে পারি।'' চাষা তার হাতে ধরলো, পায়ে ধরলো, বলল, ''আমায় বাঁচিয়ে দিন।'' উকিল বলল, ''তবে শোন,

আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, তখন বাপু কথাটথা কয়ো না। যে যা খুশি বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি তার জবাবটি দেবে না—খালি পাঁঠার মতো 'ব্যা—' করবে। তা যদি করতে পার, তা হলে আমি তোমায় খালাস করিয়ে দেব।'' চাষা বলল, ''আপনি কর্তা যা বলেন, তাতেই আমি রাজি।''

আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল, চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''তুমি সাতবছর আগে পঁচিশটাকা কর্জ নিয়েছিলে?'' চাষা তার মুখের দিকে চেয়ে

বলল, "ব্যা—"। উকিল বলল, "খবরদার!—বল, নিয়েছিলে কি না।" চাষা বলল, "ব্যা—" উকিল বলল, "হুজুর! আসামীর বেয়াদবি দেখুন।" হাকিম রেগে বললেন, "ফের যদি অমনি করিস, তোকে আমি ফাটক দেব।" চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে, কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, "ব্যা-ব্যা—" হাকিম বললেন, "লোকটা পাগল নাকি?"

তখন চাষার উকিল উঠে বলল, "হুজুর, ওকি আজকের পাগল—ও বহুকালের পাগল, জন্মে অবধি পাগল। ওর কি কোন বুদ্ধি আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবার কর্জ নেবে কি! ও কি কখনো খত লিখতে পারে নাকি? আর পাগলের খত লিখলেই বা কি? দেখুন দেখি, এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো! ইচ্ছে করে, জেনেশুনে, পাগলটাকে ঠকিয়ে নেবার মৎলব করেছে। আরে, ওর কি আর মাথার ঠিক আছে? এরা বলেছে, 'এইখানে একটা আঙুলের টিপ দে'—পাগল কি জানে, সে অমনি টিপ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার!"

দুই উকিলে ঝগড়া বেধে গেল। হাকিম খানিক শুনেটুনে বললেন, "মোকদ্দমা ডিসমিস।" মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে এসে চাষাকে বলল, "আচ্ছা, নাহয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম—ঐ একশো টাকাই দে।" চাষা বলল, "ব্যা—।" মহাজন যতই বলে, যতই বোঝায়, চাষা তার পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগেমেগে বলে গেল, "দেখে নেব, আমার টাকা তুই কেমন করে হজম করিস!"

চাষা তার পোঁটলা নিয়ে গ্রামে ফিরতে চলেছে, এমন সময়ে তার উকিল এসে ধরলো, "যাচ্ছ কোথায় বাপু? আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে দিয়ে যাও। একশো টাকায় যে রফা হয়েছিল, এখন মোকদ্দমা তো জিতিয়ে দিলাম।" চাষা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যা—।" উকিল বলল, "বাপুহে, ও-সব চালাকি খাটবে না—টাকাটি এখন বের কর।" চাষা বোকার মতন মুখ করে আবার বলল, "ব্যা—।" উকিল তাকে নরমগরম অনেক কথাই শোনালো, কিন্তু চাষার মুখে কেবলই ঐ এক জবাব! তখন উকিল বলল, "হতভাগা, গোমুখ্যু, পাড়াগেঁয়ে ভূত—তার পেটে এতো শয়তানি কে জানে! আগে যদি জানতাম তা হলে পোঁটলাসুদ্ধ টাকাগুলো আটকে রাখতাম।"

বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হল না।

সন্দেশ—১৩২৮

গোরুর বুদ্ধি

পণ্ডিতমশাই ভট্‌চাজ্জি বামুন, সাদাসিধে, শান্তশিষ্ট, নিরীহ মানুষ। বাড়িতে তাঁর সরষের তেলের দরকার পড়েছে, তাই তিনি কলুর বাড়ি গেছেন তেল কিনতে।

কলুর ঘরে মস্ত ঘানি, একটা গোরু গম্ভীর হয়ে সেই ঘানি ঠেলছে, তার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। গোরুটা চলছে চলছে আর ঘানিটা ঘুরছে, আর সরষে পিষে তা থেকে তেল বেরোচ্ছে। আর গলার ঘণ্টাটা টুংটাং টুংটাং করে বাজছে।

পণ্ডিতমশাই রোজই আসেন, রোজই দেখেন, কিন্তু আজ তাঁর হঠাৎ ভারি আশ্চর্য বোধ হল। তিনি চোখমুখ গোল করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাই তো! এটা তো ভারি চমৎকার ব্যাপার।

কলুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে কলুর পো, ও জিনিসটা কি হে?" কলু বলল, "আজ্ঞে ওটা ঘানিগাছ, ওতে তেল হয়।" পণ্ডিতমশাই ভাবলেন—এটা কি রকম হল? আমগাছে আম হয়, জামগাছে জাম হয়, আর ঘানিগাছের বেলায় তেল হয় মানে কি? কলুকে আবার জিগ্গেস করলেন, "ঘানি ফল হয় না?" কলু বলল, "সে আবার কি?"

পণ্ডিতমশাই টিকিতে হাত বুলিয়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর প্রশ্নটা বোধহয় ঠিক হয় নি। কিন্তু কোথায় যে ভুল হয়েছে, সেটা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে তারপর বললেন, "তেল কি করে হয়?" কলু বলল, "ঐ-খেনে সর্ষে দেয় আর গোরুতে ঘানি ঠেলে—আর ঘানির চাপে তেল বেরোয়।" এইবারে পণ্ডিতমশাই খুব খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে, টিকি দুলিয়ে বললেন, "ও বুঝেছি! তৈল-নিষ্পেষণ যন্ত্র!"

তারপর কলুর কাছ থেকে তেল নিয়ে পণ্ডিতমশাই বাড়ি ফিরতে যাবেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর মনে আর একটা খটকা লাগলো, 'গোরুর গলায় ঘণ্টা কেন?' তিনি বললেন, "ও কলুর পো, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু গোরুর গলায় ঘণ্টা দেবার অর্থ কি? ওতে কি তেল ঝাড়াবার সুবিধা হয়?" কলু বলল, "সব সময়ে তো আর গোরুটার ওপরে চোখ রাখতে পারি নে, তাই ঘণ্টাটা বেঁধে রেখেছি। ওটা যতক্ষণ বাজে, ততক্ষণ বুঝতে পারি যে গোরুটা চলছে। থামলেই ঘণ্টার আওয়াজ বন্ধ হয়, আমিও টের পেয়ে তাড়া লাগাই।"

পণ্ডিতমশাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখেন নি; তিনি বাড়ি যাচ্ছেন আর কেবলই ভাবছেন, "কলুটার কি আশ্চর্য বুদ্ধি! কি কৌশলটাই খেলিয়েছে! গোরুটার আর ফাঁকি দেবার জো নেই। একটু থেমেছে কি ঘণ্টা বন্ধ হয়েছে আর কলুর পো তেড়ে উঠেছে!" এইরকম ভাবতে ভাবতে তিনি প্রায় বাড়ি পর্যন্ত এসে পেঁাছেছেন ,এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল, 'আচ্ছা, গোরুটা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে তা হলেও তো ঘণ্টা বাজবে, তখন কলুর পো টের পাবে কি করে?'

ভট্টাচাজ্জিমশায়ের ভারি ভাবনা হল। গোরুটা যদি শয়তানি করে ফাঁকি দেয়, তা হলে কলুর তো লোকসান হয়। এই ভেবে তিনি আবার কলুর কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হে, ঐ যে ঘণ্টার কথাটা বললে, ওটার মধ্যে একটা মস্ত গলদ থেকে গেছে। গোরুটা যদি ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা বাজায় তা হলে কি করবে?" কলু বিরক্ত হয়ে বলল, "ফাঁকি দিয়ে আবার ঘণ্টা বাজাবে কিরকম?" পণ্ডিত-মশাই বললেন, "মনে কর যদি এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, তা হলেও তো ঘণ্টা বাজবে, কিন্তু ঘানি তো চলবে না। তখন কি করবে?" কলু তখন তেল মাপছিল, সে তেলের পলাটা নামিয়ে পণ্ডিতমশায়ের দিকে ফিরে, গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার গোরু কি ন্যায়শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছে, যে তার অত বুদ্ধি হবে? সে আপনার টোলেও যায় নি, শাস্ত্রও পড়ে নি, আর গোরুর মাথায় অত মৎলব খেলে না।"

পণ্ডিতমশাই ভাবলেন, 'তাও তো বটে। মূর্খ গোরুটা ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নি, তাই কলুর কাছে সে জব্দ আছে।'

সন্দেশ—১৩২৫

ঠকানে প্রশ্ন

গণেশদাদা বললেন, "একটা গোরুর গলায় দশ হাত লম্বা মোটা দড়ি বাঁধা। সেখান থেকে পঁচিশ হাত দূরে এক আঁটি ঘাস আছে। কেউ ঘাস এগিয়ে দিল না, দড়ি ছিঁড়তে হল না, অথচ গোরু অনায়াসে সেই ঘাস খেয়ে ফেলল। বল তো এটা কি করে সম্ভব হয়?" দামু বলল, "বুঝেছি। খুব হাওয়া হল আর ঘাস উড়ে এসে পড়ল।" গণেশদা বললেন, "তা হলেই তো এগিয়ে দেওয়া হল।" গদাই অনেক ভেবে বলল, "এরকম হতেই পারে না।" গণেশদা বললেন, "কেন হবে না? গোরুর গলায় দড়ি বাঁধা বলেছি, দড়িটা যে খোঁটায় বাঁধা তা তো আর বলি নি—দড়িটা আলগাই ছিল।" তা শুনে সকলে বলল, "এটা নেহাৎ ফাঁকি হল।"

তখন মতিলাল বলল, "দুটো গাধা ছিল—তাদের ভয়ানক জেদ। খাওয়াবার সময় একটা পশ্চিমমুখো আর একটা পূবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—ঠেললে সরবে না, মারলে নড়বে না। এখন একটা বালতিতে করে দুটোকে এক সঙ্গে খড় খাওয়াতে হবে। কি করা যায়? করা যা হল তা কিছুই কঠিন নয়, অথচ গাধাদুটো যেমন উল্টোদিকে মুখ করেছিল। ঠিক তেমনিই রইলো। দামু বলল, "ওটা আমি জানি।" আর সবাই বলল, "জানিস তো চুপ করে থাক না। আমাদের ভাবতে দে।" তারা ভাবছে, সেই সঙ্গে তোমরাও একটু ভেবে নেও।

যা হোক, এটাতে সকলকে ঠকানো গেল না। তখন বিপিন বলল, "আমি একটা কৌশলের ধাঁধা জানি। এক সুলতান, আটহাত লম্বা, আটহাত চৌড়া একখানা শতরঞ্চি বিছিয়ে, তার ওপরে ঠিক মধ্যখানে একটা হীরের কৌটো রেখে বললেন, 'ঐ শতরঞ্চিতে না মাড়িয়ে কিংবা তার ওপরে হাত, পা বা শরীরের কোনরকম ভর না দিয়ে, আর লাঠি, দড়ি বা কোন যন্ত্রের বা অন্য লোকের সাহায্য না নিয়ে, যে পারো সে কৌটোটি উঠিয়ে নেও।' কত ওস্তাদ ডনগীর এসে কতরকম কসরৎ করে নেবার চেষ্টা করল, কত ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা লোক এসে কতরকম কায়দা করে, ঝুঁকে পড়ে, সেটাকে তুলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ পারল না। শেষটায় একটা বেঁটে, রোগা লোক এসে চটপট অতি সহজে কৌটোটাকে উঠিয়ে নিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে দিল। বল তো কিরকম করে হল?"

গোপালমামা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "ভারি তো বললি! এই যে শরবতের গেলাস দেখছিস, এটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখ; আমি ধামায় হাত দেব না, তুলব না, অথচ শরবৎ খেয়ে ফেলব।" তখন সকলে ছুটোছুটি করে একটা ধামা এনে গেলাসটাকে চাপা দিয়ে তামাশা দেখতে বসল। মামা তখন

মাথায় চাদর ঢেকে ধামার কাছে বসে খানিকক্ষণ ঢকঢক শব্দ করে বললেন, "বাস! শরবতের দফা শেষ।" সবাই বলল, "কই দেখি?" বলে যেই তারা ধামা তুলেছে অমনি মামা খপ করে গেলাস নিয়ে চোঁ চোঁ করে শরবৎ খেয়ে বললেন, "কেমন! ধামা ধরলাম না, ছুঁলাম না, শরবৎ খেয়ে ফেললাম! হল তো?

সন্দেশ—১৩২৫

ঠকানে প্রশ্নের উত্তর

গাধা দুইটা মুখোমুখিই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহা হইলেই একটার মুখ পূর্ব-দিকে থাকিলে আর একটার মুখ তাহার উল্টা, অর্থাৎ পশ্চিমদিকে থাকিবে। এখন দুইজনের মাঝখানে মুখের নীচে খাবারের বালতি বসাইলেই দুইজনে একসঙ্গে খাইতে পারে।

শতরঞ্চির উপর হইতে কৌটা সরাইবার কৌশলটিও খুব সহজ। শতরঞ্চির উপর ভর না দিয়া তাহার উপর হাত পা না রাখিয়াও তাহাকে গুটাইয়া ফেলা যায়; আর একদিকে খানিকটা গুটাইলেই কৌটাটি উঠাইয়া লওয়া সহজ হয়।

সন্দেশ—১৩২৫

ভুল গল্প

রামবাবু লোকটি যেমন কৃপণ, তাঁর প্রতিবেশী বৃন্দাবনচন্দ্রের আবার তেমনি হাত খোলা। দুজনের মধ্যে বহুকালের বন্ধুতা, অথচ কি চেহারায়, কি স্বভাবপ্রকৃতিতে কোথাও দুজনের মিল নেই। বৃন্দাবন বেঁটেখাটো গোলগাল গোছের মানুষ, তাঁর মাথাভরা টাক, গোঁফদাড়ি সব কামানো। ছাপ্পান্ন বছর অতি প্রশংসার সঙ্গে রেজিস্ট্রি অফিসে চাকরি করে শেষদিকে তাঁর খুব পদোন্নতি হয়েছিল। এখন ষাট বছর বয়সে তিনি সবেমাত্র পেনসন নিয়ে বিশ্রাম করছেন। তিনি, তাঁর গিন্নি, আর এক বুড়ো জ্যাঠামশাই, এছাড়া ত্রিসংসারে তাঁর আর কেউ নেই। জ্যাঠামশাই বিয়েটিয়ে করেন নি, বৃন্দাবনের সঙ্গেই থাকেন।

রামপ্রসাদ স্যান্ন্যাল লোকটি ছিপছিপে লম্বা। পোস্টমাস্টার প্রাণশংকর ঘোষ ছাড়া তেমন ঢ্যাঙা লোক সে পাড়াতে আর খুঁজে পাবে-না। এক অক্ষর ইংরেজি জানেন না, কিন্তু মার্বেল পাথর আর পাটের তেলের ব্যবসা করে তিনি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি করেছেন, দেশে জমিদারি কিনেছেন আর নানারকম কারখানার অংশীদার হয়ে বসেছেন। তাঁর আটটি ছেলে, কিন্তু মেয়ে একটিও হল না বলে তাঁর ভারি দুঃখ। প্রকাণ্ড কপাল, তার ওপর একরাশ কাঁচাপাকা চুল, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি আর

চোখে হাল-ফ্যাশানের ফ্রেমছাড়া চশমা, কানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, কেবল নাকের ওপর স্প্রিং দিয়ে এ'টে বসানো। মোটকথা, দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটি কম কেউকেটা নন।

প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই পাড়ার মাতব্বর বাবুরা সবাই রামবাবুর বৈঠকখানা ঘরে এসে জোটেন, আর পান-তামাক-চা-বিস্কুট-সন্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে খুব হাসি-তামাশা, গল্পগুজব চলতে থাকে। বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড়, মেঝের ওপর প্রকাণ্ড ফরাস পাতা, তার ওপর কতকগুলো মোটাসোটা তাকিয়া আর রঙচঙে হাতপাখা এদিক-ওদিক ছড়ানো। তাছাড়া ঘরের মধ্যে কোথাও চেয়ারটেবিল বা কোনরকম আসবাবপত্র একেবারেই নেই।

পোস্টমাস্টারবাবু, হরিহর ডাক্তার, যতীশ রায় হেডমাস্টার, ইনস্পেকটর বাঁড়ুজ্জে প্রভৃতি অনেকেই সেখানে প্রায় প্রতিদিন আসেন। বৃন্দাবন বসু বড় লাজুক লোক, প্রথম প্রথম সেদিকে বড় একটা ঘে'ষতেন না। সে পাড়ায় তিনি সবে নতুন এসেছেন, কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই, খালি পোস্টমাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু জানাশোনা। যা হোক, পোস্টমাস্টারবাবু নাছোড়বান্দা লোক, তিনি বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার একরকম জোর করেই তাঁকে রামবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। প্রথম দিনের পরিচয়েই দুজনের আলাপ এমন জমে উঠলো যে তারপর থেকে রামবাবুর বৈঠকে যাবার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্রকে আর কোন তাগিদ দেওয়ারই দরকার হয় না।

এই ঘটনার সাতদিন পরে একদিন রামবাবুর বৈঠক খুব জমেছে। মানুষকে চিনতে না পারার দরুন কত সময়ে কত অদ্ভুত ভুল হয় তাই নিয়ে বেশ কথাবার্তা চলছে। হরিহরবাবু বললেন, "আমি একবার যা ফ্যাঁসাদে পড়েছিলাম সে বোধহয় আপনাদের বলি নি। সে প্রায় বিশ বছরের কথা। একদিন সন্ধ্যার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু শিগ্গির শিগ্গির ঘুমব ভাবছি, এমন সময়ে আমার ডিসপেনসারির চাকরটা এসে খবর দিল, প্রমথবাবু এসেছেন। প্রমথ মিত্তির তখন তার মাথার ব্যারামের জন্য আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতো। সেদিন কথা ছিল আমি তার জন্য একটা মিক্সচার তৈরি করিয়ে রাখব, সে সন্ধ্যার সময়ে সেটা নিয়ে যাবে। তাই চাকর এসে খবর দিতেই আমি ওষুধের শিশিটা তার হাতে দিয়ে সেই সঙ্গে একটা কাগজে লিখে দিলাম, ওষুধটা এখুনি একদাগ খাবেন। দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে কোনরকম মানসিক পরিশ্রম বা উত্তেজনা ভালো নয়, এ কথা সর্বদা মনে রাখবেন। তা হলেই আপনার মাথার ব্যারাম শিগ্গির সারবে। মিনিটখানেক যেতে না যেতেই চাকরটা ঘুরে এসে খবর দিল যে বাবুটি চিঠি পড়ে বেজায় খাপ্পা হয়েছেন এবং দাওয়াইয়ের শিশিটি ভেঙে আমায় গাল দিতে দিতে প্রস্থান করেছেন। শুনে তো আমার চক্ষু-স্থির! যা হোক, ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে বেশি দেরি হল না। একটু সন্ধান করতেই বোঝা গেল যে, লোকটি মোটেই প্রমথ মিত্তির নয়, আমারই মামাশ্বশুর, বাঁশবেড়ের প্রমথ নন্দী। যেরকম বদমেজাজি লোক, সেই রাত্রেই আমায় ছুটতে হল বুড়োর তোয়াজ করবার জন্য। বুড়ো কি সহজে ঠাণ্ডা হয়। তাঁকে অপমান করা বা তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করার যে আমার মোটেই অভিপ্রায় ছিল না এবং ওষুধটা কিংবা চিঠিটা যে তাঁর জন্য দেওয়া হয় নি, এই সহজ কথাটি তাঁর মাথায় ঢোকাতে প্রায় দুটি ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এদিকে বাসায় ফিরে শুনি প্রমথ মিত্তির এসে তার ওষুধ তৈরি

না পেয়ে বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। পরদিন সকালে আবার তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করি।"

ডাক্তারের গল্প শুনে ইনসপেকটরবাবু বললেন, "আপনার তো মশাই অল্পের ওপর দিয়ে গেল, আমার ঐরকম একটা ভুলের দরুন চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়েছিল। সেও বহুদিনের কথা, তখন আমি সবেমাত্র পুলিসের চাকরি নিয়েছি। ঘোষপুরের বাজার নিয়ে সে সময়ে সুদাস মণ্ডলের সঙ্গে রায়বাবুদের খুব ঝগড়া চলছে। একদিন বিকেলে খবর পাওয়া গেল, আজ সন্ধ্যার পর সুদাস লাঠিয়াল নিয়ে বাজার দখল করতে আসবে। ইনসপেকটর যোগীনবাবুর হুকুমে আমি ছয়জন কনসটেবল নিয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি ঘোষপুরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; সন্ধ্যার একটু পরেই দেখলাম নদীর দিক থেকে কিসের আলো আসছে। মনে হচ্ছে কারা যেন কাঁঠালতলায় বসে বিশ্রাম করছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমি খুব সাবধানে একটা ঝোপের আড়াল পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মশালের ঝাপসা আলোয় লাঠি হাতে কয়েকটা লোক বসে আছে, আর একটা পালকির আড়ালে দুজন লোক কথাবার্তা বলছে। কান পেতে শুনলাম একজন বলল, 'সুদাসদা, কতদূর এলাম?' উত্তর হলো, 'এই তো ঘোষপুরের বাজার দেখা যাচ্ছে।' অমনি আর কথা নেই! আমি জোরে শিস দিতেই সঙ্গের পুলিশগুলো মারমার করে তেড়ে এসেছে। পুলিশের সাড়া পাবামাত্র সুদাসের লোকগুলো 'বাপরেমারে' করে কে যে কোথায় সরে পড়ল তা আর ধরতেই পারা গেল না। কিন্তু পালকির কাছে যে দুটো লোক ছিল, তারা খুব সহজেই ধরা পড়ে গেল। তাদের একজনের বয়স অল্প, চেহারাটা গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের—বুঝলাম এইই সুদাস মণ্ডল। সে আমায় তেড়ে কি যেন বলতে উঠেছিল, আমি এক ধমক লাগিয়ে বললাম, 'হাতে হাতে ধরা পড়েছ বাপু। এখন রোখ করে কোন লাভ নেই, কিছু বলবার থাকে তো থানায় গিয়ে বোলো।' শুনে তার সঙ্গের বুড়ো লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে খানিকক্ষণ অনর্গল কি যে বকে গেল আমি তার কিছুই বুঝলাম না, খালি বুঝলাম যে সে আমাকে তার 'সুদাসদার' পরিচয় বোঝাচ্ছে। আমি বললাম, 'অত পরিচয় শুনবার আমার দরকার নেই, আসল পরিচয়টা আজ ভালোরকমই পেয়েছি।' তারপর তাদের হাতকড়া পরিয়ে মহা ফুর্তিতে তো থানায় এনে হাজির করা গেল। তারপর মশাই, যা কাণ্ড! হেড ইনসপেকটর যতীনবাবু রাগে আগুনের মতো লাল হয়ে, টেবিল থাবড়ে, দোয়াত উল্টে, কাগজ কলম ছুঁড়ে আমায় খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন যে আমি একটি আস্ত রকমের হস্তীমূর্খ ও অর্বাচীন পাঁঠা। যে লোকটিকে ধরে এনেছি সে মোটেও সুদাস মণ্ডল নয়। তার নাম সুবাসচন্দ্র বোস: সে যতীনবাবুর জামাই, সঙ্গের লোকটি তার ঠাকুরদার আমলের চাকর: যতীনবাবুর কাছেই তারা আসছিল। আমার বুদ্ধিটা হাঁ-করা বোয়ালমাছের মতো না হলে আমি সুবাস শুনতে কখনই সুদাস শুনতাম না—ইত্যাদি। অনেক কষ্টে, অনেক খোসামুদি করে অনেক হাতে-পায়ে ধরে, সে যাত্রায় চাকরিটা বজায় রাখতে হয়েছিল।"

ইনসপেকটরের গল্প শেষ হতেই বৃন্দাবনচন্দ্র টিকি দুলিয়ে বললেন, "আপনাদের গল্প শুনে আমারও একটা গল্প মনে পড়ে গেল। সেও ঐরকম 'উদোর-বোঝা-বুদোর-ঘাড়ে' গোছের গল্প। তবে ভুলটা আমি নিজে করি নি, করেছিল আমার ভাইপো—সেই যে ছোকরাটি এখন মেডিকেল কলেজে পড়ে। একদিন

সন্ধ্যার সময়ে ঘরের মধ্যে বসে আছি। ঘরেও বাতি জ্বালা হয় নি, বাইরেও বেশ অন্ধকার। খালি সরু নখের মতো একটুখানি চাঁদ সবেমাত্র পূর্বদিকে উঁকি দিয়েছে; এমন সময়ে মনে হলো যেন একটা মানুষ দেয়াল বেয়ে বেয়ে বাড়ির ছাদের ওপর উঠছে—''

বৃন্দাবনবাবু সবে এইটুকু বলেছেন, এমন সময়ে বারান্দায় কে ডাক দিল, "বাবু, টেলিগ্রাম।" রামবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে টেলিগ্রামখানা নিয়ে আসলেন, তারপর চোখের চশমাটি কপালে তুলে টেলিগ্রামখানা খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ ক্রমেই গোল হয়ে উঠছে দেখে ডাক্তারবাবু জিগেস করলেন, ''কি, ব্যাপার-খানা কি?'' রামবাবু ধপাস করে সোফার ওপর বসে পড়ে বললেন, ''এই দেখুন না, দেশ থেকে পরেশ টেলিগ্রাম করছে—'সিরিয়স একসিডেণ্ট, কাম হোম ইমিডিয়েটলি'—(অর্থাৎ গুরুতর দুর্ঘটনা, শীঘ্র বাড়ি আসুন)।'' রামবাবুর তিন ছেলে কয়দিন হলো পুজোর ছুটিতে দেশে গেছে, আর একটি মামাবাড়িতে আছে, আর বাকি তিনটি বাড়িতেই মায়ের কাছে রয়েছে। রামবাবু বললেন, ''এত লোক থাকতে পরেশ ছোকরাটাকে দিয়েই-বা টেলিগ্রাম করাতে গেল কেন? দুটো পয়সা খরচ করে বড়রা কেউ একটু ভালো করে গুছিয়ে টেলিগ্রাম করলেই পারত। এখন যে কি করি? আজ বিষ্যুৎবার, এ সময়ে রওনাই-বা হই কেমন করে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'' তিনি চাকরকে ডেকে তিনতলার বড় ঘর থেকে তাঁর কলমটা আনতে বললেন, আর বললেন. ''একটা টেলিগ্রাম করে দেখা যাক কি জবাব আসে।'' এই বলে তিনি আবার টেলিগ্রামখানা পড়তে লাগলেন।

গল্পগুজব তো চুলোয় গেল, সবাই মিলে ভাবতে বসলো এখন কি করা যায়। এমন সময়ে রামবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, ''ও কি! এ কার টেলিগ্রাম? এ তো দেখছি 'রমাপদ সেন' লেখা। আমার কি যে চোখ হয়েছে. আমি পড়ছি রমাপ্রসাদ সান্ন্যাল।'' বলতেই পোস্টমাস্টার প্রিয়শঙ্করবাবু বলে উঠলেন. ''ও! রমাপদ যে ও-পাড়ার গুপীবাবুর ভাই; আমি জানি তার শ্বশুরের নাম পরেশনাথ কি যেন।'' তখন খুব একটা হাসির ধুম পড়ে গেল।

রামবাবু বললেন, ''দেখলেন মশাই. পিওনব্যাটার কাণ্ড! এক ভুল টেলিগ্রাম দিয়ে আমায় মেরেছিল আর কি! একে বুড়ো বয়স তাতে আবার, জানেন তো, আমার হার্টের ব্যারাম আছে।" হেডমাস্টার যতীশবাবু শুনে হেসে বললেন, "আপনি আবার এর মধ্যেই বুড়ো হলেন কি করে?" রামবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এ পাড়ায় আমার মতন বুড়ো আর কটি খুঁজে পান দেখুন তো! এই আষাঢ় মাসে আমি ষাটের কোঠায় পা দিয়েছি।'' বৃন্দাবনবাবু বললেন. '' তা হলে আমার জ্যাঠামশায়ের কাছে আপনার হার মানতে হল। তাঁর বয়স উনসত্তর।'' ডাক্তারবাবু বললেন, ''আমারও বড় কম হয় নি, চৌষট্টি পার হয়ে গেছে। কিন্তু এ পাড়ায় বয়সের জন্য যদি প্রাইজ দিতে হয়, তা হলে ভোলানাথের বাপকেই দেওয়া উচিত; তাঁর নাকি এখন আটাত্তর বছর চলছে।'' এইরকম বাজে কথা চলছে. এমন সময়ে বড়-বড় বারকোশের ওপর থালা সাজিয়ে রামবাবুর তিনটি চাকর খাবার নিয়ে হাজির। কচুরি. নিমকি, সন্দেশ থেকে পিঠে পায়স পর্যন্ত প্রায় বারো-চোদ্দ রকমের খাবার। ডাক্তার বললেন, "বাপ রে! এ যে বিরাট আয়োজন। ব্যাপারখানা কি?'' রামবাবু বললেন. ''ঐ যা! আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। আজ আমার জামাই এসেছেন. তাই বাড়িতে একটু

মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়েছে।" ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "এত বড় গুরুতর কথাটাই বলতে ভুলে গেলেন? আপনার বয়সটা নিতান্তই বেড়ে গেছে দেখছি।" বৃন্দাবনবাবু বললেন, "তা হোক, আজকের বৈঠকে অনেক রকমই ভুলের কাণ্ড শুনলাম আর দেখলাম, কিন্তু এ ভুলটি বেশি দূর গড়ায় নি। আসুন, এখন ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া যাক।"

সন্দেশ—১৩২৮

ভুল গল্পের ভুলগুলি

(১) গোড়াতেই রামবাবুকে কৃপণ বলা হইয়াছে, কিন্তু গল্পে তাঁহার স্বভাবের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটেই কৃপণের মতো নয়।

(২) বলা হইয়াছে রামবাবু ও বৃন্দাবনবাবুর মধ্যে বহুকালের বন্ধুতা অথচ পরেই বলা হইয়াছে কাহারো সঙ্গেই বৃন্দাবনবাবুর আলাপ পরিচয় নাই।

(৩) প্রথমেই বৃন্দাবনবাবুর মাথাভরা টাক বলা হইয়াছে, অথচ তিনি টিকি দুলাইতেছেন।

(৪) প্রথমে বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স ৬০, কিন্তু তিনি চাকরি করিয়াছেন ৫৬ বৎসর।

(৫) বলা হইয়াছে যে গিন্নি আর জ্যাঠামহাশয় ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, কিন্তু পরে তাঁহার এক ভাইপোকে হাজির করা হইয়াছে।

(৬) প্রথমে পোস্টমাস্টারের নাম বলা হইয়াছে প্রাণশঙ্কর, পরে লেখা হইয়াছে প্রিয়শঙ্কর।

(৭) রামবাবু ইংরাজি জানেন না, অথচ তিনি চটপট ইংরাজি টেলিগ্রাম পড়িতেছেন।

(৮) রামবাবু পাটের তেলের ব্যবসা করেন কিন্তু এরকম কোন তেল বা ব্যবসার কথা শোনা যায় না।

(৯) তাঁহার বাড়ি দোতলা বলা হইয়াছে কিন্তু চাকর গেল তিনতলায়।

(১০) রামবাবুর আটটি ছেলে, কিন্তু মাত্র সাতটির হিসাব পাওয়া যাইতেছে।

(১১) রামবাবুর মেয়ে নাই কিন্তু তাঁহার এক জামাই আসিয়া হাজির।

(১২) তাঁহার চশমার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেরূপ চশমা কপালে তোলা যায় না।

(১৩) প্রথমে বলা হইয়াছে ঘরে কোনরকম আসবাবপত্র নাই, কিন্তু পরে সোফার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১৪) বলা হইয়াছে, 'বড়দিনের ছুটির মধ্যে এক রবিবার' বৃন্দাবন রামবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন; গল্পের ঘটনা তাহার 'সাত দিনের পরে' সুতরাং সেদিন বৃহস্পতিবার হইতেই পারে না।

(১৫) বড়দিনের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পূজার ছুটি অসম্ভব।

(১৬) বৃন্দাবনবাবুর বয়স গোড়াতেই ৬০ বলা হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁহার জ্যাঠামহাশয়ের বয়স মোটে ৬৯ হইতেই পারে না।

(১৭) চাঁদকে যখন আমরা সূর্যের কাছাকাছি দেখি তখনই তাহার চেহারা থাকে 'সরু নখের মতো'। সন্ধ্যার সময় পূর্বদিকে, অর্থাৎ সূর্যের উলটা দিকে তাহার ওরকম চেহারা অসম্ভব।

সন্দেশ—১৩২৮

নাটক

ঝালাপালা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল

বর্তমান খণ্ডে ঝালাপালা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল—সুকুমার রায়ের দুটি বহু- খ্যাত ও অভিনীত নাটক প্রকাশিত হল। অন্যান্য নাট্যরচনা পরবর্তীখণ্ডে যাবে।

এই দুটি নাটক সুকুমার যখন রচনা করেন তখন তাঁর বয়স বছর কুড়ি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩১ সালের সন্দেশে এই নাটক দুটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ঝালাপালা ১৩৩১ সালের বৈশাখ থেকে আষাঢ় এই তিনটি সংখ্যায় ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল ভাদ্র থেকে কার্তিক এই তিন সংখ্যায় বেরিয়েছিল।

এই নাটক দুটিতেই সহজ নির্মল হাস্যরসিক সুকুমারের পরিচয় পাঠক পাবেন, যদিও সুকুমার সাহিত্যের 'মূলরস' যে আজগুবি বা উদ্ভট রস, যাকে তিনি 'খেয়ালরস' বলেছেন, সেই অনন্যরসের রসিক সুকুমার রায় এখানে প্রায় অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়—সংগীত-রচয়িতা হিসেবে সুকুমার রায়ের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকটির সহজ হাস্যরসাসিক্ত গানগুলির মধ্যেই।

সূচীপত্র

ঝালাপালা

পাত্রগণ

পণ্ডিতমশায়, ঘটিরাম ও কেষ্টা : ছাত্র, পুলিস, দুলিরাম ও খেঁটুরাম : জমিদারের মোসাহেব, কেবলচাঁদ : ওস্তাদ, রামকানাই : জমিদারের ভৃত্য, কেদারকৃষ্ণ : জমিদারের মামা, জুড়ির দল

প্রথম দৃশ্য

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি

জুড়ির প্রবেশ ও গান

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ
ছাত্র দুটি করে পাঠ
পড়ায় নাই রে মন
সবাই হচ্ছে জ্বালাতন!
অতি ডেঁপো দুকান কাটা
ছাত্র দুটি বেজায় জ্যাঠা
কাউকে নাহি মানে
সবাই ধরো ওদের কানে!
গুরুমশাই টিকিওয়ালা
নিত্যি যাবেন ঝিঙেটোলা
জমিদারের বাড়ি—
সেথা আড্ডা জমে ভারি!

[জুড়ির প্রস্থান

পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত। (স্বগত) রোজ ভাবি জমিদার-মশাইকে বলে কয়ে তার বাড়িতেই একটা টোল বসাব। তা একটু নিরিবিলি যে কথাটা পাড়ব, সে আর হয়ে উঠল না। যে-সব বাঁদর জুটেছে, দুটো বাজে কথা বলবার কি আর জো আছে? এই জন্যেই বলি, ন্যায়শাস্ত্র যে পড়ে নি সে মানুষই নয়—সে গোরু, মর্কট!

নেপথ্যে ওস্তাদী গানের আওয়াজ

এই আবার চলল! এ এখন সারাদিন চলতে থাকবে! গলা তো নয়, যেন ফাটা বাঁশ! গানের তাড়ায় পাড়াসুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি কচ্ছে—কাগটা পর্যন্ত ছাতে বসতে ভরসা পায় না—অথচ ভাবখানা দেখায় এমনি, যেন গান শুনিয়ে আমাদের সাতচোদ্দং তিপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছে। আ মোলো যা—

ঘটিরামের প্রবেশ

এত দেরি হল কেন? এতক্ষণ কি কচ্ছিলি?

ঘটিরাম। আজকে শিগগির-শিগগির ছুটি দিতে হবে।

পণ্ডিত। বটে! অনেক দিন পিঠে কিছু পড়ে নি বুঝি! ছুটি কিসের?

ঘটিরাম। তাও জানেন না! ও-পাড়ায় গানের মজলিস হবে যে! বড়-বড় ওস্তাদ—

পণ্ডিত। না, না, ছুটি পাবি নে, যা! পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এসেই ছুটির খোঁজ।

ঘটিরাম। বাঃ ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু আসবেন!

পণ্ডিত। লাটসাহেব এলেও যেতে পাবি নে। কেষ্টা কোথায়!

ঘটিরাম। জানি নে। ডেকে আনব?—ওরে কেষ্টা!

[প্রস্থানোদ্যম

পণ্ডিত। থাক্ থাক্, ডাকতে হবে না। ওখেনে বসে পড়্।

ঘটিরাম। 'অল্ ওয়ার্ক্ অ্যান্ড্ নো প্লে মেক্স্ জ্যাক্ এ ডাল্ বয়'—বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেন না, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বালকদিগকে খেলিবার

সুযোগ দেওয়া উচিত, কেন না, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়— ফুর্তিটুর্তি সব মাটি। কেন না, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়— এই আমাদের যেমন হয়েছে। কেন না—

পণ্ডিত। ও-জায়গাটা পাঁচশোবার করে পড়তে হবে না। তোর অন্য পড়া নেই?— ঐ যে পুলিসটা যাচ্ছে! ওকে একটু ডাকা যাক। এই পাহারাওয়ালা, ইদিকে আও।

পুলিসের প্রবেশ

দেখো, হামারা পাশের বাড়িমে দিনরাত ভর এইসা ক্যাঁচক্যাঁচ করতা, নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হায়। ইস্‌কো কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা?

পুলিস। কেয়া বোলতা বাবু?

পণ্ডিত। আহা, এটা দেখি একেবারে নিরক্ষর মূর্খ! আরে, পাশের বাড়িমে একঠো গানের ওস্তাদ হায় নেই? উস্‌কো একদম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেহি হায়, দিন-রাত ভর্ কেবল সারে গামা ভাঁজতা হায়।

পুলিস। কেয়া হোতা?

পণ্ডিত। আরে, খেলে যা! (সুর করিয়া) সারে গাগা মাপা ধানি ধানি—এইসা কর্‌তা হায়।

পুলিস। হাম কেয়া করেগা বাবু? উ হমারা কাম নেহি।

পণ্ডিত। না, তোমার কাজ না! মাইনে খাবে তুমি, আর কাজ করবে বেচারাম তেলি!

পুলিস। হাঁ বাবু।

পণ্ডিত। চেঁচাস কাহে? ফের পুজোর বকশিশ চায়গা তো এইসা উত্তম-মধ্যম দেগা, থোঁতামুখ ভোঁতা কর দেগা।

পুলিস। আরে, পাগলা হায় রে, পাগলা হায়!

[পুলিসের প্রস্থান

পণ্ডিত। দেখ, ছোঁড়াটার আর সাড়াশব্দ নেই! ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যাঁ—

পণ্ডিত। 'অ্যাঁ' কিরে বেয়াদব? আজ্ঞে বলতে পারিস নে? আধঘণ্টা ধরে 'অ্যাঁ' করতে লেগেছে! বলি, পড়ছিস না কেন?

ঘটিরাম। হ্যাঁ, পড়ছিলাম তো।

পণ্ডিত। শুনতে পাই না কেন? চেঁচিয়ে পড়্।

ঘটিরাম। (চিৎকার করিয়া)

অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—

পণ্ডিত। থাক্, থাক্, অতো চেঁচাস নে, একেবারে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে।

কেষ্টার প্রবেশ

কেষ্টা। লেখাপড়া করে যেই গাড়িচাপা পড়ে সেই। শুনলুম আজকে ও-পাড়ায় গানের মজলিস হবে।

পণ্ডিত। এতক্ষণে পড়তে এসেছিস?

কেষ্টা। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন'— সেই কখন এসেছি—এতক্ষণে কত পড়ে ফেললাম। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন'—

পণ্ডিত। যা, যা, আমি যেন আর দেখি নি, কাল আসিস নি কেন?

কেষ্টা। কালকে কি করে আসব? ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত!

পণ্ডিত। ঝড় বৃষ্টি কিরে? কাল তো দিব্যি পরিষ্কার ছিল।

কেষ্টা। আজ্ঞে, শুক্কুরবারের আকাশ, কিচ্ছু বিশ্বেস নেই। কখন কি হয়ে পড়ে!

পণ্ডিত। বটে! তোর বাড়ি কদ্দুর?

কেষ্টা। আজ্ঞে, ঐ তালতলায়। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন।' 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন' মানে কি?

পণ্ডিত। 'আই'—'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'— গয়ে ওকারে গো—গৌ গাবৌ গাবঃ, ইত্যমরঃ। 'আপ' কিনা আপঃ—সলিলং বারি অর্থাৎ জল। গোরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কিনা গোরু কাঁদিতেছে। কেন কাঁদিতেছে? না 'উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা—'গো ডাউন', অর্থাৎ গুদমখানা। গুদমঘরে উই ধরে আর কিছু

রাখলে না, তাই না দেখে, 'আই গো আপ' —গোরু কেবলি কান্দিতেছে—

ঘটিরাম। (বিকট হাস্য)

পণ্ডিত। ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যাঁ—না, আজ্ঞে—

পণ্ডিত। ফের ওরকম বিটকেল শব্দ করবি তো পিটিয়ে সিধে করে দেব।

পণ্ডিতের নিদ্রাচেষ্টা

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই—

ঘটিরাম। ঘুমুচ্ছে? (ঠেলিয়া) ও পণ্ডিত-মশাই! কেষ্টা ডাকছে, কেষ্টা ডাকছে—

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পাচ্ছি না।

পণ্ডিত। হুঁ, দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা। সব বলে দিতে হবে! তোদের আর কিচ্ছু হবে না! 'ওয়ান্স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্ ইন্ এ স্ট্রীট নিয়ার মাই হাউস্'। 'ওয়ান্স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্'—কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। 'ইন এ স্ট্রীট'—সে বিস্তর চেষ্টা করিল। 'নিয়ার মাই হাউস্' —কিন্তু সে হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইয়েটা বুঝতে পাল্লি না? (ঘটিরামের প্রতি) কি রে? পালাচ্ছিস যে!

ঘটিরাম। না, পালাচ্ছি না তো! কেষ্টা এমনি গোলমাল কচ্ছে, কিচ্ছু আঁক কষতে পাচ্ছি না।

পণ্ডিত। কি আঁক দেখি নিয়ে আয়।

ঘটিরাম। আজ্ঞে এই যে! এই—চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে আধ মণ পটলের দাম কত?

পণ্ডিত। দেখি, চার সের আলু দশ আনা তো! তবে আধ মণ পটল—আহা, আবার পটল এল কোত্থেকে?

ঘটিরাম। তা তো জানি না। বোধ হয় পটলডাঙা থেকে!

পণ্ডিত। দুৎ! এ কি একটা আঁক হতে পারে? গাধা কোথাকার!

ঘটিরাম।—তাই বলুন! আমি কত যোগ করলাম, ভাগ করলাম, শেষটায় জি-সি-এম্ পর্যন্ত করলাম, কিছুতেই হচ্ছিল না। বড্ড শক্ত, না?

পণ্ডিত। মেলা বকিস নে, যাঃ!

ঘটিরাম। যাবো? ছুটি?

কেষ্টা। ছুটি—ছুটি—ছুটি—

পণ্ডিত। না, না, ছুটি-টুটি হবে না।

ঘটিরাম। হ্যাঁ ভাই, তুই সাক্ষী আছিস, বলেছেন যা!

কেষ্টা। হ্যাঁরে, আমাদের কিন্তু কোন দোষ নেই।

পণ্ডিত। দেখলে কাণ্ডটা! এই-সব হুজুকেই তো ছেলেগুলোকে মাটি করলে! আর জমিদারমশাইয়ের আক্কেলটা দেখ—এখানে এসে অবধি দশভূতে তাকে পেয়ে বসেছে—দেখ দেখি, টাকা ওড়াবার জন্য শেষটায় কিনা গানের মজলিস! ছ্যা ছ্যা!

[পণ্ডিতের প্রস্থান

জুড়ির প্রবেশ ও গান

সাবধান হয়ে সবে অবধান কর রে।
ওহে শিষ্য গুণধর কোলাহল ছাড় রে॥
(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার।
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার॥
(ওসে) বিক্রমে বিক্রমাদিত্য সর্বশাস্ত্রে ধুরন্ধর।
(আহা) সাক্ষাৎ যেন দাতাকর্ণ দানব্রতে ভয়ঙ্কর॥
(এরা) খাচ্ছে দাচ্ছে ফুর্তি কচ্ছে নিত্য তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘণ্টা মারছে আড্ডা বর্থাশিশাদি সন্ধানে॥
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হল্লা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যের ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক॥

(আহা) একজন বড্ড সাদাসিধে ভেদ করে
না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা
স্বার্থপর॥
(ওরে) পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত বড্ড চণ্ডীবাবুর
হিতার্থ।
(দেখ) অম্লরুচি ধ্বংস করি কচ্ছেন সবায়
কৃতার্থ॥
(আহা) বিদ্যে জাহির কচ্ছে সবাই পোলাও
কোর্মা ভোজনে।
(দেখ) যত রাজ্যের নিষ্কর্মার দল বাড়ছে
সবাই ওজনে॥
(ওরে) অবিশ্রান্ত হুজুক নিত্য মুহূর্তেকো
শান্তি নেই।
(আজ) পঞ্চবর্ষ অন্ত হৈল ক্ষান্ত দেবার
নামটি নেই॥
(ওরে) কস্মিনকালে শুনি নাই রে এমন
কাণ্ডকারখানা।
(ওই) খোসামুদে ভণ্ডগুলো আহ্লাদেতে
আটখানা॥
(আহা) পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হবে চণ্ডীবাবুর
মস্তকে।
(দেখ) অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে চিত্রগুপ্তের
পুস্তকে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ি

দুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রবেশ

দুলিরাম। এত কাণ্ডকারখানা করা গেল, এখন ভালোরকম দু-একটা ওস্তাদ আসে তবে মজলিসটা জমে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ। বেশ তালে আছি দাদা! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, খাওদাও আর ফুর্তি কর।

দুলিরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম ঘি-দুধ চর্বচোষ্য চলছে, আর কটা দিন যেতে দাও না—আর চেনবার জো থাকবে না।

কেবলচাঁদের প্রবেশ

কেবল। আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজলিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটুরাম ও দুলিরাম। (পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল। সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁটুরাম। কোন জন্মে নামও শুনি নি—

দুলিরাম। চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না—

কেবল। হ্যাঁ, তা আপনারা গোপীকেষ্ট-বাবুকে চেনেন তো?

খেঁটুরাম। গোপীকেষ্ট?

দুলিরাম ও খেঁটুরাম। হ্যাঁ—নাম শুনেছি—বোধ হচ্ছে।

কেবল। আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়ি-ওয়ালার খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিসতুতো ভাই।

দুলিরাম। তাই নাকি!

খেঁটুরাম। সে কথা বলতে হয়—আসতে আজ্ঞা হোক মশাই।

দুলিরাম। বসতে আজ্ঞা হোক মশাই—

খেঁটুরাম। কি নামটা বললেন আপনার?

কেবল। কেবলচাঁদ।

দুলিরাম। কি বললে? বক্কেশ্বর? তা বেশ, বকদাদা, আজ তোমার গান শোনা যাবে!

কেবল। তা বেশ, কি বলেন—গানটা আরম্ভ করলে হয় না?

খেঁটুরাম। না, না! এখনই কি দরকার? সবাই আসুক আগে—

কেবল। এই সুর-টুরগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

দুলিরাম। আরে মশাই! আমাদের কাছে 'গা'-ও যা, 'ধা'-ও তাই—সবই সমান।

কেবল। হ্যাঁ—গানগুলোর কি মুশকিল জানেন? ওগুলো আমার স্বরচিত কিনা—তাই, গাইতে একটু সংকোচ বোধ কচ্ছি।

খেঁটুরাম। তা নাই-বা গাইলে—অন্য কিছু গাও না—

কেবল। আ মোলো যা! এরা আমায় গাইতে দেবে না দেখছি, আমার ভালো-ভালো গানগুলো—

কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রবেশ

ঘটিরাম। আমরা গান শুনতে এলুম।

কেষ্টা। কই রে, লোকজন সব কই? গাইবে কে? আপনি বুঝি?

কেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা এ'রা যখন নেহাত পেড়াপীড়ি কচ্ছেন তখন না গাইলে সেটা ভয়ংকর খারাপ দেখাবে।

কেবলচাঁদ গুন গুন করিতে-করিতে সহসা সপ্তমে চিৎকার

খে'টুরাম। রক্ষে কর দাদা, এ অত্যাচার কেন?

দুলিরাম। মশাই, এটা 'ডেফ্ অ্যান্ড ডাম্ব্' ইস্কুল নয়—আমাদের কানগুলো বেশ তাজা আছে।

কেবল। আজ্ঞে, সুরটা ঠিক আন্দাজ পাই নি—একটু চড়ে গিয়েছিল—না?

দুলিরাম। একটু বলে একটু?

খে'টুরাম। রীতিমত তেড়ে এসেছিল।

কেবল। আচ্ছা, একটু নামিয়ে ধরি—

কেবলচাঁদের গান

আহা, পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে?
কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ
কোথা কর্ণ ভীমার্জুন
কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায়-বা সে মনু রে?
মাটির সঙ্গে মিশছে সবি
কে'চোর মতো খাচ্ছে খাবি।
কেবল আপিস খাটি কচ্ছে মাটি নধরপুষ্ট তনু রে—
ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই
হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণের সে—

কেবলচাঁদের মাথা চুলকানো

দুলিরাম। শিঙ নাই আর লেজ নাই—

কেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ—

কেবলচাঁদের গান

ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই
খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাই
মনের দুঃখ কারে বলি মোরা কি হনু রে—
আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে।

খে'টুরাম। দাঁড়ান একটু সামলে নি—অতো করুণ রস করবেন না।

খে'টু ও দুলি ক্রন্দনোন্মুখ। কেষ্টা ও ঘটিরামের উচ্চহাস্য

খে'টুরাম। তবে রে ছোকরা! তোরা হাসছিস কেন?

ঘটিরাম। বাঃ! হাসি পেলে হাসব না?

দুলিরাম। হাসি পাবে কেন? এখানে হাসবার কি হল?

খে'টুরাম। ছ্যাবলামি পেয়েছিস? কথা নেই বার্তা নেই—হ্যাঃ-হ্যাঃ!

ঘটিরাম। কি রে কেষ্টা, হাসি পেলে হাসব না?

কেষ্টা। এই রে, পণ্ডিতমশাই আসছে—

ঘটিরাম ও কেষ্টা। এই রেঃ, এই রেঃ, এই রেঃ, পণ্ডিতমশাই আসছে—মাটিং চকার—তোর র‍্যাপারটা দে তো।

ঘটিরাম ও কেষ্টার র‍্যাপার মুড়ি হইয়া উপবেশন। পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত। ভালো, ভালো! তোমরা মধ্যে-মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার না? নিত্যি-নিত্যি জমিদারমশাইকে বিরক্ত করাটা কি ভালো দেখায়?—ইকী! ক্যাবলাটা এখানে এয়েছে কি করতে? (দুলিরাম ও খে'টু-রামের প্রতি) আমোলা যা! তোমাদের যত রাজ্যের ইয়ার-বকশী সব বুঝি জোটাচ্ছ একে-একে?

কেবল। দেখলেন মশায়? আমাকে অপমান কললে। আমায় ইয়ার-বকশী বললে, অমন কললে কিন্তু আমি গাইব না।

পণ্ডিত। তা নাই-বা গাইলে—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যা না গান! গানের ধমকে আমাদের পর্যন্ত পিলে চমকে ওঠে—তা, অন্যে পরে কা কথা!

ছাতা ও বিশাল পুঁটলি লইয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামকানাই। (ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রতি) আপনাদের কি হয়েছে? অমন করে বসে আছেন যে? কাশি? জ্বর? ন্যাড়া মাথা? ঠাণ্ডা লাগবে বলে?

পণ্ডিত। (ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রতি) কি হে, এখানে এসে হাজির হয়েছ? আচ্ছা বেরিয়ে নাও তারপর—

রামকানাই কর্তৃক পণ্ডিতস্কন্ধে পুঁটলি স্থাপন

তুমি কি রকম মানুষ হে?

রামকানাই। কেন? বেশ দিব্যি মানুষটি।

পণ্ডিত। বলি চোখ দিয়ে দেখতে পাও না কি?

রামকানাই। চোখ দিয়ে দেখতে পাই না তো কি কান দিয়ে দেখতে পাই?

পণ্ডিত। না হে, তুমি বড় বাচাল - শাস্ত্রে বলেছে—

রামকানাই। না—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে কিছু বলে নি—

পণ্ডিত। আহা, বলি, তোমায় তো কেউ এখেনে ডাকে নি?

রামকানাই। ডাকবে আবার কি? এ কি নিলেমের মাল পেয়েছ যে ডাকাডাকি করবে?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তবে অমন করে বসে থাকলে তো ভালো দেখায় না।

রামকানাই। ভালো দেখায় না কি হে? তোমাকে যে অশথগাছের মামদো ভূতের মতো দেখা যায়, সে বেলা কি?

পণ্ডিত। আহা, বলি, যদি কিছু বলবার থাকে, তা ঝটপট বলে বাড়ি যাও-না কেন?

রামকানাই। হ্যাঁ, তাহলে তুমিও আমার পুঁটলিটা সরাবার সুবিধা পাও।

পণ্ডিত। কি আপদ! বলি পুঁটলিটা রেখে যেতে বললে কে? নিয়েই যাও-না কেন?

রামকানাই। মুটের পয়সা দেবে কে?

পণ্ডিত। হাঃ—মুটের পয়সা দেবে কে? মুটের পয়সা দেবে!

রামকানাই। উঃ! দুৎ! তোমার ময়লা চাদরটা আমার নাকের কাছে নেড়ো না।

জমিদারের প্রবেশ

খেঁটুরাম। সর সর, জমিদারমশাই আসছেন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর, সর।

জমিদার। কি রে! রামা কখন এলি? বেশ, বেশ, ভালো আছিস তো?

রামকানাই। (প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে এই মাত্র আসছি—

পণ্ডিত। আপনার এই লোকটা ভারি উদ্ধতস্বভাব - কথা বলে যেন তেড়ে মারতে আসে।

জমিদার। ওরে রামা! বাবুদের কিছু বলিস-টলিস নে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

জমিদার। ও আমার বহুকেলে পুরোনো চাকর কিনা—কারুর কথা-টথা বড় শোনে না। তবে লোকটা ভালো—দেশে গিছিল, আজ বহুকাল পরে এল।

খেঁটুরাম। ইনি হচ্ছেন কেবলচাঁদ ওস্তাদ—

দুলিরাম। মস্ত গাইয়ে।

খেঁটুরাম। আশ্চর্য! যত ওস্তাদ এসেছিল, ওঁর চেহারা দেখেই দে চম্পট।

দুলিরাম। তা হবে না? এঁরই গান শুনে আমাদের নবাবসাহেব মুর্ছো গেছিলেন, এঁরই গান শুনবার জন্য কিষাণবাবু তেতাল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গেছিলেন—

খেঁটুরাম। এঁকে সভায় রাখতে কত রাজা-বাদশা হদ্দ হল।

দুলিরাম। কত টাকাকড়ির শ্রাদ্ধ হল।

খেঁটুরাম। কত ওস্তাদ গাইয়ে জব্দ হল।

পণ্ডিত। ওহে, বেশি বাড়িয়ে কাজ কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অলমতিবিস্তারেন—বেশি বাড়াতে নেই।

খেঁটুরাম। আমি অনেক হাঙ্গামা করে তবে ওঁকে এনেছি।

দুলিরাম। তুই এনেছিস? দেখলেন মশাইরা, কাজ করব আমি, আর বাহাদুরি নেবেন উনি!

খেঁটুরাম। খবরদার!

দুলিরাম। চোপরও!

খেঁটুরাম। ফের!

পণ্ডিত। সমাশ্বসীহি, সমাশ্বসীহি, জমিদারমশায়ের সামনে এমন গর্হিত আচরণ করতে নেই! আহা! সঙ্গীতশাস্ত্র-রসানভিজ্ঞ, সংগীত আর ন্যায়শাস্ত্র বুঝলেন কিনা—অতি উপাদেয় জিনিস! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অদ্ভুত-তদ্ভাবে চবী সে এক অত্যদ্ভুদ্ ব্যাপার—

জমিদার। তাহলে গান আরম্ভ হোক। ওস্তাদজি আপনি মাঝে-মাঝে আমাদের গান-টান শোনাবেন—

কেবল। হ্যাঁ, তা, শোনাব বৈকি—অবিশ্যি এর দরুন আমার সব কাজকর্মের বড্ড ভয়ংকর ক্ষেতি হবে, কিন্তু তা হোক—

পণ্ডিত। আরে ছো, ছো! তুমি তো ভারি ছোটলোক হে। এই সামান্য কাজটুকু করতেও তোমাদের যত রাজ্যের আপত্তি! আজ যদি জমিদারমশাই আদেশ করেন, এখেনে একটা টোল খুলতে হবে—আমার একশো কাজ থাক, হাজার কাজ থাক, আমি অমনি টোল খুলতে লেগে যাব। কেন? না, এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত যে ওঁর খাতিরে কিছু ত্যাগ স্বীকার করি, হোকগে ক্ষেতি, তাতে কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? রামা! যাও তো, এখুনি একটা লোক পাঠিয়ে আমার জিনিসগুলো ধাঁ করে আনিয়ে দাও তো—চণ্ডী জমিদারমশায়ের সম্মান রাখতেই হবে।

জমিদার। কিন্তু এখেনে জায়গার যে বড় অসুবিধে—

পণ্ডিত। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ওর মধ্যেই সুবিধা করে নেব। বুঝলেন চণ্ডীবাবু, আপনি আমার জন্যে চিন্তিত হবেন না। রামা!

রামকানাই। আবার কেন?

পণ্ডিত। ঐ বাইরের বড় ঘরটায় আমার বন্দোবস্ত করে দাও তো।

রামকানাই। সেখেনে দেখলুম দুটি বাবু বসে আছেন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার গাঁয়ের লোক। আপনার বাগানটা দেখলুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তাই ওদের বলে কয়ে এনেছি; ওরা এ বিষয়ে একেবারে এক্‌স্‌পার্ট। মাইনের জন্য ভাববেন না—পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে।

পণ্ডিত। যা! বাবুদের হটিয়ে দে। বলগে ওখেনে টোল বসবে।

দুলিরাম। সিকী! আমার গাঁয়ের লোক! হবুগ্রামের অপমান!

পণ্ডিত। আরে না, না—রামা, দেখিস যেন বাবুদের ধমক-ধামক করিস নে—জমিদার মশায়ের যাতে অখ্যাতি না হয়—মিষ্টি করে বলবি। আর দেখ্ (গলা নামাইয়া) নেহাত যদি না শোনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দিস।

খেঁটুরাম। শোন্—ঘর-টর দিয়ে কাজ নেই—জিনিসপত্রগুলো এনে উঠোনে ফেলে রাখিস—

পণ্ডিত। আর দেখ্—ঐ শব্দকল্পদ্রুমখানা আনতে ভুল হয় না যেন—আর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে—

দুলিরাম। যেমন কথামালা ধারাপাত—

পণ্ডিত। সেগুলো হারায় না যেন—

কেবল। হ্যাঁ—সেই গানের কথাটা চাপা পড়ে গেল—

রামকানাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানটা হয়ে যাক—তারপর যাব এখন।

কেবল। এখানে বাজিয়ে কেউ নেই?

রামকানাই। আমি বাজাতে পারি—দাও তো পাখওয়াজটা—ধত্তেরে কেটে তাগ ঘ্ড়ান্ ঘ্ড়ান্ নাগে নাগে নাগে নাগে—নাগে দেৎ ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে—কই! গান আসছে না বুঝি?
পণ্ডিত। ইকী! চাকরটা এরকম করে কেন?
জমিদার। পুরোনো লোক কিনা! রামা তুই এখন চুপ কর—বাবুদের বাধা দিস নে।
রামকানাই। যে আজ্ঞে!

কেবলচাঁদের গান

তানানা তাইরে নারে—তারে না তাইরে নারে—তারে না তাইরে নাইরে—না-তানা-না—
রামকানাই। এই যা! তাল কেটে গেল!
কেবল। আর কেন? থামো না বাপু!
রামকানাই। কেন মশাই? থামব কেন? নাগেদেৎ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে দেৎ—দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে—
পণ্ডিত। ওহে, জমিদারমশায়ের সামনে অমন করতে নেই—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—গর্ত্তমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ—বুঝলে কিনা।
জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা—পুরোনো মানুষ কিনা!
দুলিরাম। হ্যাঁ, ওস্তাদজি—ঐ যে গাইলেন ওটা কি তাল বলছিলেন?
কেবল। ওটা—ওটা হচ্ছে মান্দ্রাজী একতালা।
খেঁটুরাম। সবে একতালা? আহা, যখন চৌতালায় উঠবে—তখন না জানি কেমন হবে!
রামকানাই। তখন সব কানে তালা লেগে যাবে।
পণ্ডিত। হ্যাঁ ওস্তাদজি, তাহলে আপনার গানটা শিগ্গির শেষ করে ফেলুন—আহা অতি উচ্চাঙ্গের সংগীত!
রামকানাই। ভারি উচ্চাঙ্গ! সেই আমাদের একজন যা ইমনকল্যাণের আলাপ করেছিল—সেটা পুরোপুরি শিখতে পারি নি। যেটুকু শিখেছি শুনবেন? আ—আ—আ—কেউ কেউ কেউ।
জমিদার। রামা!
রামকানাই। যে আজ্ঞে।

[রামকানাইয়ের দ্বার পর্যন্ত প্রস্থান

কেবলচাঁদের গান

কেবল। হায় রে সোনার ভারত—

ঘটি ও কেষ্টার উচ্চহাস্য

ঘটিরাম। হাসিয়ে দিলি যে?
কেষ্টা। হাসিয়ে দিচ্ছিস কেন রে?
ঘটিরাম। তুই তো আগে হাসছিলি—
কেষ্টা। যাঃ! আমি কখন হাসলাম—
কেবল। দেখলেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কি কাণ্ডটা কললে!
খেঁটুরাম। রামা! একে সটাং রাস্তা পার করে দিয়ে আয় তো—
রামকানাই। (ওস্তাদকে ধরিয়া) একে?

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান

কেবল। এইও, ইস্টুপিট বেয়াদোব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস্!
পণ্ডিত। ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক!
জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা দেখি—তুই আমার নাম ডোবাবি দেখছি।

[রামকানাইয়ের প্রস্থান

কেবলচাঁদের আবার গান আরম্ভ

কেবল।

হায় রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্ত হইল
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধুলায় পতিত রইল
যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত সব ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান
আজকাল তাকেই কিনা—সব অবজ্ঞা করিতেছে—
এবং দেখাচ্ছে সবাই মর্তমান
কোথা সেই তিরিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ

সাড়ে চোদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান
সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে
সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো
দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!

দুলিরাম। এই! সিডিশাস্!

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কি বললে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?

খেঁটুরাম। তবে রে! সিডিশাস্ গান কচ্ছিস কেন রে?

দুলিরাম। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেণ্টের চাকরি করে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁরে, ওর মামাতো ভাইয়ের চাকরি ঘোচাবি কেন রে?

কেবল। আমি তো জানতুম নে—আমি তো জানতুম নে—

পণ্ডিত। জানতি নে কিরে? কেন জানতি নে?

পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে প্রহার

কেবল। কী! মারলি কেন রে? ফের মার দেখি!

পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে পুনঃপ্রহার

এবার মারবি তো একেবারে—

পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে পুনঃপ্রহার

উঃ! এত জোরে মারলি কেন রে ইস্টুপিট! দাঁড়া দেখাচ্ছি—

[কেবলচাঁদের পলায়ন

পণ্ডিত। যা না গাইলেন! গলা শুনলে ছত্রিশ রাগিণী ছুটে পালায়।

দুলিরাম। ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের 'গ'টা মেলে কিনা সন্দেহ!

পণ্ডিত। তোমরা কোত্থেকে এ-সব আপদ জোটাও হে? জমিদারমশায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে কি তোমাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

খেঁটুরাম। এই দুলিরামটাই তো যত নষ্টের গোড়া, যত রাজ্যের অঘামারা রোখো লোক ডেকে আনবে!

দুলিরাম। বিলক্ষণ। আমি ডেকে আনলাম? আমার সাতজন্মে ওর সঙ্গে আলাপ নেই।

খেঁটুরাম। এত করে বারণ কল্লুম, তবু ডেকে আনলে!

দুলিরাম। না, মশাই! ও নিজে ডেকে এনেছে আমি আদবে কিছু জানি নে!

পণ্ডিত। জানো না তো জানো না—তা অত গরম হবার দরকার কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উষ্ণত্বমগ্ন্যাত্যপসংপ্রয়োগাৎ—

জমিদার। এবারে গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দেখি—

খেঁটুরাম। আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা! উঃ!

দুলিরাম। আমাদের বেড়ালটা সর্দি-গর্মি হয়ে মারা গেছে—

জমিদার। এ-সব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে—

পণ্ডিত। হ্যাঁ, সিদিন আমাদের ওখেনে ধূমকেতুর ন্যাজ দেখা গিছিল—

দুলিরাম। কার ন্যাজ কে জানে?

খেঁটুরাম। ওঁরই ন্যাজ হয়তো।

জমিদার। ধূমকেতুটা এসে কি কাণ্ডই কল্লে? ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প—

খেঁটুরাম। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি—

দুলিরাম। পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশান!

পণ্ডিত। আমি শুনেছি ঐ পানের পোকার খবরটা নাকি সত্যি নয়!

খেঁটুরাম। আলবাৎ সত্যি! নন্দলাল ডাক্তার স্বচক্ষে দেখেছে লোকে পান খাচ্ছে আর মরছে!

জমিদার। ঈস্! বল কি হে? তাহলে তো কাথাটা সত্যি বলতে হবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ—দূরবীণ দিয়ে সে পোকা দেখা গেছে—

খেঁটুরাম। কলকেতার সায়েব ডাক্তার বলেছে তার ভয়ঙ্কর তেজাল বিষ।

দুলিরাম। হ্যাঁ—আমি দেখিছি, সাদা মতন আবার ন্যাজ আছে। কার ন্যাজ কে জানে?

রামকানাইয়ের দ্রুত প্রবেশ

রামকানাই। এই রে সেই দাড়িওয়ালা! সেই দাড়িওয়ালা বাবুটা আমায় তেড়ে এসেছিল! উঃ!

সকলে। কি হয়েছে! কি হয়েছে?

রামকানাই। সেই বাইরের ঘরের বাবুরা—উঃ—আমায় বেদম মারপিট করেছে! একজন ছাগলদাড়ি বাবু আছে, সে আমায় দেখেই হঠাৎ ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে এসেছিল—উঃ!

পণ্ডিত। সিকী রে! তুই করেছিলি কি?

রামকানাই। আমি তো কিছু করি নি - আমি বললুম, এখেনে ঢোল বসবে, বাবুরা যদি একটু অন্যত্তর যান, নেহাত যদি না যান, আপনাদের ঘাড়ে ধাক্কা দেওয়া হবে।

দুলিরাম। কি! ভদ্রলোককে এমনি করে ইনসাল্ট্!

খেণ্টুরাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

রামকানাই। আমি তো মিষ্টি করে বলেছিলুম—

খেণ্টুরাম। ব্যাটা, তোমায় মিষ্টি জুতো না দিলে তুমি সিধে হবে না—

পণ্ডিত। আমার জিনিসপত্তরগুলো কি কল্লি?

রামকানাই। ঐ যে, বাইরের উঠোনে ফেলে রেখেছি!

পণ্ডিত। দেখলেন মশাই, কাণ্ডটা দেখলেন?

রামকানাই। এই বাবুটি যে বললেন!

পণ্ডিত। যা, যা, যেখানে হয় শিগ্গির বন্দোবস্ত করে দে! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে এক জায়গায় এমনি লিখেছে—

রামকানাই। বলি ন্যায়শাস্ত্র শুনলে তো আর পেট ভরবে না! তোমরা কি এইখেনে বসেই রাত কাবার করবে নাকি? জমিদারমশায়ের কি আর খাওয়া-দাওয়া নেই?

জমিদার। ওরে রামা, অমন করে বলতে নেই—বাবুদের মান্য করে কথা বলিস—আর পণ্ডিতমশাইকে কি চোখ রাঙায়?

রামাকানাই। যে আজ্ঞে, প্রাতঃ প্রণাম পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত। রামা, নেতাইবাবুর বাড়ি আমার দুই পোড়ো থাকে, তাদের খবর দিস তো।

[পণ্ডিত, খেণ্টুরাম ও দুলিরামের প্রস্থান

জমিদার। রামা, দেখছিস তো কাণ্ডটা?

রামকানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ—

জমিদার। উৎপাত যে বেড়ে চলল—কি করা যায়?

রামকানাই। আজ্ঞে, হুকুম পেলেই সব সাফ করে দি।

জমিদার। না, না, ওরা আপনা থেকে উঠে যায়, এমন কিছু করা যায় না? অথচ আমার নিন্দেটা না হয়!

রামকানাই। তাহলে ওদের ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া দিলে হয় না?

জমিদার। দুৎ! এটাকে কিছু জিগগেস করাই ঝকমারি! যা, তুই এক কাজ কর - আমার মামার-বাড়ি যা। সেখেন থেকে কেদারমামাকে ডেকে আনবি—তাকে সব বলে কয়ে আনিস!

রামকানাই। যে আজ্ঞে—

জমিদার। মামা এলেই সব সিধে করে দেবে—উকিলে বুদ্ধি কিনা!

গান

নাছোড়বান্দা নড়েন না!
উড়ে আসেন, জুড়ে বসেন,
মাথায় কেন চড়েন না!
নাছোড়বান্দা নড়েন না!
যাবার নামটি করেন না,
ধাক্কা দিলে সরেন না!
নাছোড়বান্দা নড়েন না!
কচ্ছে সবাই যাচ্ছা তাই!
চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গালি,
হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই!

কচ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই
আসছে যে-কেউ পাচ্ছে ঠাঁই,
ইকিরকম হচ্ছে ভাই?
কচ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই!

তৃতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ি

কেদারকৃষ্ণ, জমিদার ও রামকানাই

কেদার। ডোণ্ট্ পরওয়ার ভাগ্নে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বড় জোর দুটো দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। রামা!

রামকানাই। আজ্ঞে—

কেদার। তুই মেলা বুদ্ধি খরচ করিস নে—যা বলব তাই করে যাবি। আগে আমার বইগুলো আর খাতা পেনসিলটে বার করে রাখ। [রামকানাইয়ের প্রস্থান

ভাগ্নে, তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে, আমি সব সাবাড় করে দিচ্ছি—কিছু গোল-টোল বাধলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও—আমায় গাল দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দিও। [উভয়ের প্রস্থান

পণ্ডিত ও দুলিরামের প্রবেশ

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই বড় আপসোস কচ্ছিলেন—বলছিলেন, এই খেঁটুরামের উৎপাতে তাঁর আর সোয়াস্তি নেই—ওকে যত শিগ্‌গির পার অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও—আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রে বলেছে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—বুঝলে কি না?

দুলিরাম। হ্যাঁ, এ আর একটা মুশকিল কি? এক্ষুণি ঘাড় ধরে—

খেঁটুরামের প্রবেশ

দাঁড়ান আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনি। [দুলিরামের প্রস্থান

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই যা চটেছেন দুলিরামের ওপর—কী বলব! দেখ, শেষটায় ওর জন্যেই তোমাদের সক্কলের অন্ন মারা যাবে। ওকে যদি তাড়াতে পার, আঃ—জমিদারমশাই যা খুশি হবেন!

খেঁটুরাম। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সব কয়-টাকে ভাগিয়ে দিচ্ছি, (স্বগত) তোমাকে সুদ্ধু।

পণ্ডিত। আর তোমার নিন্দেটা যা করে, কী বলব—এইমাত্র তোমার নামে যা নয় তা বলে গেল।

দুলিরামের প্রবেশ

রামা! ওরে রামারে! ঝট করে দুটো পান দিয়ে যা তো— রামাটা গেল কোথায়? ওহে, রামাকে একটু ডেকে দাও তো।

খেঁটুরাম। না রে, ডাকিস নে।

দুলিরাম। রামা!—হয়তো বাড়ি নেই।

খেঁটুরাম। রামাটা ভারি দুষ্টু! এতক্ষণ হয়তো ছিল, যেই আপনি ডেকেছেন, অমনি হয়তো পালিয়েছে।

দুলিরাম। হয়তো অসুখ-টসুখ করেছে।

পণ্ডিত। তোমরা হয়তো-হয়তো করেই সব সারলে দেখছি! রামারে!

রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামা, জমিদারমশাই নীচে নামলে একটু খবর দিস তো, আমার একটু নিরিবিলি কথা আছে।

খেঁটুরাম। আ মোলো যা! আমারও নিরি-বিলি কথা আছে।

দুলিরাম। আমারও আছে—

রামকানাই। তোমরা বসে-বসে ভেরেণ্ডা ভাজো, তিনি আজ নীচে নামছেন না—তাঁর মামা এসেছেন যে! তাঁকে কিন্তু তোমরা চটিও না, ভারি বদমেজাজ আর রগচটা—এই যে তিনি আসছেন—আসুন, আসুন—ইনিই কেদারকেষ্টবাবু, জমিদারমশায়ের মামা!

সকলের অভিবাদন

পণ্ডিত। আসুন, আসুন—আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রে বলেছে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আপনার ভাগ্নেটি—আহা! অতি চমৎকার লোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—

দুলিরাম। নাঃ! আবার ন্যায়শাস্ত্র শুরু করল!

খেঁটুরাম। চল আমরা একটু ঘুরে আসিগে।

কেদার। এই লোক দুটোর চেহারা তো বড় সুবিধের নয়—

পণ্ডিত। তা সুবিধের হবে কোত্থেকে—হাজার হোক ছোটলোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে--মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। আপনার ভাগ্নে তো কাউকে কিছু বলেন না—তাই ওরা আস্কারা পেয়ে গেছে। এমনি বেয়াদবী করে—কি বলব!

কেদার। বটে! তা আপনারা প্রতিকার করেন না কেন?

পণ্ডিত। কি করি বলুন? আপনারা থাকতে আমার তো কিছু বলা উচিত হয় না।

কেদার। এক কাজ করুন, এর পর যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, ঘাড়টি ধরে বার করে দেবেন।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো করা উচিত। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—যা শত্রু পরে পরে।

কেদার। আহা আপনার সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে—কি পাণ্ডিত্য! আবার কি মিষ্ট স্বভাব! আমার এই ক'টা লেখা আছে, এগুলো আপনাকে একটু শোনাই—এমন সমজদার লোক তো আর সচরাচর জোটে না!

কেদারকৃষ্ণের পাঠ

অমানিশার গভীর তমসাজাল ভেদ করিয়া ঐ পূর্বদিকে তরুণ তপন ধীরে-ধীরে উঁকি মারছে। বিহঙ্গের কলকল্লোলে, শিশিরসিক্ত বায়ুর হিল্লোলে দিগদিগন্ত আমোদিত মুখরিত উচ্ছ্বসিত হইয়া, আহা, স্বভাবের সেই শোভা ভারি চমৎকার হয়েছে! হে নিদ্রিত মানব সকল! ঐ শুনো বাছুরগুলি ল্যাজ তুলিয়া হাম্বা-হাম্বা রবে ছুটিতেছে, তোমরা উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। আহা, কবিরা তো সত্যই বলিয়াছেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল—'

পণ্ডিত। চমৎকার হয়েছে! আমার একটু কাজ আছে—এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার। একটু দাঁড়ান, এই জায়গাটা ভারি ইণ্টারেস্টিং :

কেদারকৃষ্ণের পুনরায় পাঠ

দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, বিকাল নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই—কেবল সেই এক কথা, সেই এক চিন্তা, সেই এক কল্পনা, এক জল্পনা, এক তন্ত্র, এক মন্ত্র।—কেমন?—সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য-নবোৎসাহে—কেমন? ভাষার কেমন একটা সহজ ভঙ্গি আছে সেইটা লক্ষ্য করেছেন?—সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য নবোৎসাহে সেই একই সুর, সেই একই ছন্দ, সেই একই সঙ্গীতকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই—

পণ্ডিত। দাঁড়ান, আমার বড় তাড়াতাড়ি—ধাঁ করে এক্ষুনি আসব।

[পণ্ডিতের প্রস্থান

কেদার। হ্যাঁ, একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি—আচ্ছা, আবার ঘুরে আসুক—হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ব!

[কেদারকৃষ্ণের প্রস্থান

নেপথ্যে খেঁটুরাম ও দুলিরামের কণ্ঠস্বর

খেঁটুরাম। দেখ, চোরের দশদিন আর সাধুর একদিন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই তো সবই করবি, যা! যা!

খে'টুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ

খে'টুরাম। দেখ, মেলা চালাকি করিস নে, কিছু বলি নে বলে?

দুলিরাম। একদিন ধরে এইসা পিট্‌টি দেব—

খে'টুরাম। দেখ এ-সব আমি পছন্দ করি না কিন্তু—

দুলিরাম। দাঁড়া, আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনছি—

পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত। (দুলির প্রতি) ওহে, হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বল, ঘা দু-চার লাগিয়ে দেও না—

খে'টুরাম ও দুলিরামের লড়াই—পণ্ডিতের বাধা প্রদান

অ্যাঁ! মারামারি কচ্ছ? এক্ষুনি ঘাড় ধরে বের করে দেব।

খে'টুরাম। কি! উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, আবার কথার ভঙ্গি দেখ।

দুলিরাম। ঘাড় ধরবে? আমার গাঁয়ের লোকদুটো গেল কোথায়?

পণ্ডিত। তোমাকে বলি নি তো! তোমাকে বলি নি!

খে'টুরাম। তবে আমাকে বলেছ?

খে'টুরামের পণ্ডিতকে প্রহার

পণ্ডিত। ইকী! উঃ! ওরে রামা! রামারে! শিগগির ছুটে আয়, ওহে, উঃ! দেখ, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উঃ!

কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামকানাই। তোমরা কি আরম্ভ করেছ বল দেখি? দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

খে'টুরাম। কি আরম্ভ করেছিস বল্ দেখি?

দুলিরাম। দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

পণ্ডিত। আমাকে মারতে-মারতে একেবারে কালশিরে পড়িয়ে দিয়েছে।

কেদার। দেখ, আমার ভাগ্নে ভালোমানুষ, এ-সব সইতে পারে—কিন্তু আমার সহ্য হয় না। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

রামকানাইয়ের খে'টুরাম ও দুলিরামকে গলহস্ত

খে'টুরাম। কী ভদ্দোরলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!

দুলিরাম। চাকর দিয়ে ইন্‌সাল্ট্!

খে'টুরাম। কী! এত বড় কথা! এক্ষুনি আমি রাগ করে বাড়ি চলে যাব। তোকে অপমান করেছে—কক্ষনো এখেনে থাকিস না—আচ্ছা থাক, এবার মাপ করা গেল। আর একবার করলে টের পাইয়ে দেব। আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে খবর দিচ্ছি।

[খে'টুরাম ও দুলিরামের গম্ভীরভাবে প্রস্থান, রামকানাইয়েরও প্রস্থান

পণ্ডিত। দেখলেন তো! এর উপর তো আর ওষুধ চলে না!

কেদার। হ্যাঁ—তা আসুন—একটু কাব্যালাপ করা যাক।

পণ্ডিত। এই মাটি করেছে—আচ্ছা—আজ রাত্রে বেশ করে শোনা যাবে।

কেদার। না, রাত্রে তো সুবিধে হবে না—আমার চোখ খারাপ কিনা! শুনুন—ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স খুব কম ছিল—সাত বছর কি আট বছর হবে, কি বড় জোর নয় কি দশ কি এগারো। সেই সময় আমি একখানা বই পড়েছিলাম—আঃ, সে একখানা বইয়ের মতো বই বটে! এখনো যখন তার কথা মাঝে-মাঝে স্মৃতিপথে উদিত হয়, মন যেন একেবারে উৎসাহে আপ্লুত হয়ে যায়। শুনুন—চমৎকার বই, বোধোদয়—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—

পণ্ডিত। ও আমি পাঁচশোবার পড়েছি।

কেদার। পড়েছেন? কেমন! স্বীকার করুন, ভালো বই না? শুনুন—

কেদারকৃষ্ণের বোধোদয় পাঠ

পণ্ডিত। ঘ্যান-ঘ্যান করে মাথা ধরিয়ে দিলে—

ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রবেশ

ঘটিরাম। মাথা ধরেছে? অ্যাঁ?

কেষ্টা। আজ বুঝি আমাদের ছুটি? অ্যাঁ?

পণ্ডিত কর্তৃক উভয়কে চপেটাঘাত

পণ্ডিত। যা! এখন ত্যক্ত করিস নে—

কেষ্টা। কিরে, তোকে মারল নাকি?

ঘটিরাম। দূৎ! আমাকে মারবে কেন? তোকে তো মারল।

কেষ্টা। হ্যাঃ! নিজে মার খেয়ে এখন—

ঘটিরাম। আমি দেখলুম তোকে মারল—

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান

কেদার। হ্যাঁ, তারপর শুনুন—

পণ্ডিত। এ তো আচ্ছা বেল্লিকের হাতে পড়া গেল! ইকী মশায়! বলছি শুনব না —কেন খামখা বিরক্ত কচ্ছেন?

কেদার। আহা! এইটে শুনে নিন—আমি ছেলেবেলায় একটা পোয়েট্রি লিখেছিলাম— তখন বয়েস অল্প। কিন্তু সে হিসেবে লেখাটা কেমন দেখুন—

কেদারকৃষ্ণের কবিতা পাঠ

একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেন কালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ভয় পেয়ে সকলে তো থরহরি কম্পমান
চিৎকারিল কেহ সুকরুণ আর্তরবে
অথবা যেমতি
লট্‌খটে গোরুর গাড়ি চলিবার কালে
প্রকাশে দারিদ্র্য নিজ বিচিত্র বিলাপে—
কেহ জপে রাম নাম—আমি হয়ে ক্রুদ্ধ
ডাকিলাম ভৃত্যকে—'হরে, ধেয়ে যাও দ্রুত
রাস্তার দরজাটা করে দাও বন্ধ—
আর নিয়ে এস ঝট করে তিনতলা হতে
আমার সে দু-নলা বন্দুক'—এইরূপে
বাধানিল সবে মোর উপস্থিত বুদ্ধি
কহিল সকলে, 'আজি মরিতাম নির্ঘাত
যদি না থাকিত ব্যাঘ্র পিঞ্জরের মধ্যে—'

পণ্ডিত। হাড় জ্বালালে দেখছি—

কেদার। (স্বগত) বকে-বকে গলা শুকিয়ে গেল—এখন রামাকে লেলিয়ে দি গিয়ে—

[কেদারকৃষ্ণের প্রস্থান

খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ

পণ্ডিত। যাও, যাও এখন আমায় ঘাঁটিও না, আমার মেজাজ ভালো নেই।

খেঁটুরাম। ওরে বাসরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই!

দুলিরাম। দেখিস ঘাঁটাস-টাঁটাস নে—শেষটায় ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবি।

রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামকানাই। ওয়াক্ — থুঃ—থু—থু—থু— ওয়াক্—

খেঁটুরাম। ইকীরে? ওরকম কচ্ছিস কেন?

রামকানাই। অ্যাঃ—থু—থু—কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলেছি।

দুলিরাম। কেরোসিন তেল খেয়েছিস?

খেঁটুরাম। সিকী! কেরোসিন খেতে গেলি কেন রে?

রামকানাই। সখ করে কি আর কেউ কেরোসিন খায়? গায়ে লেখা ছিল—লেমন্ সিরাপ!

দুলিরাম। এখন একটা দেশলাইয়ের কাটি খেয়ে ফেল্—তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

রামকানাই। কি পণ্ডিতমশায়, আপনার ন্যায়-শাস্ত্রে আর কিছু বলে-টলে নি?

খেঁটুরাম। (মশা মারিতে মারিতে) আর দাদা ন্যায়শাস্ত্র-টাস্ত্র ভালো লাগে না—বলি আজ-কাল মশাটা কেমন বল দেখি?

রামকানাই। বরাবর যেমন থাকে, ছোট-ছোট কালো মতন, উড়ে বেড়ায়—

খেঁটুরাম। আহা, বলি লাগে কেমন?

রামকানাই। তা কি করে বলব? কখনো ভাজাও করি নি, চচ্চড়িও খাই নি।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ, বলি অত্যেচারটা দেখছ তো?

রামকানাই। অত্যেচার আবার কি! চুরিও করে না, ডাকাতিও করে না, পরের বাড়িতে আড্ডাও মারে না—

পণ্ডিত। ওহে দেখ, তোমাদের ও-সব ইয়ার্কি মারতে হয় বাইরে গিয়ে কর—আমার কাছে

নয়! রামা! আমার ব্যাকরণটা গেল কোথায়—

রামকানাই। ট্যাক্‌রম্‌?

পণ্ডিত। তবেরে, শব্দমিচ্ছান্তি বর্বরাঃ, আমার সঙ্গে রসিকতা?

রামকানাই। আবার রসিকতা কি কললুম?

পণ্ডিত। বলি, বইখানা কি কাগে নিল, না উড়ে গেল বাতাসে?

রামকানাই। বাতাসা?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাতাসা—বাতাসা খাওয়াচ্ছি—এইরকম করে তোরা জিনিসপত্র লোকসান করবি? ব্যাটা হতভাগা জোচ্চোর—

পণ্ডিতের রামকানাইকে প্রহার। দুলিরাম ও খেঁটুরামের পলায়ন

রামকানাই। মেরে ফেললে রে! উঃ—ইকী মশাই! দাঁড়াও আমি মামাবাবুকে ডাকছি, আর পুলিসে খবর দিচ্ছি।

পণ্ডিত। ওহে শোনো-শোনো—আমি কিন্তু সেরকম ভাবে মারি নি।

রামকানাই। মেরেছ তার আবার রকম বেরকম কি হে? পুলিস! পুলিস! উঃ!

রামার পতন। কেদারের প্রবেশ। পণ্ডিতের পলায়ন

কেদার। কিরে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় কলালি যে! ব্যাপারটা কি?

রামকানাই। আমায় মেরেছে! উঃ—আমায় মেরেছে উঃ! কান দুটো ভোঁ-ভোঁ কচ্ছে—মাথা ঘুরছে!

কেদার। মেরেছে! বাঃ! এই তো চাই। দাঁড়া এইসা চাল চালব, একেবারে বাজি মাত্‌। তুই এক কাজ কর, সেই দাড়িটা আর লাল পাগড়িটা ঠিক করে রাখ। আর ঐ উঠোন-টায় বসে বসে আর্তনাদ করতে থাক, যখন 'কোন্‌ হ্যায় রে' বলে ডাক দেব অমনি এসে হাজির হবি—একেবারে রামসিং দারোগা, বুঝলি তো? তুই খালি চেহারাটা দেখিয়ে যাবি—বোল-চাল সব আমি দেব। বাঃ আপনা থেকে দিব্যি কাজ এগিয়ে গেল, তারপর ও দুটোকে সরাতে কতক্ষণ?

[রামকানাইয়ের প্রস্থান

পণ্ডিত। রামার কি হয়েছে? বেশি কিছু হয় নি তো?

কেদার। না, না, বেশি কিছু হয় নি। খান চার-পাঁচ পাঁজর ভেঙে গেছে আর ডিজেস-চান অফ্‌ দি লান্‌গ্‌স—সাংঘাতিক! তা আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। ও ব্যাটা আবার পুলিসে খবর না দেয়! সেবারে একটা এরকম কেস হয়েছিল—পুলিসে টের পেয়ে—পাঁচ বছরের মতো চালান করে দিয়েছিল।

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! পাঁচ বছর!!

কেদার। আপনি ব্যস্ত হবেন না! উঃ—সেবারে একটা লোক মারামারি করেছিল তাকে দিয়েছিল ঘানি ঠেলতে। বলব কি মশাই, দেড় মাসে অর্ধেক রোগা!

পণ্ডিত। অ্যাঁ—অ্যাঁ একেবারে অর্ধেক! অ্যাঁ!

কেদার। তা আপনি বেশি ভাববেন না - ঐ পুলিস ব্যাটারা কোনরকমে টের না পেলেই হল—কিন্তু আজকাল যেরকম গোয়েন্দা টিকটিকির আমদানি হয়েছে—কোন কথা লুকোবার জো নেই--আপনি কবার হাই তুললেন, তুড়ি দিলেন--সব খাতায় লেখা! সেবার এক ব্যাটা বামুন মারামারি করে লুকিয়েছিল। লুকোলে হবে কি! পুলিসে টের পেয়ে ধরে এনে পঁচিশ দফা জুতো!

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! বামুন? জুতো!!

কেদার। বাইরে কে? কোন্‌ হ্যায় রে? তা আপনি বেশি ব্যস্ত হবেন না! আমি থাকতে ভয় কি? কিরকম ভাবে মেরে-ছিলেন বলুন তো?

পণ্ডিত। খুব আস্তে পিঠের এইখেনে—

কেদার। পিঠে! এইখেনে! সর্বনাশ! ৭৯৪ ধারা! এর উপর তো আমার হাত নেই—তা আপনি বেশি চিন্তিত হবেন না। আমি

দারোগাবাবুকে বলে-কয়ে আপনার মেয়াদ কমিয়ে দেব।

খেঁটুরাম ও দুলিরামের শশব্যস্তে প্রবেশ

খেঁটুরাম। এক ব্যাটা পুলিস ইদিকে আসছে!

দুলিরাম। আমায় দেখে রুল উঁচিয়ে আসছিল। আপনার বাক্সের মধ্যে একটা সোনার চেন ছিল—আমি কিন্তু সেটা চুরি করি নি!

খেঁটুরাম। চুরি হবে কোত্থেকে—যেখানে যা থাকে আমরা সব যত্ন করে তুলে রাখি।

খেঁটুরাম ট্যাঁক দেখাইল। পুলিসের বেশে রামকানাইয়ের প্রবেশ

খেঁটুরাম। এইরে! এইরে!

দুলিরাম। এই যে সিদিন নিতাইবাবুর একটা ঘড়ি চুরি হয়েছিল আমি কিন্তু তার কিছুই জানি না!

খেঁটুরাম। আর, সেদিন যে চৌরাস্তার মোড়ে একটা লোক বেদম ঠেঙা খেয়েছিল —আমি কিন্তু তার গায়ে হাতও দিই নি।

দুলিরাম। আমার পুঁটলির মধ্যে সোনার চেন, নক্সা কাটা রুপোর ঘড়ি, দুটো আংটি এ-সব কিচ্ছু নেই।

পণ্ডিত। হাম্ পুজোর সময় তোম্‌কো বহুত মিষ্টান্ন আউর পুলিপিঠে খাওয়ায়গা।

কেদার। দারোগাবাবু আতা হ্যায়?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। হাত কাড়া লেকার?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। বাড়ি সারচ্ হোগা?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। সব মাটি করলে—আচ্ছা, আমি ও ব্যাটাকে একটু ফাঁক তালে তালায় সরিয়ে নিচ্ছি, আপনি এই সুযোগে সরে পড়ুন আর এ-মুখো হবেন না—বছর দুই বাড়ি থেকে বেরোবেন না! তোমরা পালিও না কিন্তু। (পুলিসের প্রতি) আচ্ছা চল—

[কেদারকৃষ্ণ ও পুলিসের প্রস্থান

পণ্ডিত। আর থামাথামি নেই—একেবারে সেই বদ্যি পাড়ায় মামার বাড়ি গিয়ে উঠব—ওরে ঘটে, ওরে কেষ্টা, দৌড়ে আয়—ও ঘর থেকে আমার বিছানাটা আর শব্দকল্পদ্রুম-খানা নিয়ে আয় তো। শিগ্‌গির বাড়ি চল।

[পণ্ডিতের প্রস্থান

দুলিরাম। আর কেন দাদা? পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে সরে পড়া যাক-না!

খেঁটুরাম। হ্যাঁ—পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি দাদা?

দুলিরাম। জমিদার ব্যাটার কাণ্ডটা দেখ—আমাদের কি নাস্তানাবুদটাই করলে—চাকর দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা তার উপরে পুলিস!

খেঁটুরাম। আমরা বেচারারা যে দুটি করে খাচ্ছিলাম, সে আর তার সহ্য হল না।

দুলিরাম। ছোটলোক! ছোটলোক! ওরে, গল্প আক্কেলগুড়ুমটা উঠিয়ে নে! যথা লাভ!

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রস্থান

কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ

কেদার। দেখলি তো রামা! একেই বলে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—মানুষ চেনা চাই! ঠিক লক্ষণ দেখে ওষুধ দিতে হয়-

রামকানাই। আজ্ঞে—ঝড়ে কাগ মরে আর ফকিরের কেরামত বাড়ে—

[উভয়ের প্রস্থান

সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ির প্রবেশ ও গান

ওরে ও চণ্ডীচরণ!
তোমার কি নাইরে মরণ।
কোন্ সাহসে চাকর ডেকে
ভদ্রলোকের কান মলাও।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

পাত্রগণ

রাম, জাম্বুবান, সভাসদগণ, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, দূত, সুগ্রীব হনুমান, বানরগণ, রাবণ, যমদূতদ্বয়, যম

প্রথম দৃশ্য

রামের শিবির

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে-চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যিই-সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে। হয় না, হবে না--হতে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, যা, ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়। হনুমান এসে বললে কি, ফেলবারও দরকার হল না সে এক্কেবারে মরে গেছে।

সকলে। বাঃ বাঃ!—একদম মরে গেছে—ব্যাস। আর চাই কি, খুব ফুর্তি কর!

বাইরে গোলমাল

ঐ দেখ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে--

সকলে। সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরে নি ব্যাটার জান তো খুব কড়া!

জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো সব মাটি কললে - তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত -না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছে--'এক্কেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে-

দূতের প্রবেশ

সকলে। কি হে, খবর কি?

দূত। আজ্ঞে, আমি এইমাত্র আসছি –

লক্ষ্মণ। ব্যস! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি!

জাম্বুবান। এইমাত্র আসছ? তোপ ফেলতে হবে?

রাম। আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুছিয়ে বল।

দূত। আজ্ঞে, আমি ছান-টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি--- অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা

সকলে। বাজে বকিস নে কাজের কথা বল্।

দূত। হ্যাঁ হ্যাঁ খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দুতিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাক ঢোল বাজছে ধ্যা র‍্যা ব্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা ধ্যারা -

সকলে। মার ব্যাটাকে মার ব্যাটার কান কেটে দে!

জাম্বুবান। ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল!

সুগ্রীব। ব্যাটা, তুই ভালো করে ধারাবাহিক-রূপে আদ্যোপান্ত পর্যায় পরম্পরা সব বলবি কি না?

রাম। তারপরে কি হল শুনি ততঃ কিম্?

দূত। (গান) আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। শঙ্খ হুলাহুলি শানাই নিঃস্বন
করতাল ঝঙ্কার অস্ত্রের ঝনন।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। লাখো লাখো সৈন্য চলে সাথে সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে পশ্চাতে!

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। বীর দর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরা-তল।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে।

সকলে। ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

দূত। আজি দুর্দিনেতে নাহি কারো রক্ষা।
দলে বলে সবে পাবে আজি অক্কা।

জাম্বুবান। চোপরাও বেয়াদব! মুখ সামলে কথা বলিস।

রাম। তুমি রাবণকে দেখেছ, এখান থেকে কত দূরে?

দূত। আজ্ঞে, এখেন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাঁচ ঘণ্টা, না পঁচিশ ঘণ্টা!

দূত। আজ্ঞে একটু দ্রুত হাঁটলে পোয়া ঘণ্টায় হতে পারে।

জাম্বুবান। তুমি কি করে আসছিলে? হামাগুড়ি দিয়ে?

রাম। কোন্‌দিকে আসছিল, বল তো?

দূত। আজ্ঞে, তা তো জিগগেস করি নি!

সকলে। ব্যাটা! তুমি আছ কোন্ কর্মে?

রাম। তাড়াতাড়ি আসছিল, না আস্তে আস্তে?

দূত। আজ্ঞে, তাড়াতাড়ি—আজ্ঞে আস্তে। আজ্ঞে সেটা ঠিক ঠাওর করে দেখি নি।

সকলে। এটা কোথাকার অপদার্থ রে? দে, ওটাকে তাড়িয়ে দে।

বিভীষণ। (জাম্বুবানের প্রতি) মন্ত্রীমশাই! একটা কথা শুনুন! কানে-কানে বলব—

জাম্বুবান। উঃ-দূর্! বনমানুষ কোথাকার! তোর দাড়িতে ভারি গন্ধ! শুনব না—

দূত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ

বিভীষণ। বেটা হাসছিস কেন রে বেয়াদব?

বিভীষণের দূতকে প্রহার ও অর্ধচন্দ্র

সুগ্রীব। ওরে, কে কোথায় আছিস? আমার গদাটা নিয়ে আয় তো।

সকলে। কেন? গদা কেন?

সুগ্রীব। রাবণকে ঠ্যাঙাব!

হনুমানের প্রবেশ

হনুমান। রাবণ বোধ হয় আসছে!

সকলে। যা—যা, ব্যাটা এতক্ষণে এক বাসি সংবাদ নিয়ে এসেছে!

সুগ্রীব। চল হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে—

[সকলের উত্থান ও প্রস্থান

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

সুগ্রীবের প্রবেশ

সুগ্রীব। (ভয়ে ভয়ে) কেউ নেই তো?

সুগ্রীবের পদচারণা। বিভীষণের প্রবেশ

বিভীষণ। দেখ, হাঁটছে দেখ—বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা!—দূর্! যুদ্ধ করতে এসেছিস, ওমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!—এমনি করে হাঁট।

বিভীষণের হাঁটার নমুনা প্রদর্শন

সুগ্রীব। রেখে দাও তোমার ভড়ং! আমাদের দেশে ওরকম হাড়্গিলের মতো করে হাঁটে না!

বিভীষণ। তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ তো!

সুগ্রীব। মানুষ বললে কেন হে? খামখা গাল দিচ্ছ কেন?

নেপথ্যে জাম্বুবানের কণ্ঠস্বর

জাম্বুবান। ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে।

বিভীষণ ও সুগ্রীব। অ্যাঁ—কি!

গান

যদি রাবণের ঘুষি লাগে গায়—
তবে তুই মরে যাবি—তবে তুই ম-রে যা-বি—
ওরে, পালিয়ে যারে পালিয়ে যা
তা না হলে মরে যাবি—
লগুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।

বিভীষণ। ওরে আমার মনে পড়েছে—একটা বড্ড জরুরি কাজ বাকি আছে—সেটা চট করে সেরে আসছি।

[বিভীষণের প্রস্থান

সুগ্রীব। এইবার বোধ হয় রাবণ আসবে—আজ একটা কিছু হয়ে যাবে—ইসপার নয় উসপার—

রাবণের প্রবেশ

গান

সুগ্রীব। তবে রে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারব ঝ্যাঁটা
তোরে এখন রাখবে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল্।
(তোর) মুখের দুপাটি দন্ত
ভাঙিয়া করিব অন্ত
তোর এখনি হবে প্রাণান্ত
আয় রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্॥

রাবণ। ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব।
যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব॥
ব্যাটা গুলিখোর বুদ্ধি নেই তোর নেহাত তুই চ্যাংড়া।
আয় তবে আয় যষ্টির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া॥

সুগ্রীব। রেখে দে তোর গলাবাজি
ওরে ব্যাটা ছুঁচো পাজি
অন্তিম সময় আজি
ইষ্টদেবে কর রে নমস্কার।
তুই রে পাষণ্ড ঘোর
পাল্লায় পড়িলি মোর
উদ্ধার না দেখি তোর
মোর হাতে না পাবি নিস্তার॥

রাবণ। ওরে বেয়াদব কহিলে যে-সব
ক্ষমা যোগ্য নহে কখন
তার প্রতিশোধ পাবি রে নির্বোধ
পাঠাব শমন সদন॥

রাবণের সুগ্রীবকে প্রহার

সুগ্রীব। ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বুঝি মাথা ফাটি
নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে!
কাজ নেই রে খোঁচা খুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে?

[সুগ্রীবের পলায়ন

রাবণ। ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্! শেম্!

লক্ষ্মণের প্রবেশ ও রাবণের গান

রাবণ। আমার সহিতে লড়াই করিতে
আগ্রহ দেখি যে নিতান্ত—
বুঝেছি এবার ওরে দুরাচার
ডেকেছে তোরে কৃতান্ত।

আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি?
কোথায় লাগে-বা কুরো পাটকিন্
কোথায় রোজেন্দ্ ভোনিস্ক?
এই যে অস্ত্র দেখিছ পষ্ট
শোভিছে আমার হস্তে
ইহারই প্রভাবে যমালয়ে যাবে
বানর কুল সমস্তে।
অযোধ্যার লোকে যোদ্ধা হয়েছে
শুনে মরি আমি হাসিয়া
(আজি) দেখাব শক্তি রাখিব কীর্তি
দলে বলে সবে নাশিয়া॥

লক্ষ্মণের লাঠি চালনা

লক্ষ্মণ। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ--হর হর হর হর--মার, মার, মার, মার, মার—কাট কাট কাট কাট কাট কাট—

লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত

লক্ষ্মণ। হা হতোস্মি!

লক্ষ্মণের পতন ও মূর্ছা। রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন। হনুমানের প্রবেশ

হনুমান। অ্যাঁ! কি হচ্ছে—দেখে ফেলেছি!
[রাবণের পলায়ন

বানরগণের প্রবেশ ও গান

বানরগণ। অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো—
যষ্টির বাড়ি সুগ্রীবে মারি
কল্লে যে তার মাথা গুঁড়ো,
অবাক করলে রাবণ বুড়ো॥
(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরি চাচা খুড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥
(আরে) গদা ঘুরাইয়া দিল উড়াইয়া
লক্ষ্মণেরি ধড়া চুড়ো—
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥
(ওরে) লক্ষ্মণে মেরে বানর দলেবে
কল্লে ব্যাটা তাড়াহুড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥
(ব্যাটা) বুদ্ধি বিপুলে যুদ্ধে নিপুণ
কিন্তু ব্যাটা বেজায় ভুঁড়ো,
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥

[লক্ষ্মণকে লইয়া বানরগণের প্রস্থান

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য দ্বিতীয়ো সর্গঃ]

তৃতীয় দৃশ্য

রামচন্দ্রের শিবির

রাম, বিভীষণ ও জাম্বুবান

রাম। কিছু আগে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল—বোধ হয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে।

বিভীষণ। তা হবে!

খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে ব্যাণ্ডেজবন্ধ সুগ্রীবের সকাতর প্রবেশ

বিভীষণ। আরে ও পালোয়ানজি, একি হল—ষাট ষাট ষাট।

সকলের উচ্চহাস্য

রাম। কি হে সুগ্রীব, তোমার যে দেখছি বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হল।

বিভীষণ। আজ্ঞে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো—

রাম। যত তেজ বুঝি তোমার মুখেই।

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ, মুখেন মারিতং জগৎ—

রাম। আমি বলি কি তুমি মস্ত যোদ্ধা।

জাম্বুবান। যোদ্ধা বলে যোদ্ধা--ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচা মারেঙ্গা।

বিভীষণ। আমি বরাবরই বলে আসছি—

সুগ্রীব। দ্যাখ! তোর ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না—

রাম। রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি?—
পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে রুষি
সম্বরে খাদ্যোত লীলা—

জাম্বুবান। আজ্ঞে ঠিক কথা
রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে—তখনি তো মাথা তুলি
চ্যাং পুঁটি যত করে মহা আস্ফালন।

বাহিরে গোলমাল

রাম। এত গোলমাল কিসের হে?
সুগ্রীব। রাবণ ইদিকে আসছে না তো?
জাম্বুবান ও বিভীষণ। অ্যাঁ—রাবণ আসছে —অ্যাঁ?
বিভীষণ। আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা?
জাম্বুবান। হ্যাঁরে তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি?

জাম্বুবানের বিভীষণের কাঁধে চাপিবার চেষ্টা ও দূতের প্রবেশ

দূত। শ্রীমান লক্ষ্মণ আসছেন।

সকলে আশ্বস্ত

রাম। এত হল্লা করে আসছে কেন? চেঁচাতে বারণ কর।
দূত। আজ্ঞে, তিনি আসছেন ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ, একরকম আসছেনই বটে—মানে তাঁকে নিয়ে আসছে।
জাম্বুবান। লোকটার কান মলে তাড়িয়ে দাও তো—ব্যাটা হেঁয়ালি পাকাবার আর জায়গা পায় নি!

লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ ও গান

বললেন যাহা জাম্বুবান (সাবাস গণৎকার হে)
আনুপূর্বিক ঘটল তাহা শুনতে চমৎকার হে।
পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে—
খাবি খেতে লাগলেন যেন ড্যাঙায় বোয়াল মাছ রে!
অনেক কষ্টে রইল্ল বেঁচে—(আহা) কপাল জোরে মৈল না—
(ওরে) স্বর্গ হৈতে কিছু তবু পুষ্পবৃষ্টি হৈল না!
ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো—
তা নৈলে তো ঘটত আজি হিতে বিপরীত গো!!
রাম। হায়, হায়, হায়, হায়—হায় কি হল, হায় কি হল, হায় কি হল, হায় হায় হায়—

রামের মূর্ছা

বানরগণ। হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায় কি হল-হল-হল-হল, হায় কি হল-হল-হল-হল-হল (ইত্যাদি)।

বানরগণের মাঝেমাঝে কলাভক্ষণ

জাম্বুবান। এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিল নাকি?
সুগ্রীব। হনুমান ব্যাটা কি কচ্ছিল?
হনুমান। আমি বাতাসা খাচ্ছিলুম।
সুগ্রীব। ব্যাটা, তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাও নি?

সুগ্রীবের গান

শোন রে ওরে হনুমান
হও রে ব্যাটা সাবধান
আগে হতে স্পষ্ট ব'লে রাখি।
তুই ব্যাটা জানোয়ার
নিষ্কর্মার অবতার
কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি॥
কাজ কর্ম ছেড়ে ছুড়ে
ঘুমোস খালি প'ড়ে প'ড়ে
অকাতরে নাকে দিয়ে তৈল—
শোন রে আদেশ মোর
এই দণ্ডে আজি তোর
অষ্ট আনা জরিমানা হৈল।
হনুমান। (স্বগত) মোটে আট আনা?
বিভীষণ। তারপর, তোমাদের মতলব কি স্থির হল?
সুগ্রীব। এইবার সবাই মিলে রাবণ ব্যাটাকে

কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

সকলে। হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক কথা! ঠিক কথা!

জাম্বুবানের নিদ্রা। সকলের গান

রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো
(তার) মাথায় ঢেলে ঘোল (তারে) উল্টো গাধায় তোল
(তার) কানের কাছে পিটতে থাকো চোদ্দ হাজার ঢোল॥
কাজ কি ব্যাটার বেঁচে (তার) চুল দাড়ি গোঁফ চেঁচে
নস্যি ঢোকাও নাকে, ব্যাটা মরুক হেঁচে হেঁচে।
(তার) গালে দাও চুন কালি (তারে) চিমটি কাটো খালি
(তার) চৌদ্দপুরুষ উড়িয়ে দাও পেড়ে গালাগালি।
(তারে) নাকাল কর আরো যে যেরকম পারো
রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো॥

রামচন্দ্রের মূর্ছাভঙ্গ ও গাত্রোত্থান

বিভীষণ। এই যে, শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোৎপাটন করেছেন!

রাম। তারপরে—ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা করলে?

সকলে। ঐ যা! ওষুধপত্রের তো কিছু ব্যবস্থা হল না?

রাম। মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা?

বিভীষণ। মন্ত্রীমশাই—একটু ঘুমোচ্ছেন।

সুগ্রীব। বাস! তবেই কেল্লা ফতে করেছেন আর কি!

সকলে। মন্ত্রীমশাই! আরে ও মন্ত্রীমশাই, আহা একবার উঠুন না!

সকলে মিলিয়া জাম্বুবানকে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি

বিভীষণ। বাবা! এ যে কুম্ভকর্ণের এক কাঠি বাড়া!

জাম্বুবান। (সহসা জাগিয়া) হ্যাঁরে, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, ব্যাটা বেল্লিক, বেরসিক, বেআক্কেল, বেয়াদব—হাঁড়িমুখো ভূত!

সকলে। রাগ করবেন না—আহা রাগ করবেন না! কথাটা শুনুন।

সকলের গান

আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না?
সংকটকালে চটপট কেন যুক্তির কথা বলছে না?
সর্ব কর্মে অষ্টরম্ভা হুর্দম পড়ে নাক ডাকছে—
উল্টে কিছু বলতে গেলে বিটকেল বিটকেল গাল পাড়ছে।
মরছে লক্ষ্মণ জানছে তবু দেখছে চেয়ে নিশ্চিন্তে
এম্নি স্বভাব ছিল না তার থাকতাম যখন কিষ্কিন্ধে!
হাঙ্গাম দেখে হটলে পরে নিন্দুক লোকে বলবে কি?
ভেবেই দেখ এম্নি করলে রাজ্যের কার্য চলবে কি?
মুখ্যু মোরা আক্কেল-শূন্য একেবারেই বুদ্ধি নেই—
সূক্ষ্মযুক্তি বলতে কারো ঠাকুর্দাদার সাধ্যি নেই।
বলছি মোরা কিচ্ছু নেইকো চটবার কথা এর মধ্যে
উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাং পদ্মে॥

হনুমান। (স্বগত) হ্যাঁরে, আমার লেজে পাড়িয়ে দিলি?

রাম। বুঝলে হে জাম্বুবান, তুমি কিনা হচ্ছ প্রবীণ লোক—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার খুব অভিজ্ঞতা আছে—

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে কথা আগে বললেই হত—তা না ব্যাটারা খালি ধাক্কাই মারছে—'মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রীমশাই'

—আমি বলি বুঝি ডাকাত পড়ল নাকি?

রাম। হ্যাঁ, এইবার একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে ফেল।

জাম্বুবান। (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে যা প্রেশক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধ-গুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান। আচ্ছা, কাল ভোর না হতে উঠে নিয়ে আসব।

জাম্বুবান। না, না, এত দেরি করতে হবে না—এখুনি যা।

হনুমান। আবার এত রাত্তিরে কোথায় যাব? সাপে কাটবে না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব। ব্যাটা, সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

জাম্বুবান। না, ওষুধগুলো এখনি দরকার।

হনুমান। আঃ! হোমিওপ্যাথি লাগাও না।

জাম্বুবান। যা বলছি শোন্। এই যা গাছের কথা লিখলাম—বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী —এই-সব গাছের শেকড় আনতে হবে।

হনুমান। আমি ডাক্তারখানা চিনি নে।

জাম্বুবান। আ মরণ আর কি! এ কি কল-কাতার শহর পেয়েছিস নাকি যে বাথগেট কোম্পানি তোর জন্যে দোকান খুলে বসবে? কৈলাস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন পাহাড় আছে জানিস তো?

হনুমান। কৈলেস ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান। ব্যস! কানের পটহটা দেখি ভারি সরেস—ব্যাটা কৈলেস পাহাড় জানিস নে?

হনুমান। ও বাবা! সেই কৈলেস পাহাড়! এত রাত্তিরে আমি অত দূর যেতে পারব না।

জাম্বুবান। যাবি নে কি রে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল করে দেব। এখুনি যা—দেখিস পথে মেলা দেরি করিস নে।

হনুমান। আমার কান কটকট কচ্ছে—

রাম। আহা, যা রে যা, আর গোল করিস নে —নে বকশিশ নে।

[হনুমানকে রামচন্দ্রের কলা প্রদান

হনুমান। যো হুকুম।

[কুর্নিশ করিতে-করিতে হনুমানের প্রস্থান

জাম্বুবান। তারপর রাত্তিরের জন্য সেনাপতি নির্বাচন কর।

রাম। কেন? রাত্তিরে যুদ্ধ করবে নাকি?

জাম্বুবান। তা কেন? একজনকে একটু খবরদারি করতে হবে তো! তা ছাড়া, হয়তো লক্ষ্মণকে নিয়ে যমদূতদের সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে।

সকলে। তা তো বটেই! মন্ত্রীমশাই না হলে এমন বুদ্ধি কার হয়।

সুগ্রীব। (স্বগত) হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইবার ভায়া বিভীষণকে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে ফেলতে হচ্ছে—

সুগ্রীবের গান

আমার বচন শুন বিভীষণ
করহ গ্রহণ সেনাপতি পদ
(আহা) সাজ সজ্জা কর, দিব্য অস্ত্র ধর
সমরে সম্বর এ মহা বিপদ
(তুমি) বিপদে নির্ভীক শৌর্যে অলৌকিক
তোমার অধিক কেবা আছে
আর
(আহা) জলেতে পাষাণ যায় গো ভাসান
মুশকিলে আসান প্রসাদে
তোমার—

সকলে। ঠিক কথা—উত্তম কথা।

বিভীষণ। তাই তো। মুশকিলে ফেললে দেখছি।

সুগ্রীব। শুন সর্বজনে আজিকে এক্ষণে
বীর বিভীষণে কর সেনাপতি
(আহা) শ্রীরামের তরে সম্মুখ সমরে
যদি যায় মরে কিবা তাহে
ক্ষতি?

সকলে। তা তো বটেই—কিচ্ছু ক্ষতি নেই।

জাম্বুবান। বেশ তো! তাহলে তাই ঠিক হল—খবরদার। দেখ, ভালো করে পাহারা দিও। কোন ব্যাটাকে পথ ছাড়বে না—স্বয়ং যম এলেও নয়।—আর দেখো যেন ঘুমিও না।

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বিভীষণ। ইকী গেরো! ভালো, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি!

বিভীষণের গান

বিধি মোর ভালে হায় কি লিখিল
আজ রাত্রে একি বিপদ ঘটিল।
দুর্মতি সুগ্রীব চির শত্রু মোর
ফেলিল আমারে সঙ্কটেতে ঘোর।
জাম্বুবান ব্যাটা কুবুদ্ধির ঢেঁকি
তার চক্রে পড়ি নিস্তার না দেখি।
আসে যদি কেহ রাত্রি-দ্বিপ্রহরে—
ঠেকাব কেমনে একাকী তাহারে?
স্বর্গ হতে কহ দেবগণ সবে
আজি এ সঙ্কটে কি উপায় হবে?
যম হস্তে আজি না দেখি নিস্তার
সুযুক্তি তাহার কহ সবিস্তার
শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর—
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন সর্বজনে মোর মৃত্যু হলে
শোকসভা করো তোমরা সকলে।

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য তৃতীয়ো সর্গঃ]

চতুর্থ দৃশ্য

শিবির প্রাঙ্গণ

বিভীষণের পাহারাদারি, মধ্যে মধ্যে আয়নায় মুখাবলোকন ইত্যাদি

বিভীষণ। জাম্বুবান বলছিলেন, দেখ যেন ঘুমিও না—বাপ্‌ এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাঁকে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি!

বিভীষণের পদচারণা ও উঁকি-ঝুঁকি

তবে এ-পর্যন্ত যখন কোন দুর্ঘটনা হয় নি—তাতে আমার কিছু-কিছু ভরসা হচ্ছে —চাই কি, হয়তো বিনা গোলযোগে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে।...যাক! একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের তো ইদিকে আসবার কোনই গতিক দেখছি না—আর, আসলেই-বা কি? তাকে বাধা দেওয়াটা তো আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না!

বিভীষণের উপবেশন ও অচিরাৎ নিদ্রা। জাম্বুবানের প্রবেশ

জাম্বুবান। দেখেছ, আধ ঘণ্টা না যেতেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ্!

বিভীষণ। (লাফাইয়া উঠিয়া) কেরে! ও—জাম্বুবান যে—তুই বুঝি মনে করেছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোই নি।

জাম্বুবান। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমায় আর সমঝাতে হবে না। দিব্যি পড়ে নাক ডাকছে—আবার বলে, সত্যি করে ঘুমোই নি।

বিভীষণ। তুই টের পাস নি?—আমি মিট-মিট করে চেয়ে দেখছিলাম।

জাম্বুবান। না-না—মিটমিট করে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে।

[জাম্বুবানের প্রস্থান

বিভীষণ। ব্যাটা তো ভারি জোচ্চোর! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

বিভীষণের পুনরুপবেশন ও পুনর্নিদ্রা। যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ

প্রথম দূত। হ্যাঁরে, বাড়িটা ঠিক চিনে এসেছিস তো?

দ্বিতীয় দূত। আরে, হ্যাঁরে হ্যাঁ, এতদিন কাজ করেছি, একটা বাড়ি চিনতে পারব না?

প্রথম দূত। তোকে কি বাতলিয়ে দিয়েছিল বল্‌ তো?

দ্বিতীয় দূত। আমাকে বলে দিয়েছে যে, সেই ডানদিকের উঠোনওয়ালা বাড়িটায় যাবি।

প্রথম দূত। ডানদিক তো এই—আর উঠোনকে উঠোন মিলে গেছে, তবে তো ঠিকই এসেচি—

দ্বিতীয় দূত। হ্যাঁ, চল—মড়াটা খুঁজে দেখি!

অন্বেষণ করিতে করিতে দূতদ্বয়ের
বিভীষণোপরি পতন

বিভীষণ। কেরে! কেরে!

দূতদ্বয়ের লাফাইয়া তিন হাত দূরে গমন

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। এটা কি আছে রে! এটা কি আছে রে!

দ্বিতীয় দূত। ও বাপ্পো—এ মানুষ আছে নাকি?

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ও বাপ্পো—মানুষ? জীয়ন্ত মানুষ?

দূতদ্বয় ভয়ে কম্পিত

দ্বিতীয় দূত। কই রে কিচ্ছু তো বলছে না!

প্রথম দূত। তাহলে বোধ হয় কিচ্ছু বলবে না।

দ্বিতীয় দূত। হ্যাঁ, বেশ অমায়িক চেহারা! ওকে জিগগেস কর তো?

প্রথম দূত। তুই জিগগেস কর।

দ্বিতীয় দূত। তুই জিগগেস কর না! আমি তোকে ধরে থাকব—

প্রথম দূত। মশাই গো—মশাই—শুনুন মশাই—একটু পথ ছেড়ে দেবেন মশাই—

দ্বিতীয় দূত। আমরা মশাই—গরীব বেচারা মশাই—

বিভীষণ। (স্বগত) এ তো মজা মন্দ নয়! এরা দেখছি আমার ভয়ে থরহরি কম্পমান।

প্রথম দূত। চল একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাই!

দূতদ্বয়ের পাশ কাটিয়া যাইবার উদ্যোগ

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ওরে নারে, চোখ রাঙাচ্ছে।

দূতদ্বয়ের গান

দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো
তোমার প্রাণে একটুও কি দয়ামায়া নাই গো?
তোমার তুল্য খাঁটি বন্ধু আর কাহারে পাই গো?
তুমি ভরসা নাহি দিলে অন্য কোথা যাই গো!
এ সময়ে তোমা ভিন্ন কে আছে সহায় গো—
কার্যোদ্ধার না হলে তো না দেখি উপায় গো।
পথ ছেড়ে দাও মুক্ত কণ্ঠে তোমার গুণ গাই গো
দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো॥

বিভীষণ। ভাগ ব্যাটারা, নইলে একেবারে প্রহারেন ধনঞ্জয় করে দেব।

উভয় দূতের পলায়ন ও পুনঃপ্রবেশ

প্রথম দূত। হ্যাঁরে, পালাচ্ছিস কোথা? খালি হাতে গেলে যমরাজা কাউকে আস্ত রাখবেন না!

দ্বিতীয় দূত। তাই তো! তাই তো! এ তো ভারি মুশকিল হল—কি করা যায় বল্ দেখি?

প্রথম দূত। আয় না, আমরা ও ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে।

দূতদ্বয়ের গান

দ্বিতীয় দূত। যখন পরাজয় খলু অনিবার্য
তখন যুদ্ধ কি বুদ্ধির কার্য?

প্রথম দূত। তবে তো মুশকিল উপায় কি হবে?
সাধ করে কেবল প্রাণটা হারাবে?

দ্বিতীয় দূত। আমিও তাই বলি লড়ায়ে কাজ নাই—
কাজেতে ইস্তফা এখনি দাও ভাই!

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। হায় কি ঘটিল হায় কি ঘটিল
এমন সাধের চাকুরি ঘুচিল!

বিভীষণ। ব্যাটারা রাত দুপুরে গান জুড়েছিস—চাবকিয়ে রোগা করে দেব।

দূতদ্বয় প্রস্থানোদ্যত ও দ্বারদেশে যমসহ সাক্ষাৎ

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। দোহাই মহারাজ, দোহাই যমরাজা, আমাদের কিছু দোষ নেই—ঐ এক ব্যাটা আমাদের পথ ছাড়ছে না।

যমের প্রবেশ

বিভীষণ। এই মাটি করেছে—এখন উপায়? আটকাতে গেলে যম মারবে, না আটকালে রাম মারবে। উভয় সংকট! যা থাকে কপালে, ব্যাটাকে পথ ছাড়ব না। (সদর্পে) তবে রে ব্যাটা—আমায় চিনিস নে? আমি থাকতে তুই ঢুকবি?

যমের অগ্রসর হওয়া

দ্বিতীয় দূত। ওরে এবার লড়াই বাধবে—

প্রথম দূত। হ্যাঁরে ভারি মজা দেখা যাবে—

দ্বিতীয় দূত। (বিভীষণের প্রতি) পালা, পালা—এই বেলা পালা—

প্রথম দূত। হ্যাঁ, ঐ যে অস্তর দেখছ ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্ট প্রাপ্তি হবে।

বিভীষণ। তুই কে রে ব্যাটা মরতে এসেছিস?

যমের আবৃত্তি

কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি—
সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি॥
সর্বকালে সমভাব সকলের প্রতি,
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি॥
অন্তিমেতে দেখা দেই কৃতান্তের বেশে—
মোর সাথে পরিচয় জীবনের শেষে॥
সংসারের মহাযাত্রা ফুরায় যেমন—
শ্রান্তজনে শান্তি দেই আমিই শমন॥

পাহাড় লইয়া হনুমানের প্রবেশ

হনুমান। জয় রামের জয়!

যমের মাথায় হনুমানের পাহাড় স্থাপন। যমের পতন

প্রথম দূত। ও কি রে!

দ্বিতীয় দূত। ঐ যা! চাপা পড়ে গেল!

প্রথম দূত। তাই তো রে, চাপা পড়ল যে!

দ্বিতীয় দূত। (সকাতরে) হ্যাঁরে আমার মাইনে কে দেবে?

প্রথম দূত। তাই তো। আমারও যে পাওনা আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ওগো, আমাদের কি হলো গো—ওগো, আমরা যে ধনে-প্রাণে মলুম গো—(হনুমানের প্রতি) পালোয়ান মশাই গো—সর্বনাশ কললেন গো—হায়, আমাদের কি হল গো—

দূতদ্বয়ের গান

প্রথম দূত। ওরে যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি

দ্বিতীয় দূত। মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি

প্রথম দূত। আহা দেখ না ব্যাটা হল নাকি?

দ্বিতীয় দূত। ওর চুল ধরে দে না ঝাঁকি।

প্রথম দূত। এই বিপদকালে কারে ডাকি
হায় হায় যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি।—অ্যাঁক্

হনুমান কর্তৃক দূতদ্বয়ের গলা পাকড়ানো

হনুমান। ভাগ! ভাগ!—ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেধেছে।

[দূতদ্বয়ের প্রস্থান

বিভীষণ। এবার সকলকে ডেকে নিয়ে আয়—

[হনুমানের প্রস্থান

লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া হনুমানের সহিত সকলের প্রবেশ

সকলে। ওটা কিরে? ওটা কিরে?

হনুমান। আজ্ঞে, উপরেরটা গন্ধমাদন পাহাড়।

জাম্বুবান। ব্যাটা গোমুখ্যু কোথাকার, পাহাড়সুদ্ধ নিয়ে এসেছিস?

হনুমান। আজ্ঞে, গাছ চিনি নে। আর ঐ নীচেরটা—যমরাজা।

সকলে। আরে, আরে করেছিস কিরে ব্যাটা? করেছিস কি?

জাম্ববান। থাক, ওমনি থাক। আগে লক্ষ্মণের একটা কিছু গতিক করে নিই, তারপর দেখা যাবে—

ঔষধান্বেষণ—ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ

সকলে। বা, বা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি সাফাই ওষুধ রে!

হনুমান। হাজার হোক—স্বদেশী ওষুধ তো!

সকলে। তাই বল। স্বদেশী না হলে কি এমন হয়।

জাম্ববান। হ্যাঁ, এইবার যমকে ছেড়ে দাও।

পাহাড় সরাইয়া হনুমানের যমকে মুক্তিদান

যম। (চোখ রগড়াইয়া লক্ষ্মণের প্রতি) সেকি! আপনি তবে বেঁচে আছেন?

লক্ষ্মণ। তা না তো কি? তুমি জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে থেকে?

যম। আজ্ঞে, চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি—

[যমের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। হনুমান ব্যাটা বুঝি ওকে চাপা দিয়েছিল—ব্যাটার বুদ্ধি দেখ।

হনুমান। তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক—ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি তো।

বিভীষণ। আমি পাহারা না দিলে ওষুধ কি হত রে—ওষুধ আনতে-আনতে যমের বাড়ি পর্যন্ত পোঁছে যেত। আমারই তো বাহাদুরি।

সুগ্রীব। অর্থাৎ কিনা আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে তো বিভীষণ পাহারা দিল—আর বিভীষণ পাহারা দিল বলেই তো যমদূতগুলো আটকা পড়ল।

জাম্ববান। আরে ব্যাটা ওষুধের ব্যবস্থা করল কে? তোদের বুদ্ধি সে সময় উড়ে গেছিল কোথায়?

রাম। হ্যাঁ, সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তির কথা না জিগগেস করলে তুমি হয়তো এখনো পড়ে নাক ডাকাতে।

লক্ষ্মণ। আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম তবে তো এ-সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না—আর তোমরাও বিদ্যা জাহির করতে পারতে না।

জাম্ববান। যাক, এখন মেলা রাত হয়ে গেছে, তোমরা স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক নিদ্রার চেষ্টা দেখ—তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে আর আমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচব।

হনুমান। আমায় কিছু বকশিশ দেবে না?

বিভীষণ। হ্যাঁ, ওকে চারটি বাতাসা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দাও।

প্রথম। আমার কথাটি ফুরোলো

দ্বিতীয়। নটে গাছটি মুড়োলো

তৃতীয়। ক্যান্ রে নটে মুড়োলি

চতুর্থ। বেশ করেছি—তোর তাতে কিরে ব্যাটা।

সকলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

[ইতি সমাপ্তোঽয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য চতুর্থো সর্গঃ]

[সমাপ্তোঽয়ং মহানাটকঃ]

সনৎকুমার রায়ের
তুলিতে বাংলা
বর্ণ-পরিচয়

স্বরবর্ণ

হাসির ও নাটকীয় কবিতা

এই অংশে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কবিতা বিশিষ্ট হাস্যরসে রসিত; কতক-গুলি নাটকীয়—হয় ছবির সঙ্গে কবিতার ধারাবিবরণী নয়তো নাট্যকারে রচিত।

সূচীপত্র

নন্দগুপী

হঠাৎ কেন দুপুর রোদে চাদর দিয়ে মুড়ি
চোরের মতো নন্দগোপাল চলছে গুড়ি গুড়ি?
লুকিয়ে বুঝি মুখোসখানা রাখছে চুপি চুপি?
আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটা পাবেন গুপী!

আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপী হাস্‌ছে কেন খালি?
বিকট রকম পোশাক ক'রে মাখ্‌ছে মুখে কালি!
এম্‌নি করে লম্ফ দিয়ে ভেংচি যখন দেবে
নন্দ কেমন আঁৎকে যাবে—হাসছে সে তাই ভেবে।

আঁধার রাতে পাতার ফাঁকে ভূতের মতন কেরে?
ফন্দি এঁটে নন্দগোপাল মুখোস মুখে ফেরে!
কোথায় গুপী, আসুক না সে ইদিক পানে ঘুরে--
নন্দদাদার হুংকারে তার প্রার্ণটি যাবে উড়ে।

হোথায় কেরে মূর্তি ভীষণ মুখটি ভরা গোঁফে?
চিমটে হাতে জংলা গুপী বেড়ায় ঝাড়ে ঝোপে!
নন্দ যখন বাড়ির পথে আসবে গাছের আড়ে
"মার মার মার কাট রে" বলে পড়বে তাহার ঘাড়ে!

নন্দ চলেন এক পা দু পা আস্তে ধীরে গতি
টিপি টিপি চলেন গুপী সাবধানেতে অতি—
মোড়ের মুখে ঝোপের কাছে মারতে গিয়ে উঁকি
দুই সেয়ানে এক্কেবারে হঠাৎ মুখোমুখি!

নন্দ তখন ফন্দি ফাঁদন কোথায় গেল ভুলি
কোথায় গেল গুপীর মুখে মার মার মার বুলি!

নন্দ পড়েন দাঁতকপাটি মুখোস-টুখোস ছেড়ে
গুপীর গায়ে জ্বরটি এল কম্প দিয়ে তেড়ে।

গ্রামের লোকে দৌড়ে তখন বদ্যি আনে ডেকে
কেউ-বা নাচে কেউ-বা কাঁদে রকম-সকম দেখে।
নন্দ গুপীর মন্দ কপাল এম্নি হ'ল শেষে
দেখ্‌লে তাদের লুটোপুটি সবাই মরে হেসে!

সন্দেশ—১৩২২

বিষম ভোজ

"অবাক কাণ্ড!" বল্লে পিসি, "এক চাঙারি মেঠাই এল—
এই ছিল সব খাটের তলায়, এক নিমেষে কোথায় গেল?"
"সত্যি বটে" বল্লে খুড়ি, "আনলো দুসের মিঠাই কিনে—
হঠাৎ কোথায় উপসে গেল? ভেল্কিবাজি দুপুর দিনে?"
"দাঁড়াও দেখি" বল্লে দাদা, "কর্‌ছি আমি এর কিনারা
কোথায় গেল পটলা ট্যাঁপা—পাচ্ছি নে যে তাদের সাড়া?"
পর্দাঘেরা আড়াল দেওয়া বারান্দাটার ওই কোণেতে
চলছে কি-সব ফিস ফিস ফিস শুনল দাদা কানটি পেতে।
পট্‌লা ট্যাঁপা ব্যস্ত দুজন টপটপাটপ মিঠাই ভোজে,
হঠাৎ দেখে কার দুটো হাত এগিয়ে তাদের কানটি খোঁজে।
কানের উপর প্যাঁচ্ ঘোরাতেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ছোটে,
গিল্‌বে কি ছাই মুখের মিঠাই, কান বুঝি যায় টানের চোটে।
পটলবাবুর হোমরা গলা মিল্‌ল ট্যাঁপার চিকন সুরে
জাগলো করুণ রাগরাগিণী বিকট তানে আকাশ জুড়ে।

সন্দেশ—১৩৩০

হিতে বিপরীত

ওরে ছাগল, বল্‌তো আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্প বাহাদুরি।

নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে
ওরে ছাগল করবি রে কি?
গুঁতোবি তো আয় না দেখি।

হাঁ হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা?
এমন ধারা অভদ্রতা!
শান্ত যারা ইতর প্রাণী
তাদের পরে চোখরাঙানি!
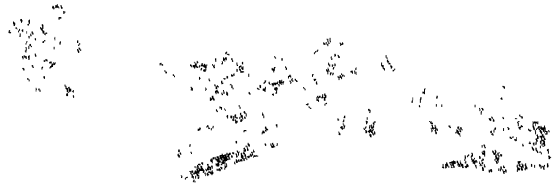
ঠাণ্ডা মেজাজ কয় না কিছু
লাগতে গেছ তারই পিছু?
শিক্ষা তোদের এম্নিতর
ছি—ছি—ছি! লজ্জা বড়।

ছাগল ভাবে সামনে একি!
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি!
গুঁতোর চোটে ধড়াধড়
হুড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড়।

তবে রে পাজি লক্ষ্মীছাড়া
আমার 'পরেই বিদ্যে ঝাড়া,
পাত্রাপাত্র নাই কিরে হুঁশ
দেদমাদম ধুপুস ধাপুস।

সন্দেশ—১৩২৩

ও বাবা!

পড়্‌তে বসে মুখের পরে কাগজখানি থুয়ে
রমেশ ভায়া ঘুমোয় পড়ে আরাম ক'রে শুয়ে।
শুনছ নাকি ঘড়র ঘড়র নাক ডাকানোর ধুম?
সখ সে বড় বেজায় দেখি—দিনের বেলায় ঘুম!

বাতাস পোরা এই যে থলি দেখছ আমার হাতে,
দুড়ুম করে পিট্‌লে পরে শব্দ হবে তাতে।
রমেশ ভায়া আঁৎকে উঠে পড়্‌বে কুপোকাৎ
লাগাও তবে—ধুমধড়াক্কা! ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!
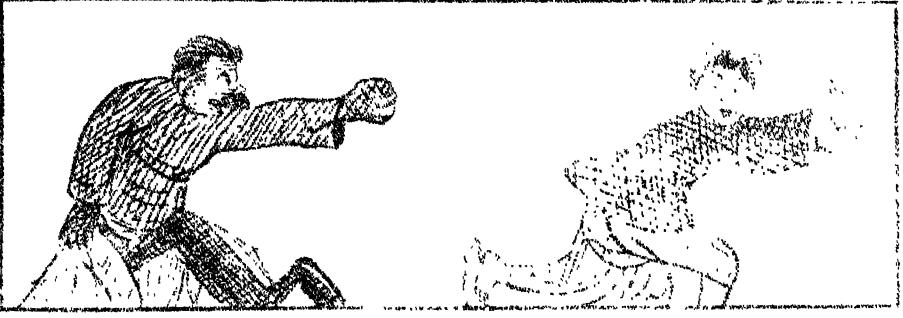
ও বাবা রে! এ কেরে ভাই? মারবে নাকি চাঁটি?
আমি ভাবছি রমেশ বুঝি! সব করেছে মাটি!
আবার দেখ চোখ পাকিয়ে আসছে আমায় তেড়ে—
আর কেন ভাই? দৌড়ে পালাই, প্রাণের আশা ছেড়ে!

সন্দেশ—১৩২৪

বুঝবার ভুল

এম্নি পড়ায় মন বসেছে, পড়ার নেশায় টিফিন ভোলে!
সাম্‌নে গিয়ে উৎসাহ দেই মিষ্টি দুটো বাক্য বলে।

পড়ছ বুঝি? বেশ বেশ বেশ! এক মনেতে পড়লে পরে,
"লক্ষ্মী ছেলে—সোনার ছেলে" বলে সবাই আদর করে।

এ আবার কি? চিত্র নাকি? বাঁদর পাজি লক্ষ্মীছাড়া—
আমায় নিয়ে রংতামাশা! পিটিয়ে তোমায় কর্‌ছি খাড়া!

সন্দেশ—১৩২৯

প্রথম খণ্ড শেষ